বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

ত্রয়োবিংশতি খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'ভারতীয় সভ্যতা অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা, কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতোই বিনাশের মুখোমুখি এসে গেছে। কিন্তু তার পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা আছে এবং আমরা কখনও এমন আশঙ্কা করব না যে, সে সভ্যতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে তার জড়ত্ব অনেকাংশে আলোকিত হয়েছে এবং পুরানো গতিময়তা ফিরে পেয়েছে।

ঐতিহাসিকেরা অনেক সময় বিস্ময় বোধ করেন, সভ্যতা কেন সর্বত্র বিকশিত না হয়ে একটি বিশেষ স্থানে বিকাশ লাভ করল। এটা কি তার অধিবাসীদের সামর্থ্যের কারণে? অথবা কোনও ঐশ্বরিক ইচ্ছার কারণে এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে? একটু পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে যে, এ সমস্ত উপকরণ-ই হল সাহায্যকারী, মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পরিবেশ। বস্তুতপক্ষে সভ্যতার ক্ষেত্রে যদি সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করা যায় এবং সেই সঙ্গে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনাকে ঠেকানো সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে সভ্যতা অবশ্যই পল্লবিত হয়ে উঠবে।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর

'মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক' থেকে

AMBEDKAR RACHANA - SAMBHAR
(Collected works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume - 23
Total No. of Pages : 190

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
First Published : December, 2000

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি

Published by
Dr. Ambedkar Foundation.
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.
New Delhi.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ২৫ টাকা (Rs. 25/-)
শোভন সংস্করণ : ৮৫ টাকা (Rs. 85/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
মাননীয়া সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস
সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

ডি. কে বিশ্বাস, আই. এ. এস
অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

শ্রী এস কে পাণ্ডা
যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার
সদস্য সচিব, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা, আই. এ. এস
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড. ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস
যুগ্ম নিদেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

ড. এম. পি. জনসন
নিদেশক, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার ঃ ত্রয়োবিংশতি খণ্ড

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
শচীন বিশ্বাস
দেবাশিস সেনগুপ্ত
অরুণাভ সিন্‌হা

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উপাধির জন্য তিনি গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধের খসড়া করেছিলেন, তা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ-প্রগতি ও বিত্ত-ব্যবস্থার ইতিহাসে ড. আম্বেদকরের এই প্রবন্ধগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
ডিসেম্বর, ২০০০
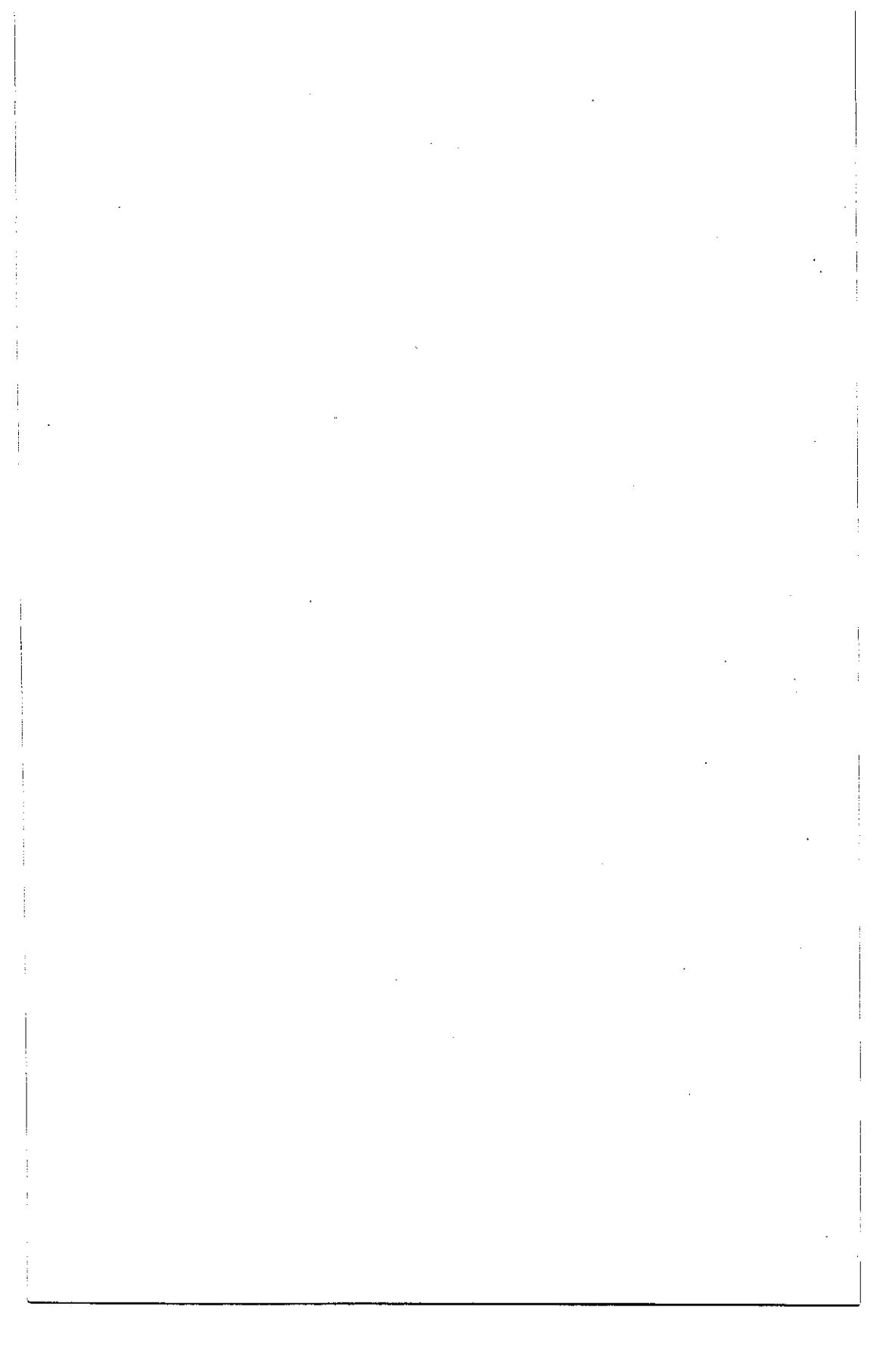
সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে।

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং (৭) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক (২৬, আলিপুর রোড, দিল্লি)।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের উক্ত মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় ত্রয়োবিংশতি খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরো যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ডি. কে. বিশ্বাস
সদস্য সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর, ২০০০
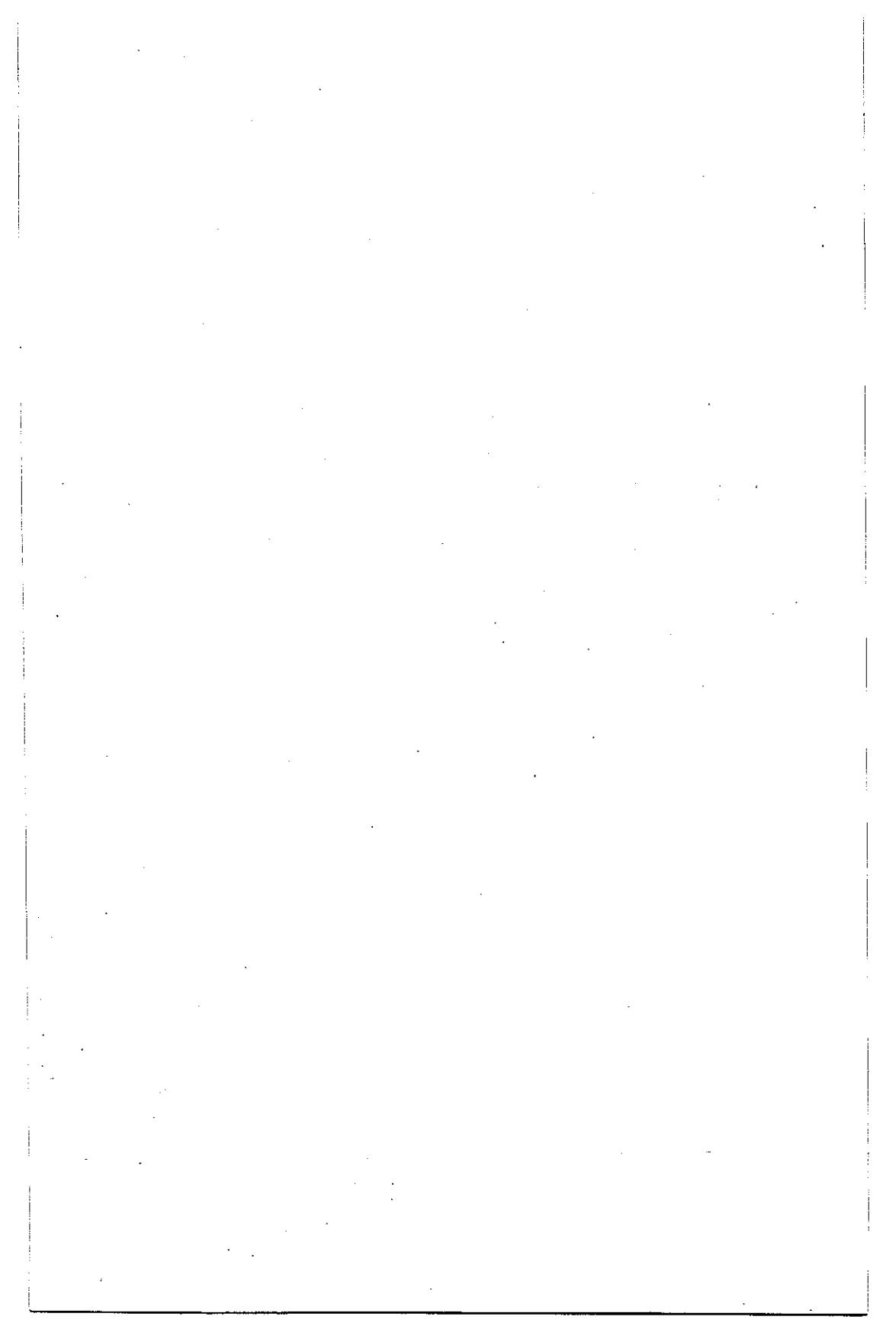
সম্পাদকের নিবেদন

বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। অনেক সময় তিনি কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে বসে প্রথমে একটা খসড়া করে নিতেন। কিন্তু সেই খসড়াটিও হয়ে উঠতো একটি গবেষণা-পত্র।

বর্তমান খণ্ডে ড. আম্বেদকরের এমন কিছু রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা কিছুকাল আগেও ছিল অপ্রকাশিত। ড. আম্বেদকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি'তে এই সব পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ সেই সব অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে। সেখান থেকেই রচনাগুলি বাংলার অনুবাদ করা হয়েছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর উপাধির সময়ে তিনি যে-সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, বর্তমান খণ্ডে তার প্রাথমিক খসড়াগুলি স্থান পেয়েছে। বাংলা একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে অন্তিম রচনাগুলি। প্রাথমিক এই খসড়াগুলিও গবেষকদের ঔৎসুক্য মেটাতে পারবে বলে আশা করি।

এই খণ্ডটি প্রকাশের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সহযোগিতার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই এই সুযোগে। অনুবাদকদের কাছেও প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আশাকরি খণ্ডটি পাঠক মহলে সমাদর লাভ করবে।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

কিছু
অপ্রকাশিত রচনা

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য

অংশ ১

অধ্যায় ১ : মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক

অধ্যায় ২ : মধ্যযুগে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অথবা, ইসলাম-এর উত্থান এবং পশ্চিম ইউরোপের সম্প্রসারণ

অধ্যায় ৩ : প্রাক-ব্রিটিশ ভারত

(এই অধ্যায় পাণ্ডুলিপিতে ৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে মনে হয়, অধ্যায় ৩ এবং ৪ নষ্ট হয়ে গেছে)

[এই অংশের বিষয়বস্তু ৩ অধ্যায়ে বিভক্ত (প্রথমত নম্বর ছিল ১, ২, ও ৫)। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হল, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। গবেষণামূলক এই প্রবন্ধগুলি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষার পাঠক্রমের প্রয়োজনে ড. আম্বেদকর লেখেন ১৯১৩-'১৫ সালের মধ্যে। পরে তিনি বিষয়গুলি নির্দিষ্টকরণ করেন এবং নামকরণ করেন, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র প্রশাসন ও অর্থনীতি যা বর্তমান রচনাবলীর বাংলা একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত। তাঁর হাতের লেখার একটি নমুনা দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হল তাঁর সুন্দর হাতের লেখা প্রদর্শনের জন্য। আজকের তরুণ সমাজকে তা নিশ্চয়-ই অনুপ্রাণিত করবে]

সম্পাদক
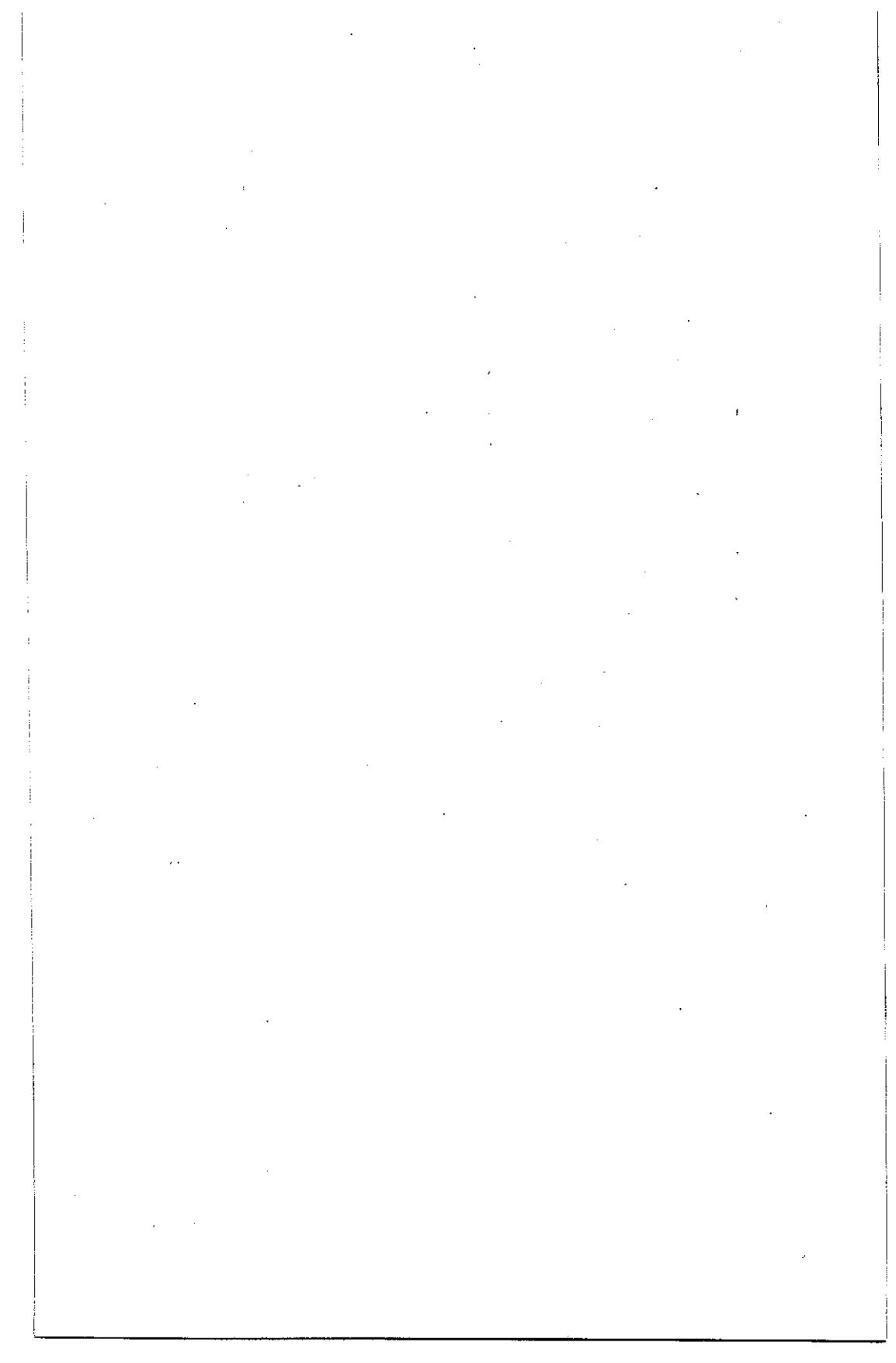
অধ্যায় ১

মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক

*প্রাচ্যে যেমন পাশ্চাত্যের তেমনি রোমানদের তরবারি ঝলসে উঠেছিল, কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্যে। প্রাচ্য জয় কেবল তাদের তা ফিরিয়ে[১] দেওয়ার জন্যই** কিন্তু পাশ্চাত্য জয় করে তারা তাদের এক সময়ের বিজিত জাতিসমূহকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিল বা রোমের পোপের কর্তৃত্ব স্বীকারকারী তাদের প্রতিনিধিদের হাতে এদের সমর্পণ করতে চেয়েছিল।[২] এই ধর্মান্তরীকরণের ফলে পাশ্চাত্য রোমানদের কাছে তার ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। কিভাবে যে এই উন্নত ঐতিহ্য লাভ করা গেল তা কেউ অনুসন্ধান করার কষ্ট স্বীকার করেননি।

ন্যায়ত যুদ্ধের পূর্বে জনগণের আশ্চর্য শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং যুদ্ধের পর তা তুলে দেওয়ার ঘটনা দেখতে পাই। সব দিক থেকে তারা ছিল পরিবেষ্টিত।

উত্তর দিকে চাপ ছিল ইট্রাসক্যানদের (Etrusscans) পশ্চিম থেকে ছিল লিগুরিয়ানদের (Lygurians) পূর্বে হিল সবিয়ানরা (Sabians) এবং দক্ষিণে ছিল গ্রিকরা (The Greeks)। ফলত ল্যাটিন রোমানরা মরিয়া হয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছে। মহিলা এবং বালখিল্যদের বাদ দিলে সমগ্র জনগোষ্ঠী যেন এক বিশাল সেনাবাহিনী, এক ভেরিধ্বনির আহ্বানে রক্তপতাকা তলে জমায়েত হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। কিন্তু রোম যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল তা ছিল তার রাজ্যের তুলনায় বিশাল। স্বাভাবিকভাবেই সে এই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল যে শক্তি বেশি সংহত করলে বিস্ফোরণ ও বিস্তার সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রেরণায় বা পার্শ্ববর্তী

---

* পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে তা শুরু হয়েছে।

** এই চিহ্নিত স্থানের আগে পরে কয়েকটি ইংরেজি শব্দ পোকায় কেটে দিয়েছে। শব্দগুলি অনুমান করাও কঠিন। সুতরাং অনুবাদ কর্ম নিতান্তই অনুমান ভিত্তিক করতে হয়েছে।

১. আর্ল অব্ ক্রোমার কর্তৃক উদ্ধৃত : 'প্রাচীন ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ'; পৃ: ৭২

২. তদেব; পৃ: ৭৩

বিদেশী শক্তির বিকৃত নির্যাতনে নিয়ত নির্যাতিত হয়ে রোম প্রথমে ইতালীয় উপদ্বীপের সবটা গ্রাস করতে উদ্যত হল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ জ্ঞানতই হোক বা অজ্ঞানতই হোক থামতে জানে না। অস্ত্রশক্তির শৌর্যে রোমও তার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখল এবং যুদ্ধবিদ্যাকেই তারা একমাত্র মহৎ জীবিকা করে তুলল। সে জানত না যে, এই যুদ্ধ প্রতিযোগিতা আসলে আত্মঘাতী। একটি বড় রকমের উল্লম্ফনে সে এক বিশাল সাম্রাজ্য তার নিজের অধীনস্থ করে ফেলল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে লক্ষ্য করল তার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত শক্তি কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য নির্ভরতা প্রদর্শন করতে নিরুৎসাহ ও পশ্চাদপদ হয়ে পড়ছে। হওয়ারই কথা, কারণ তখন চালিকাশক্তি স্বাভাবিকভাবে আপনা থেকেই নিঃশেষিত হয় এসেছে। তাদের সামরিক শোষণ ও গ্লাডিয়েটরদের অমানবিক মল্লযুদ্ধ ছাড়া রোমানরা রাস্তাঘাট নির্মাণ শিল্প এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। অবশ্য এ-গুলি সাম্রাজ্যবাদের খুব স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। এ-গুলি ছাড়া সভ্যতার ক্ষেত্রে রোমের অবদানের খুব সামান্যই ছিল যা রোমের রাজ্যগুলির ওপর আরোপিত শান্তির অনুশাসন (Pax Romana) শব্দগুচ্ছ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

রোমান সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় প্রাচ্যদেশের ওপর সর্বদাই একটা "শান্তিপূর্ণ আগ্রাসন নীতি' থেকে গেছে (প্রাচ্য থেকে)*। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা হল তাদের বিষয় সম্পত্তি। রোমান বাস্তব-ধর্মী মেধার পক্ষে যে সব জ্ঞান বেমানান সেইগুলি হল প্রাচ্য দেশীয়দের জন নির্ধারিত বৃত্তি। প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিতদের দ্বারা রোমান কোর্ট ছিল পরিপূর্ণ। টলেমি (Ptolemy) এবং প্লটিনাস (Plotinus) ছিলেন মিশরের লোক, পরফিরি (Porphyry) ও অ্যামব্লিকাস (Imablichus) হলেন সিরিয়ার সন্তান। পক্ষান্তরে দায়স্কোরাইস ও গালেন (Dioscorides, Galen) ছিলেন এশিয়ার লোক।

রোমান সভ্যতার অনেকখানি প্রাচ্যের ক্রীতদাসদের কর্ম অবদানের ফল। এরা, এমনকি, রোম সম্রাটদের তৈরি করা স্কুলগুলিও পরিচালনা ও পরিচর্যা করেছে। রোমানরা যতটা শক্তির পূজারি, ততটা সৌন্দর্যের নয়। 'রোমকে বলা যায়, আকাট, শিল্প ও শিল্পীকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের গলিপথে বেঁধে রেখেছে। জমকালো রঙ এবং জৌলুসে তার উর্বর আনন্দ ধরা পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সোনালি ও টকটকে লালরঙে চিত্রিত ট্রোজান স্তম্ভগুলিই তার প্রমাণ। এ-গুলি প্রাচ্যের ব্যবসাদারি পরিচয় বহন করে।'[১]

* বন্ধনীভুক্ত অংশ সম্পাদকের সংযোজন

১. ডব্লু. আর. পেটারসন ; 'দি নেমিসিস্ অব্ নেশন' ; পৃ: ৩০৭

এমনকি রোমান স্থাপত্য প্রাচ্য দেশীয় দাসদের তৈরি। সমস্ত রোমকশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে যুদ্ধ জয়ের জন্য, বলা যায়, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জীবনযুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের পর অন্তত তার অবসরকে কাজে লাগাতে পারত। তার লোকজনেরা যে সব বিভিন্ন প্রতিভার আমদানি করেছিল তাদেরও কাজে লাগাতে পারত। দুর্ভাগ্যবশত রোম তা কখনও উপলব্ধিই করেনি। অথবা অত্যন্ত বিলম্বে বুঝেছে যে, ' যুদ্ধজয়ের খ্যাতির চেয়ে শান্তির বিজয় কোনও অংশে কম নয়।' এবং তখন-ই সে (তার)* সামরিক সমরসজ্জা ত্যাগ করে বুঝতে পেরেছে যে, ইতিমধ্যে শান্তির ক্ষেত্রে দেওয়াল তোলা হয়ে গেছে।'[১]

যদিও রোমে কিছু শিল্প কলকারখানা ছিল, তার উৎপাদন ছিল শোচনীয়ভাবে নিম্নমানের। তার ব্যবহারের পদ্ধতিই তার উৎপাদনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অজস্র অর্থ সম্পদ নর্দমা দিয়ে বের হয়ে গেছে।

লেটফন্ডিয়া (Latefundia) তার কৃষিকে ধ্বংস সাধন করেছে, তার কৃষকদের পরিণত করেছে ভিক্ষুকে। ফলত রোমকে তার খাদ্যের জন্য একান্তভাবেই সিসিলি ও মিশরের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। পক্ষান্তরে অতিমাত্রায় জমির উপর নির্ভরশীলতার ফলে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে বস্তুত ইতালির পদ্ধতিতে কিছু উৎপাদিত হয় না। প্রাচ্যদেশ থেকেই তার সব কিছু আসে কিন্তু প্রতিদানে সামান্যই দিতে পারে।

"এই প্রাচ্যে বিশেষ করে এই প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলিতে, আমরা অবশ্যই শিল্প চাই, কারিগরি উন্নতির জন্য সম্পদ চাই, মেধা ও বিজ্ঞানের জন্য সম্পদ চাই, চাই কনস্ট্যান্টাইন একে (রোমে) রাজনৈতিক দুর্গে পরিণত করার আগেই[২] না, এর শিক্ষার সমুদয় শাখা প্রাচ্যের সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৩] যা ছিল তার কাছে উচ্চতর বিষয় বা বলতে হয় তার কর্মদক্ষতা বা মেধার সঙ্গে যুক্ত বিষয়।[৪]

শিল্প দক্ষতা থেকে নেমে এলে যদি কল কারখানার দিকে তাকানো যায়, যে-কেউ প্রাচ্যের প্রভাব লক্ষ্য করবে। যে কেউ দেখাতে পারবে যে, কিভাবে প্রাচ্যের বিশাল উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রগুলি ধীরে ধীরে ইউরোপের বস্তুনিষ্ঠ সভ্যতাকে পরিবর্তিত করেছে। যে কেউ লক্ষ্য করতে পারেন, প্রাচীন ফ্রান্সের আদিবাসীদের

---

১. তারকা চিহ্নিত স্থানে একটি বা কিছু শব্দ পোকায় কেটেছে।

২. ফ্রাঞ্জ ক্যুমন্ট ; 'ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়ন ইন রোমান পেগানিজম্ ; পৃ:২

৩. তদেব ; পৃ: ৮

৪. তদেব ; পৃ: ৬

বহিরাগত প্রথার অনুবর্তনে কিভাবে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি বদলে গেল এবং তাদের শিল্পক্ষেত্রে অভিনবত্ব আরোপ করল এ-যাবৎ অজানা ছিল।[১]

বহু প্রাচীনকাল থেকে শিল্প বিপ্লবের সময় পর্যন্ত প্রাচ্য দেশ পৃথিবীর কর্মশালা পরিচালনা করার যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পেরেছে। তারা আশ্চর্যজনক সব লৌহস্তম্ভ তৈরি করেছে। এ-সব তৈরির কারিগরি কলা কৌশলও তারা রপ্ত করেছে। সে সময়ে পাশ্চাত্য দেশ পাথরের টুকরো কাটা বা ডিম ফুটিয়ে ছানা তৈরির কাজে ব্যস্ত থেকেছে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের মতো।

এ-ভাবে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে অনুপ্রাণিত করেছে। নীলনদের তীরে, ইউফ্রেটিস, ইয়াং সি-কিয়াং বা সিন্ধুনদের অববাহিকায় আমরা সভ্যতার কুয়াশাচ্ছন্ন প্রত্যুষ প্রথম লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি জ্ঞান ও প্রগতির সূচনা। প্রাচ্য থেকে জ্ঞানালোক আহরণ করে পাশ্চাত্যের রকমারি চাকচিক্য সৃষ্টি করাই ছিল গ্রিস ও রোমের একমাত্র কাজ।

এ-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ-এর (Dark Ages) জুজুর ভয় মনে হয় ঐতিহাসিকদের বানানো কোনও কাল্পনিক গল্প। ইউরোপে এই তথাকথিত অন্ধকার যুগ বলে আদৌ কি কিছু ছিল? তা যদি থেকে থাকে তবে আলো ছিল কখন? ইতিহাস ত সে তথ্য উদ্ঘাটন করে না। যেটুকু সভ্যতার আলো ছিল, তা ছিল ভূমধ্য সাগরীয় অববাহিকায় এবং তাকে অনবরত পুষ্টি দিয়ে গেছে প্রতীচ্য। বাদবাকি ইউরোপীয় ভূভাগ ছিল বর্বর। এই সেদিন পর্যন্ত।

ইউরোপীয় সভ্যতার বক্রজাতি (তার উৎসমূল বাদে) সর্বদাই উর্ধ্বমুখী। ঐতিহাসিকেরা যাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলছেন, তা এমন এক সভ্যতার দিক নির্দেশ করছে যা পরবর্তী কালের তুলনায় উন্নতমানের। তথাকথিত অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের গল্পের উদ্ভব-ই হয়েছে রোমকে সমগ্র ইউরোপ ভাবার ফ্যালাসি থেকে। অংশের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্রকে ভাবার মতো মিথ্যা বোধ হয় আর কিছু নেই।

সত্য বলতে কি, 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের' প্রশ্ন প্রাচ্য দেশীয় ঐতিহাসিকদেরই তুলে ধরার কথা ছিল। তাকেই ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা যে, এত উচ্চ চূড়া থেকে এই পতন কেন। প্রত্যুষাভাসিত আলোর প্রেক্ষিতে কেন হঠাৎ এই অন্ধকারাচ্ছন্নতা।

এত গভীর দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীনতম এবং বিশেষ প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন সভ্যতা কানাগালিতে তার পথ হারিয়ে ফেলল এবং গতিরুদ্ধ হয়ে পড়ল তখনই যখন

১. ফ্রাঞ্জ ক্যমন্ট ; 'ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়ন ইন রোমান পেগানিজম্' ; পৃঃ ৯

প্রগতি তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্ভাবনার স্থান সৃষ্টি করেছিল। কোনও কোনও প্রাচীন সভ্যতা ইঁট ও পাথরের উপর তাদের স্মৃতিচিহ্নের অবশেষ রেখে শুষ্কপ্রায় হয়ে পড়ে। কিছু কিছু সভ্যতা তাদের মতো করেই চলেছে এবং পুনর্যৌবন পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতা অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা, কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতোই বিনাশের মুখোমুখি এসে গেছে। কিন্তু তার পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা আছে এবং আমরা কখনও এমন আশঙ্কা করব না যে, এই সভ্যতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে তার জড়ত্ব অনেকাংশে আলোকিত হয়েছে এবং পুরনো গতিময়তা ফিরে পেয়েছে।

ঐতিহাসিকেরা অনেক সময় বিস্ময় বোধ করেন, সভ্যতা কেন সর্বত্র বিকশিত না হয়ে একটি বিশেষ স্থানে বিকাশ লাভ করল। এটা কি তার অধিবাসীদের সামর্থ্যের কারণে? অথবা কোনও ঐশ্বরিক ইচ্ছার কারণে এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে? একটু পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে যে, এ সমস্ত উপকরণ-ই হল সাহায্যকারী, মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পরিবেশ। বস্তুত পক্ষে সভ্যতার ক্ষেত্রে যদি সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করা যায় এবং সেই সঙ্গে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনাকে ঠেকানো সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে সভ্যতা অবশ্যই পল্লবিত হয়ে উঠবে।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা এমনি যে, তা তাকে পৃথিবীর আদি সভ্যতা সৃষ্টিকারী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে। এর প্রকৃতিতে স্বতন্ত্রতা বিশ্বের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক করেছে, যারা প্রতিনিয়ত সংরক্ষিত বাসস্থানের খোঁজ করে তথা প্রাকৃতিক সম্পদের পৃথক ব্যবহারে সর্বদায় ব্যস্ত থাকে। উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী দ্বারা চীন ও তিব্বত থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত পূর্বপ্রান্তে অসম ও ব্রহ্মদেশে শৃঙ্খলা টেন-সে-রিম অববাহিকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, হিন্দুকুশের কারা কোরাম দ্বারা আফগানিস্তান থেকে মুক্ত—এই সমগ্র উপদ্বীপ নিজের মধ্যে নিজে একটা ছোটখাট পৃথিবী সৃষ্টি করে রেখেছে। এর রয়েছে এক শক্তিশালী স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিরাপত্তা যার নাম পর্বতশ্রেণী উত্তর পশ্চিমাংশে যা তৈরি করেছে প্রাচীর। অবশিষ্ট সীমা প্রান্তে আছে সমুদ্র, যা পরিখার মতো পরিবেষ্টিত।

এই 'বিপরীতমুখী ত্রিভুজ' আকৃতি বিশিষ্ট দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এখানকার প্রাণী সম্পদ কেবল যে অনেক তাই নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে বিচিত্র। যে সব প্রাণী সম্পদ ভারত এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে তার সংখ্যা বিশাল, এমন বিশাল যে সারা ইউরোপে প্রাণী সম্পদ একত্র করলেও তার সমান

হবে কিনা সন্দেহ, যদিও বাহ্যত ইউরোপের এলাকা ভারতের দ্বিগুণ। সমভাবে তার উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে উন্নত, উন্নত তার জলবায়ু যা এদের জন্ম ও বৃদ্ধি সম্ভাবিত করে তুলেছে। শাকসব্জি ও উদ্ভিজ্জ রয়েছে প্রচুর। এ-সব উপকরণ স্মরণাতীত কাল থেকে সম্মিলিতভাবে তার অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করে তুলেছে। পৃথিবীর বুকে খুব কম জাতিই এই সুবিধা পেয়েছে।

এসব সম্পদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও মানুষ কোনওভাবেই অকর্মণ্য অবস্থায় থাকেনি, কারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সর্বদাই খুব শক্তিশালী এবং সবচেয়ে গতিশীল। মানুষ তার নিজের মঙ্গলের জন্য পরিবেশকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়েছে এবং আদিম মানব সমাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। আজকের মানুষকে আমরা যদি তার প্রাচীন শক্তিশালী বংশধরের প্রতিভূ ভাবি তা হলে আমরা ভুল করব। তাদের চেহারায় একটা মিল থাকতে পারে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। মিলের দিকটা সেখানেই শেষ। প্রাচীনতর কাল প্রবাহে যা কিছু ভারত অবিসংবাদিত সম্পদ রূপ লাভ করেছে তা আদিম সভ্যতার কাছে তার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বলা যায়। তার হস্তগত হয়েছে, যা নিম্নের বিবরণ থেকে জানা যাবে, তা অনেকখানি।

প্রাচীন ভারতীয়দের নানাবিধ কৃতিত্ব, যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা কেবল তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি আমাদের আগ্রহ অভিনিবিষ্ট করব। প্রথমেই আমাদের ল্যাম্প পোস্ট বা আলোর উৎসের হিসাব নিতে হবে। আমাদের পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্যই তা আমাদের করতে হবে। দুঃখের বিষয় প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে তথ্যের স্বল্পতা আছে। তাদের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দুরা বেশি কথা বলে। এর কারণ অনুধাবন করা অবশ্য কঠিন নয়। "যারা ফুলে ফুলে মধুপান করেন বা জাঁকজমকভাবে খাদ্যাভ্যাস করা ছাড়া কোনও সত্যিকার অবদানের অধিকারী নন" তাদের হাতেই শিক্ষা কুক্ষীগত হয়ে ছিল। ব্রাহ্মণ অথবা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ নজরকাড়া আসর বা "বিশিষ্ট ভোগ্যপণ্য" উপভোগ করেছেন প্রতিনিধি রূপে। ফলত, প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কোনও উল্লেখ বা প্রকাশ সাহিত্যে নেই, তা মূলত যাজকীয়। এই কারণেই ভারত অর্থনীতি শাস্ত্রের কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। সেজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিদেশি কর্তৃপক্ষ এবং তাদের সামান্য রচনার উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

ব্যবসা-বাণিজ্য শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনার পূর্বে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালচিত্রের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে ভাল হয়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে

কি হয়েছে বা ছিল তা পর্যালোচনার কোনও প্রতিনিধি স্থানীয় উৎস আমাদের নেই। এবিষয়ে বুদ্ধের জন্ম বৃত্তান্তমূলক কাহিনী ও 'বৌদ্ধ জাতক' ই আমাদের প্রাচীন উৎস। এর থেকেই আমাদের ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের সাহিত্যিক বিবরণ পেতে হবে। ধরে নিতে হবে এগুলি প্রকাশের অনেক পূর্বেই সেইসব সাংগঠনিক সূত্র ও উৎসগুলি ছিল এবং সেগুলিই জাতকে প্রতিফলিত হয়েছে।

১. কৃষি সংগঠন

প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা গ্রামে জীবনযাপন করত। প্রতি গ্রামে ৩০ থেকে ১০০০ পরিবার বসবাস করত। বিচ্ছিন্ন কোনও পরিবারকে বসবাস করতে দেখা যেত না। বরং তারা দল বেঁধে বসবাস করত। কৃষিই ছিল সমাজে সর্বোচ্চ জীবিকা বা বৃত্তি। ভারতীয় প্রবাদে ব্যবসায়ীদের ছিল দ্বিতীয় স্থান এবং সৈনিকরা পেত সর্বশেষ স্থান।

কৃষক বা তার পরিবারের সদস্যরা জমি চাষ করত। কখনও কখনও কৃষি শ্রমিক নেওয়া হত। "ঐতিহ্যগত উপলব্ধি ছিল জমির হস্তান্তরের বিরুদ্ধে।" তবুও আমরা দেখতে পাই জমি চাষ আবাদের জন্য খাজনার ভিত্তিতে বিলি বন্দোবস্ত করা হয়েছে। স্বাধীন জমির মালিককে সম্মানীয় গণ্য করা হত। পক্ষান্তরে ধনী চাষীর ফার্মে কাজকর্ম করাকে খুব খারাপ নজরে দেখা হত। গ্রাম সমাজে সামন্ততন্ত্রের অবস্থান ছিল—এমন কথা স্পষ্ট করে বলার মতো কোনও প্রমাণ নেই।

রাস্তাঘাট, পুকুর এবং পৌরগৃহ নির্মাণ ও মেরামতের কাজে গ্রামবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল।

"কাঁচামাল উৎপাদনের ওপর বার্ষিক তিলা (tilha) দাবি করতেন রাজকীয় কর্তৃপক্ষ। লেভির পরিমাণ ছিল ১/৬, ১/৮, ১/১৯ বা ১/১২", " শস্যকণা, ডাল, এবং ইক্ষু ছিল প্রধান উৎপাদিত ফসল; শাকসবজি, সম্ভবত ফুল ও ফসলও চাষ হত। প্রধানতম খাদ্যদ্রব্য হিসাবে গণ্য হত।

কৃষি কাজ সাধারণ জীবিকা হিসাবে গণ্য হত। এমন কি, ব্রাহ্মণকে ছাগপালকের ভূমিকায় দেখা যেত, দেখা যেত সে তার জাতিসত্তার বিলোপ না ঘটিয়েও বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চাষী হিসাবে চাষ আবাদ করছে। কৃষি কাজের জন্য প্রাচীন, এমন কি আধুনিক কালের হিন্দুর ভালবাসা প্রাচীন গ্রীকদের ভালবাসাকেও অতিক্রম করে যায়। গরুর প্রতি পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে তার চমৎকার প্রকাশ ঘটে।

হিন্দুদের গো-পূজা অধিকাংশ বিদেশির কাছে রীতিমত হেঁয়ালি। আর হিন্দুদের প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে যে সব অর্ধ-পক্ক ধর্মীয় ভণ্ডরা ভারতবর্ষে যায় মিশনারি

প্রচার কার্য পরিচালনা করার জন্য তাদের কাছে এ বস্তু বেশ একটি শিক্ষণীয় বিষয়। রোমানরা যেমন অপরিষ্কার আঙুর দেবতার ভোগে দেয় না, হিন্দুদের গো-প্রীতির মূল উৎসও অনুরূপ অর্থনৈতিক বলা যায়। গরু এবং গবাদি পশু কৃষকদের প্রাণ। গাভী ষাঁড় বা বলদের জন্ম দেয় যা চাষের কাজে বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমরা যদি মাংসের জন্য গো-হত্যা করি তা হলে আমরা কৃষিকার্যের উন্নতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করলাম। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গিতেই হিন্দুরা গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে এবং গো-হত্যা নিবারণ করেছে। কিন্তু মানুষ শুষ্ক আইনের প্রতি এত গুরুত্ব প্রয়োগ করে না। তার ধর্মীয় অনুমোদন প্রয়োজন। সেইজন্যই এই অদ্ভুত ধর্মীয় বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে গরুকে কেন্দ্র করে এবং তা প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের বিষয় হয়েছে।

২. শিল্প বাণিজ্য ও শ্রম সংগঠন

হিন্দুদের কৃতিত্বের পক্ষেই একথা উক্ত হয় যে, দাসত্ব তাদের অর্থনৈতিক জীবনে সেরূপ কোনও প্রভাব ফেলেনি। বন্দিত্ব, বিচার বিভাগীয় শাস্তি, স্বেচ্ছা আত্মনিগ্রহ এবং ঋণ, এই চার প্রকার কার্য কারণে মানুষ দাস-এ পরিণত হয়। কিন্তু এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে যে, সহানুভূতিশীল ব্যবহার ক্রীতদাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। কিছু দাস শ্রমিকের কথা ছেড়ে দিলে অর্থ ও খাদ্যের বিনিময়ে মুক্ত শ্রমিকের অস্তিত্ব সমাজে ছিল।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রেণীগুলি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য:

(ক) বদ্ধকী—বদ্ধকী একটি অকৃত্রিম শব্দ এবং ছুতার, জাহাজ নির্মাতা, গরুর গাড়ি জাতীয় নির্মাতা এবং স্থাপত্য কারিগরদের প্রতিভূ।

(খ) কাম্মার—কাম্মার একটি বর্গীয় নাম, ধাতু শিল্পীদের বুঝায়। লৌহ, লাঙ্গলের ফলা, কুঠার বা অনুরূপ, লৌহগৃহ থেকে লৌহ, ব্লেড থেকে সূক্ষ্ম সুচ যা জলে ভাসে বা স্বর্ণ স্ট্যাচু বা রৌপ্য শিল্প নির্মাতা।

(গ) পাষাণকোত্তাকা—পাষাণ কোত্তাকা একটি বর্গীয় নাম রাজমিস্ত্রি, কেবল যে খাতখনক বা পাথর কাটার বা গর্ত মসৃণকর্তা তাই নয়, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি নির্মাতাও।

"সমস্ত প্রকার পেশাদারি শিল্প একটা সুসংহত বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, এমন অবস্থা বিরাজমান। কিছু বৃত্তি গ্রামবিশেষে স্থানিকতা প্রাপ্ত হয়েছে, শহরের উপকণ্ঠে হতে পারে। বৃহৎনগরীর প্রান্তে হতে পারে, অথবা তারা নিজেরাই কয়েকখানি গ্রাম নিয়ে

পেশাদারি বৃত্ত সৃষ্টি করেছে, উদাহরণ স্বরূপ যেমন বলা যায় কাঠের কাজ বা ধাতু-শিল্প বা মাটির কাজ.......বা শহরের মধ্যেই শিল্প গড়ে উঠেছে কোনও স্থান বিশেষ বা রাস্তা বিশেষকে অবলম্বন করে। উদাহরণ স্বরূপ হাতির দাঁতের কারুকাজ করা শিল্প কাজ অথবা কাপড় ছাপানো বা ধোলাইকাজ।"

একজন বা দু'জন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা শহরের শিল্প সংগঠনের প্রধান বা পৌর নিগমের প্রতিনিধি, তাদের দ্বারা পেশাদারি শিল্প সুনিয়ন্ত্রিত বা সুপরিচালিত হয়েছে।

একজন সভাপতি (অথবা প্রমুখ)-র বা বয়স্ক ব্যক্তি (জেথক)র নেতৃত্বাধীন বেশ কিছু গিল্ড বা সমবায় সমিতি (সেনিয়) থাকে বা ছিল। সূতার কর্মকার চর্মশিল্পী, রঙশিল্পী বা অন্যান্য শিল্পকলায় দক্ষ শিল্পীদেরও সমবায় সমিতি জাতীয় সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। এমন কি জাহাজের খালাসিদের বা ফুলের মালা যারা তৈরি করে তাদেরও বৃত্তি ক্ষেত্রে নজরদারি ব্যবস্থা ছিল।

বংশগত জীবিকার দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা বর্তমান ছিল। কিন্তু জাতিপ্রথা তার বীভৎস কঠোরতা নিয়ে উপস্থিত ছিল না। এমন কি ব্রাহ্মণরাও নীচুস্তরের কোনও বৃত্তি গ্রহণ করত।

নদীকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু ছিল। সেগুলির বেশির ভাগই ভ্রাম্যমান যাত্রীদল পরিচালনা করত। শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সুন্দর রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা ছিল বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ও যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হত। রামায়ণে একটি রাস্তার কথা আছে যা রাজা দশরথের রাজধানী অযোধ্যা, যার বর্তমান নাম আযোধ্যা, থেকে কেকয়-র রাজধানী রাজগৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কেকয়-র রাজ্য ও রাজধানী হিমালয় পর্বতশ্রেণীর আওতাভুক্ত বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল যা প্রাচীন বিপাশা বলে কথিত এবং কুরুরাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুরে (বর্তমান দিল্লি) অবস্থিত হাইপাসিস পাস হিসাবে গ্রীকদের কাছে পরিচিত ছিল।

প্রাচীন ভারতের রাস্তাঘাট সম্পর্কে আলেকজান্ডারের বিবরণ সম্ভবত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং ভারতীয় রাস্তার জরিপের কাজে নিযুক্ত কর্মচারিদের সবচেয়ে বড় কার্যকর উৎস। এই রূপ উৎস থেকে আমরা জানতে পারি যে, একটি রাস্তা পেনকালাউটিস্ বা পুষ্কলাবতী (বর্তমান আত্তক) থেকে বিপাশা নদী পেরিয়ে তক্ষশীলার মধ্য দিয়ে পাটলিপুরা (পুত্র) পর্যন্ত গিয়েছে। অন্য একটি রাস্তা পুষ্কলাবতী এবং ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লি)-এর সঙ্গে মিশেছে এবং উজ্জয়িনী কে (উজয়িন) যোগ করে নেমে গিয়েছে বিন্ধ্যপর্বতের এলাকা পর্যন্ত এবং তারপর নর্মদা ও তাপ্তি পার হয়ে

প্রতিস্থানর মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত গিয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অভ্যন্তরীণ হাইওয়ে ছিল। প্রাচীন ভারতে বহির্বাণিজ্য, ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসাপত্র এমন গুরুত্ব অর্জন করেছিল যে, বৌদ্ধ জাতকে আমরা একদল ভ্রাম্যমান ব্যবসাদারের উল্লেখ পাই। ভ্রাম্যমান ব্যবসাদার নেতার উল্লেখ পালিতেও মেলে তার নাম সত্রবহ। তাকে দেখা যায়, ভ্রমণের ক্ষেত্রে নেতৃত্বে যাত্রার সময় থামতে বা চলতে বলছে, ডাকাতির ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে এবং অনুরূপ না ক্ষেত্রে সে সচেতন। এরূপ গমনাগমনের সময় ছিল রাত্রি।

প্রাচীন ভারতের ব্যবসাপত্র সবটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না। দলগতও ছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে। যৌথ ব্যবসা সাধারণ প্রবণতা না হলেও কখনও কখনও হত। ব্যবসায়ে রাজকীয় কর্তৃত্ব ছিল না বললেই চলে তবুও রাজকীয় ক্রয়ের ক্ষেত্র ত ছিলই। রাজকীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যাদির মূল্য রাজার লোকেরা নির্ধারণ করত এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রতি জিনিসের বিক্রয়করও নির্ধারণ দিত। দেশীয় জিনিসের ক্ষেত্রে কুড়িভাগের এক ভাগ এবং বিদেশী জিনিসের ক্ষেত্রে এক দশমাংশ বিক্রয় কর লাগত। বিদেশী জিনিসের ক্ষেত্রে নমুনা দেওয়ারও রীতি ছিল। অবশেষে রাজাকে প্রত্যেক দ্রব্যের একটি 'রাজাক্ষয়' হিসাবে দিতে হত হ্রাসমান মূল্যে এবং তা দিতে হত প্রতি মাসে।

মনু বলছেন, রাজা প্রত্যেক মাসের ৫ই এবং ৯ই ক্রয় ও বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদির মূল্যমান নির্ধারণ করতেন তা সে দ্রব্যের চলতি দাম যাই থাক না কেন।

ভারতবর্ষীয় বাজারের ক্ষেত্রে টাকার প্রচলন হয়েছে। সে টাকা ঘরে তৈরি না বাইরে থেকে আনা হয়েছে সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে যে কথাই বলা হোক না কেন টাকার ব্যবহার এ দেশে প্রাচীনকাল থেকেই জানা ছিল। কারণ "কারণ বৌদ্ধ সাহিত্যে একথা স্বীকার করে যে প্রাচীন ভারতের প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথা (barter) এবং গরু বা চাউলের প্রত্যক্ষ মূল্য নির্ধারণের বিষয়টা জানা ছিল, ফলে তাকে টাকার বিনিময় যোগ্যতায় রূপান্তরিত করা হয় এমনভাবে যে, সকলের পক্ষেই যাতে সেই বিনিময় মূল্য গ্রহণযোগ্য হয়।" কারেন্সি টাকার বিনিময় মূল্যে নির্বাচিত হয় কিন্তু তা রাজাদের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। দেশের অধিকাংশ স্থানেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। এবং "সমস্ত রাজার যোগ্য পণ্য বাজারে টাকার বিনিময় মূল্যে কেনাবেচা হয়। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অতিমাত্রায় উন্নত ছিল না। টাকার ঋণ আদান প্রদান প্রচলন ছিল না। গৌতমের কথা অনুসারে সুদ স্বতন্ত্র ছয় প্রকার পদ্ধতিতে আদান প্রদান হত।

এরূপ উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক সমুন্নতি প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা অন্যত্র প্রভাব ও শক্তি (Colonization) বিস্তার করেছে। ঐতিহাসিকেরা অবশ্য এরূপ কোনও তথ্য স্বীকার করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। সমগ্র হিন্দু জনসংখ্যাকে অপদার্থ ধরে নিয়ে হয় তাঁরা বর্তমানকে বর্তমান নিয়ম কানুন দ্বারাই বিচার করছেন, অথবা পূর্বপরিকল্পিত কোনও ধারণার বশবর্তী হয়ে অসাধু ধারণাকে মূল্য দিচ্ছেন। ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার প্রবণতা তাঁদের কাছে ট্রাম্প কার্ডের মতো, যতবার সম্ভব ব্যবহার করেন। পারিবেশিক শর্তাদি মানুষের কার্যাবলীকে বিস্তার করে, কিন্তু হিরভারের মতো কথা বলা বোকামি যে, 'ইতিহাস হল আসলে ভূগোল, যাতে গতি সঞ্চারিত করা হয়।' অবশ্যই আমরা সত্য স্বীকার করে বলি যে, ভৌগোলিক অবস্থান ভারতবর্ষকে অবদাহিত করেছে, কিন্তু তবুও এই মন্তব্যের অতিশয়োক্তিও নিন্দা করি।

আমরা মন্টেস্কুর সঙ্গে একমত হতে পারি যে, প্রাচ্যের উষ্ণ জলবায়ুর সঙ্গে তার হাবভাব আচরণ এবং ধর্মের একটা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাক্‌লে-এর মতো বিশ্বাস করে আমরা বলতে পারি, এখানে পর্বতশ্রেণী ও অরণ্যানীর মধ্যে যে বিস্ময়কর বিশালতা বিরাজ করে তার ফলেই এখানে রূপ লাভ করে কল্পনা ও অলৌকিক অন্ধ বিশ্বাস অথবা সেই বস্তুনিষ্ঠ ভৌগোলিকের মত অনুসরণ করে বলতে পারি ভারতভূমি তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই একপেশে ভাবে অবস্থান করেছে—হিমালয় পর্বতশ্রেণী তাকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী তাকে পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। তার জলভাগও বিশাল, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট তার অভ্যন্তরভাগ থেকে বের হয়ে এসে মালবের মতো অবস্থান করছে এবং সে তার সমুদ্রের আহ্বান শুনেছে কিন্তু সামুদ্রিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা কমই আছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে তীব্র বিতর্ক করারও কিছু নেই। প্রাকৃতিক বাধা, সে যতই বড় হোক, কোনও সময়ই মানুষের অনতিক্রমনীয় নয়। মানুষ সর্বত্রই তার বাধা ডিঙিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে এবং তার প্রচেষ্টা সফলও হয়েছে।

এইভাবে চারদিক থেকে উত্থিত ধ্বনি শুনে শুনে বিরক্ত প্রাচীন ভারতীয়রা তাদের সংস্কারের আবরণ তা স্বাভাবিক হোক বা, অস্বাভাবিক হোক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে এবং যত দ্রুত পেরেছে ভারত মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছে। ভূমধ্যের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের অনেক দিক থেকে মিল আছে। মিঃ জিমনার্ন মন্তব্য করেন,

'এমন ভূ-ভাগ চারদিক থেকে যা তালাবন্ধ. গ্রীষ্মের ভূ-মধ্যসাগর মনে হয় কোনও দ্বীপের হ্রদ, এমন ভদ্র শান্ত এর প্রকৃতি আসলে দ্বিকোটিক। একটি হ্রদমাত্র যখন দেবতারা দয়ালু, মহাসমুদ্র যখন তারা আক্রোশপূর্ণ'।[১]

ভারত মহাসাগর, যা আসলে ভূমধ্যসাগরের বর্দ্ধিত রূপ, যার দক্ষিণাংশের উপকূল কার্যত উধবত্ত এবং যা না সাগর না হ্রদ কিন্তু ব্যাজেলের অনুসরণে বলা যায়, অর্ধেক সাগর। উত্তরাংশের মধ্যভাগের চরিত্রবৈশিষ্ট্য তার সত্যকার সাগর হয়ে ওঠার হাইড্রোস্ফেরিক ও অ্যাটমোস্ফেরিক স্বভাব থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তার যেমন বায়ুপ্রবাহ তেমনি স্রোতপ্রবাহ নিকটবর্তী স্থলভাগের কারণে অনিয়মিত এবং এলোমেলো। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ মুহূর্তে মধ্যসাগরে বিতাড়িত করে নেয়। উপকূলের আকর্ষণে যে সময় কাটাবে তার কোনও উপায় নেই।

"ঐতিহাসিক প্রত্যুষ থেকে ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশ মুক্তপথ বলে খ্যাত। আলেকজান্ডারের পুরাতন সাগরের যাত্রাপথ যা প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পুনরাবিষ্কার পুরাতনের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হবে অনেক আধুনিক ঘটনা। এই মুক্তপথ ধরে ভারতীয় ঔপনিবেশিক, ব্যবসাদার এবং পুরোহিতরা ভারতীয় সভ্যতার উপকরণ পূর্বাংশের শেষতম সীমায় অবস্থিত সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বহন করেছেন এবং প্রতীচ্যের পণ্য সম্ভার, বিজ্ঞান ও ধর্ম চলাচল করেছে পাশ্চাত্যের সীমা পর্যন্ত ইউরোপ ও অফ্রিকার সীমান্ত পর্যন্ত। ভারত মহাসাগর তার নিজের মতো করে এক সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। এই সভ্যতার মধ্যে এক বিশাল অর্ধ-বৃত্তাকার ভূ-ভাগ অন্তর্ভুক্ত, যার বিস্তার জাভা থেকে আরিসিনিয়া পর্যন্ত, বা ব্যাপকতর বিস্তারের বিষয় ধরলে আবিসিনিয়া থেকে মোজাম্বিক পর্যন্ত তার সীমা।"[২]

"আরব সাগরীয় শক্তি বিকাশের অনেক পূর্বে হিন্দুরা ভারত মহাসাগরের ব্যবসাদার জাতি হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং পববর্তীকালে পূর্বআফ্রিকান উপকূলের ওমান ও ইয়েমেন-এর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বর্তমানে ম্যাচক্যাট অডেন, জাঞ্জিবার, পেমর, নাটাল বন্দরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবসাদারী সম্পর্ক স্থাপন করেছে।[৩]

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং স্বাভাবিক সম্পদ সম্পর্কিত এই প্রাথমিক

---

১. 'দি গ্রেট কমনওয়েলথ' ; পৃঃ ২০

২. অ্যালেন চার্চিল সেম্পিল : 'ইনফ্লুয়েন্স অব্ জিওগ্রাফিক এনভায়রণমেন্টস' ; পৃষ্ঠাঃ ৩০৯

৩. তদেব, পৃঃ ২৬৮

অথচ বিশদ আলোচনা থেকে প্রাচীন সভ্যতার অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারি।

মিশর থেকে শুরু করা যাক। অবশ্য প্রারম্ভেই স্বীকার করা ভালো যে, সভ্যতার ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্কের নজির হয়ে রয়েছে অস্পৃষ্ট এবং তা হয় ঐতিহ্য পরম্পরায় স্থাপিত প্রাথমিক ধ্বংসস্তূপের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে সংস্থাপিত রয়েছে। সময়ের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিদর্শনগুলি অবশ্য পরিপুষ্ট হয়েছে, দানা বেঁধেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় অর্থনীতিগতভাবে স্বাধীন মিশরীয়রা একটা সমৃদ্ধ স্থানে বসবাস করে এবং তারা এতটাই অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভোগ করে যে, তারা বিদেশী আদান-প্রদান অস্বীকার করে চলতে পারে। কিন্তু এ-কথা বলার অর্থ হল একটু বেশি বলা, কারণ যদিও এ-মন্তব্যের বিপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই তবুও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে যে-সব বিদেশী নিদর্শন মিলেছে তা এমন মন্তব্যের বিরুদ্ধে যথেষ্ট নজির বৈকি।

ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরীয়দের কোন প্রত্যক্ষ ব্যবসার সম্পর্ক ছিল এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। অতিকথন অবশ্য দ্বি-কোটিক।

হেরোডোটাস বলছেন, সিসস্ট্রিস, গার্ডিনার উইলকিনসন যাকে দ্বিতীয় রামসেস বলে বর্ণনা করেছেন, একটি বড় নৌ-বহরকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন, ভারত মহাসাগর প্রণালী বরাবর নিজ নৌবহর পরিচালনা করে অগ্রসর হয়েছেন এবং উপসাগরীয় দেশ সমূহ জয় করে নিয়েছেন। তাঁর স্থল বাহিনী গঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে।

মিশর থেকে ইসরায়েলদের জনস্রোত বিতাড়িত হওয়ার অনেক পূর্বে ভারতবর্ষ তার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ফিলোটেরাস বন্দর ছিল সেই প্রাচীন ব্যবসার বাণিজ্যকেন্দ্র।

"ভারতের সঙ্গে মিশরীয়দের সেই ক্রান্তিকালে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে কিনা, বা আরবদেশ দিয়ে তাদের বাণিজ্য সম্ভারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাণিজ্য করত কিনা, নির্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু একটা পরোক্ষ বাণিজ্যও তাদের প্রচুর বাণিজ্য সম্ভার চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর থিবস এবং সমাধিগুলি থেকে আমরা জানতে পারি ভারতীয় বাণিজ্যসম্ভার সত্যিই মিশরে পৌঁছত।"[১]

১. 'ডিসকুইজিসন অব্ ইন্ডিয়া', উইলকিনসন গাডিমার ; পৃ: ১৬১

"ভারতীয় দ্রব্যাদি যে মিশরে আসত, যোসেফের আগমনের সমকালেই আসত তার প্রমাণ হল ব্যবসায়ীদের বিক্রয়যোগ্য ভারতীয় মশলা। পান্না জাতীয় মণি, উজ্জ্বল নীলকান্ত মণি, হ্যাকমাটইল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি যা তৃতীয় থুতমার সময়ে লক্ষ্য করা গেছে, পরবর্তী ফারাওরাও বলেছেন যে সে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়েছে।"[১]

ব্যবসা বাণিজ্যের সতর্ক প্রহরায় থাকে সংস্কৃতি : একথা প্রাচীন কাল সম্পর্কে যতটা সত্য আধুনিক কাল সম্পর্কে ততটা সত্য নয়। প্রাচীন কালের মরু শকটবাহিনী কেবল পণ্যদ্রব্য বহন করত না, সভ্যতাও বহন করত। তারা সে সভ্যতার বিস্তার ও ব্যাপকতা দিয়েছে। এ-প্রকার বাণিজ্যিক সংযোগ মিশরীয় স্থাপত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। জেমস্ ফারগুসন-এর স্থাপত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪২-৩-তে বলা হচ্ছে স্থাপত্যের মনোলিথিক অকসাম ভারতীয় অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি "ধারণা হল মিশরীয় সূক্ষ্ম কারুকাজ হল ভারতীয়। একটি ভারতীয় নয়তলা প্যাগোডা অবলম্বনে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গঠিত নয় মিশরীয় প্যাগোডা।" তিনি বুদ্ধগয়ায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মন্দিরের অনুরূপতা লক্ষ্য করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন," এই ভারতীয় মিশরীয় শিল্পের অদ্ভূত পরিণয় এমন স্থানেই প্রত্যক্ষগোচর হতে পারে যেখানে দুব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়ে তাদের বাণিজ্যিক সংহতির প্রতীক সৃষ্টির জন্য স্থাপত্য চুক্তি ও মেলবন্ধন সৃষ্টি করে।"

পশ্চিম এশিয়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বাসিন্দা দ্রাবিড়দের সম্পর্ক নির্ণয় বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দ্রাবিড়রা প্রাচীনতম বাসিন্দা হলেও কোনওভাবেই আদিম বাসিন্দা নয়। মি: গুস্তভ ওপার্ট বলেন, "এখন কাঁচিলিপির পাঠোদ্ধারের ফলে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তুরানীয়ান সাম্রাজ্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। এই সভ্যতা যদিও এক প্রকার অদ্ভুত বস্তুতান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট হয়েছিল তৎসত্ত্বেও কিছু শাখায়, যেমন কলা ও বিজ্ঞান শাখায়, উন্নতি সাধিত হয়। এই তুরানীয়ানরা যদিও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পরস্পরে যথেষ্ট পৃথক ছিল, আমাদের সমকালে তারা ভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত যদিও সেকালে ছিল আরিয়ানা এবং পার্শিয়া ভুক্ত। ইউরোপে ইস্থোনিয়ানগণ তুরানীয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার অনেক স্থানে তারাই জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, চীন দেশের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের সভ্যতার ভিত্তিভূমি রচনা করে থাকে" এই তুরানীয়ানরা "প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তুরানীয়ানদের বাড়ি ঘর লেক অরাল এর আশেপাশে গড়ে ওঠে এমন অনুমান করা হয়। সেখান

১. 'দি অ্যানসিয়েন্ট ইজিপ্সিয়ান ; উইলকিনসন গার্ডিমার ; পৃ: ২৫০

থেকে তারা এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেড় হাজার বছর ধরে সেখানে মহা অধিকার নিয়ে রাজস্ব করে।" ইজিপ্সিয়ান, এশাইরিয়ান, অক্কডিয়ান্স, সুমেরীয় ফোনেশীয় সবাই তুরানীয় জাতির শাখা। "মিশরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রায় ২৫০ বছর পর অর্থাৎ ২৫০০ খ্রী: পূ: এবং ব্যাবিলন এ আক্কাডিয়ান বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর আর্যরা ছল দিয়া জয় করে এবং একই সময়ে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের কন্নানাইটস্ এবং পারস্যের দ্রাবিড়দের বিতাড়িত করে। তারা প্রথমোক্তদের ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে, এবং শেষোক্তদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় ভারতেরই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।" আর্যরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তখন তারা দ্রাবিড়দের অদম্য প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

এ-কারণে খ্রী: ১৫০০ এর মধ্যে তারা পাঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি।[১] গুরুত্ব ও ক্রমপর্যায়ের দিক থেকে পরবর্ত্তী সম্পর্ক স্থাপনার বিষয় হল ভারতের সঙ্গে ভারতীয় রাজতন্ত্রের। বাইবেল-এ তার উল্লেখ পাওয়া সত্ত্বেও লেখকগণ ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যে এর তেমন গুরুত্ব প্রদান করতে নারাজ। প্রমাণ এমন গুরুত্বপূর্ণ যে তাচ্ছিল্য করা যায় না। প্রধান ভূমিতে অবস্থান করা সত্ত্বেও জুড়িরা ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হয়নি। তার কোনও জলভাগ ছিল না, ফলে কোনও পোতাশ্রয়ও ছিলনা। তাকে সম্পূর্ণরূপে মিশর ও সিরিয়ার উপর নির্ভর করতে হত। তারাই ভারতের জল ও বাণিজ্যিক পথ নির্ধারণ করে দিত। ভারত পাল তোলা নৌকায় করে মালপত্র ইয়েমেন অথবা আরবদেশে নিয়ে যেত। ভারতীয় দ্রব্যের ভাল বাজার ছিল ইয়েমেন। এটি ছিল বিতরণ কেন্দ্র। এখান থেকে ভারতীয় পণ্য ক্যারাভানের সাহায্যে সিরিয়া অথবা মিশরীয় জাহাজে করে মিশরে যেত।

"প্রাচীন যুগের থেকে মিশর এবং সিরিয়া উন্নতমানের সভ্যতা ছিল, সেখানে ভারত থেকে যেত রসনা পরিতৃপ্তকারী মসলা, সৌরভযুক্ত দ্রব্যা,দি ধাতু দ্রব্য, সুগন্ধযুক্ত মূল্যবান কাঠ, বিভিন্ন দামী রত্নাদি, রকমারি হাতির দাঁতের কাজ। এই সবই মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী যা উন্নত ভারতীয় মৃত্তিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হত।[৩] রাজা সলোমন, সিংহাসন আরোহনের পর ভারতীয় বাণিজ্যের উপর

১. তুলনীয় : গুস্তভ ওপার্ট, "অন দ্য এনসিয়েন্ট কমার্স অব ইন্ডিয়া" (On the Ancient Commerce of India "in" the Madras Journal of the Literature and Science 1878), পৃ: ১৮৯,৯০,৯১ ; for Parallels between Malbarian and Egyptian customs of Primitive Civilization by E.J. Simcox., Vol I ; PP-183,550,554,569,570,574., Vol-II P-473

২. তুলনীয় : W. Robertson, 'Disquisition', P-9-10

৩. I. Lenoment and F. Chenellier, Ancient History of the East, Vol-I., P-144.

নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন মিশরীয় শক্তি পতনের মুখে এবং এটাও উপলব্ধি করেন লোহিত সাগরের উপর অবস্থিত সমুদ্রিক বন্দর আইডুমি (Idumee) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। যে বন্দরটি তার পিতার বিজয় থেকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন সেখান দিয়ে ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহুদিরা নাবিকের কাজে দক্ষ ছিল না তাদের ফিনিসীয় রাজার সহায়তার জন্য হাত বাড়াতে হয়েছিল। ফিনিসীয়রা নৌ বিদ্যায় ছিল অগ্রগামী। ভারতের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। মি: রবার্টসনের মত অবশ্য অনুকূলে ছিল। দেশের দারিদ্র্য ফিনিসীয়দের বাণিজ্যের দিকে যেতে বাধ্য করেছিল। এ-সম্পর্কে তিনি বলেন, "তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ভালই হত, বিশেষ করে নৌ বাণিজ্য তাদের যখন অনুন্নত ছিল, তারা কিন্তু ভারতের সঙ্গে জলপথে সে সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু করতে পারেনি। এই বাস্তব বুদ্ধি তাদের পশ্চিম দিকে সরে যেতে এবং আরব উপসাগরে ব্যবসাকে সংহত করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এর পর থেকে তারা ভারতের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপন করেছে, পাশাপাশি আফ্রিকার পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূল বরাবর ব্যবসা করেছে। আরব উপসাগর থেকে জায়ার-এর দূরত্ব অবশ্য যথেষ্ট এবং মালপত্রের গাড়ি বোঝাই করে ভূমধ্যসাগর থেকে আরব উপসাগরের নিকটবর্তী বন্দর ফিনোকোলুরা আসা অনেক সহজতর এবং অনেক বাস্তবমুখী। এর পরিবর্তে আরব উপসাগরের বিপরীত কূল দিয়ে প্রাচ্যের সম্পদ নীলনদ পর্যন্ত বহন করা অনেক সহজ। ফিনোকোলুরাতে মালপত্র পুনরায় জাহাজভর্তি করা হয়। তৎপর টায়ার পর্যন্ত বহন করা হয় সহজ পদ্ধতিতে জলপথে, এবং পৃথিবীর নানাস্থানে বিলি ব্যবস্থা করা হয়। প্রাচ্যের সঙ্গে নৌ-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য জানা পথের তুলনায় এই পথই হল ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রাচীন ও পছন্দমতো পথ এবং আমাদেরও পক্ষপাতিত্ব রয়েছে এই পথের প্রতিই। প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অন্যান্য জাতির তুলনায় ফিনিশিয়ানরা ভারতীয় উৎপাদন অধিক মাত্রায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করত।[১] মি. রবার্টসনের বক্তব্যের সমর্থনে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তা হল ফিনিশিয়ানরা মুদ্রা যা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল।

রাজা সলোমনও অনুপ্রাণিত করে থাকবেন, অথবা প্রতিবেশিদের সহায়তায় টায়ারের রাজা হিরমের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে থাকবেন এবং এলাথ (Elath) এবং এজিয়নগেহার-এ (Eziongeher) বাণিজ্য পথ নির্মাণ করবেন। ফিনিশীয়

১. 'ডিসকুইজসন; ডব্লু. রবার্টসন ; পৃ: ৭-৮

নাবিকদের সহায়তায় বলিয়ান হয়ে সে বাণিজ্য পোত কিউফির (Qphir)-তে গিয়েছিল এবং অনেক সম্পদ নিয়ে ফিরেছিল। দুই রাজা তা উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। কিউফির (Qphir) অবস্থান আর একটি অমীমাংসিত বিষয়। কিন্তু বাস্তব উপযোগিতার দিকে তাকিয়ে প্রফেসর ল্যাসেন ভারতের গুজরাটে অবস্থিত অভিরার সঙ্গের অভিন্ন করে দেখেছেন এবং মতপার্থক্যের বিষয়টা বন্ধ করে দিয়েছেন। তিন বছরের ব্যবধানে বাণিজ্য পোত পুনরায় যাত্রা করে এবং দেশকে সমৃদ্ধ করতে অনেক সম্পদ নিয়ে ফেরে। এত সম্পদ আনা হয়েছিল যে, জেরুজালেমের রৌপ্য স্তম্ভ পূর্ণ করে দিয়েছিলেন সে দেশের রাজা, চিরহরিৎ বৃহৎ বৃক্ষ ডুমুর গাছের মতো বাড়ির আশেপাশে যত্রতত্র প্রচুর জমি থাকত।[১] এইভাবে বাণিজ্যের সুবিধাগুলি জনসাধরেণর জন্য সংরক্ষিত ছিল বিপদ সংকেতগুলিও ব্যক্ত করে দেওয়া হত। সুতরাং ডীন স্ট্যানলি (সেনাই এবং প্যালেস্তাইন পৃ: ২৬১তে) যেমন বলেছেন, "এ রাজধানী এমন স্থান যেখানে দাঁড়টানা পানসি নৌকা যায় না, বড় জাহাজও চলাচল করে না (ঈষা XXXIII21), " চলাচল করে না ঠিক, পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণা অনুসারে এটাই হল দুর্বলতা ও বিপদের বার্তা, কিন্তু আবার সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা।"

ভারত ও জুডিয়ার মধ্যে যে বাণিঝ্য সম্পর্ক ছিল, তা সলোমনের আমলের সঙ্গে মেলে না। তা ছিল অতি প্রাচীন সলোমনের অনেক আগে কফির-এ উল্লেখিত হয়েছে এবং আই ক্রনিকল্‌স XXIX, 4, আই কিন্‌ৎস্‌ XXII 48 এবং ঈষা XIII 12-তে তার উল্লেখ আছে। এই জীবনীমূলক প্রমাণপঞ্জী ভাষাপঞ্জী দ্বারাও প্রমাণিত হবে। যেমন হিব্রু শব্দ টুকি (Tuki) বা কবিতায় ব্যবহারযোগ্য শব্দ টোকেই (Tokei) তামিল-মালয়ালম শব্দে যার অর্থ দাঁড়ায় ময়ূর। অথবা হিব্রু শব্দ অহালিম (Ahalim) অথবা অহোলোথ (Aholoth)—ঘৃতকুমারী (aloes)—যা তামিল-মালয়ালম শব্দ অঘিল (aghil) এর বিকৃত রূপ।

ব্যাবিলোনিয়ার উত্থান প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক কাজকর্মের জল-বিভাজিকা। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর সংযোগস্থল যা ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে পারস্য-উপসাগরকে যোগ করছে এবং উচ্চ ও নিম্ন এশিয়ারও যা সংযোগ সেতু সৃষ্টি করছে—সেই বিশেষ অবস্থান হেতু ব্যাবিলন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্প-বাণিজ্যের বিশাল সংগ্রহশালা হয়ে উঠেছে। প্রাচীন পৃথিবীর সর্বাংশের সঙ্গম স্থল ছিল এই স্থান। মি. কেনেডি বলেন, এই তথ্যাদি আমাদের এই বিষয়ে সচেতন করে দেয় যে, ষষ্ঠ বা সপ্তম খ্রী: পূর্বাব্দে বিশেষ করে ষষ্ঠ খ্রী: পূ: ভারত ও ব্যাবিলনের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য

১. আই কিনগো X; পৃ: ২৭

সম্পর্কে সমুন্নয়ন ঘটেছিল। মুখ্যত দ্রাবিড়দের হাতে তা সম্পন্ন হলেও আর্যদের তাতে ভূমিকা ছিল, এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই সময়ে আরবদেশ, আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল এবং চিনদেশের উপকূলে জমায়েত হতে দেখে আমরা সন্দেহ করতে পারি না যে, তারা ব্যাবিলনেও ব্যবসা বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। কিন্তু ষষ্ঠ এবং সপ্তম খ্রীস্টাব্দই ছিল ব্যাবিলনের সমুন্নতির স্বর্ণযুগ। সেই ব্যাবিলন যা সেঙ্কারির কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পুনর্নির্মিত হয় ঈষারহাদ্দনের দ্বারা সেই ব্যাবিলন যে তার মন্দিরময় ঐতিহ্য ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে নতুনভাবে নতুন রূপে বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে পৃথিবীর কাছে আবির্ভূত হয়। তার শক্তির কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। তার অভ্যত্থান ঘটে এবং প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী অত্যাচারী নিনেভিকে হটিয়ে দেয়। নেবুচান্দনেজারকে নিয়ে সে পৃথিবীর বিসুরে পরিণত হয়। কিন্তু মহানুভবতার প্রকৃত রহস্য ধরা রয়েছে তার প্রাচ্য সম্পদের এক চেটিয়া জমায়েত-এ, চলদিনের জাহাজী চিৎকারে, তার তারুণ্যের সমাবেশে—যারা তার ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের জীবনে বার বার স্পন্দন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এইভাবে তার জাতীয় পরশ্রীকাতরতা দূর হয়। পাহারাও নিকো (৬১২-৫৯৬ খৃ: পূ:) খাল পুনরায় চালু করতে তার মানুষজনকে উৎসর্গ করে ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, যা সেটি আই বা নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত স্থাপনা করেন। শুধু স্থাপনা বা খনন নয়, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ফিনিশীয়, নৌ-বাহিনী আফ্রিকা বরাবর পরিচালনা করেন এক নতুন বাণিজ্য জগৎ অধিকার করার জন্য। এবং অনেককাল আগে ভারতের সম্পদ নিয়ে পোর্তুগিজ ও স্প্যানিয়ার্ডস-এর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুমান করা গিয়েছিল এবং মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের মধ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে তা দূর করে সমতা সৃষ্টির প্রয়াসও করা হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল তখনই যখন পৃথিবী এক ও কুড়ি শতাব্দীর তরুণ ছিল।"[১]

এই বাণিজ্যিক সংযোগের কথা ভারতীয় ইতিহাসে/সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় সাগর সেখানে গভীর ভূমিকা পালন করে। মোকার—রাক্ষুসে মাছের কথা পরোক্ষে উল্লেখিত হয়। বৈদিক মূর্তি সকল পশ্চাতে পড়ে যায়। একালের হিন্দুমত রহস্যময় সৃষ্টিকর্ম অনুসন্ধান করতে তৎপর হয়েছিল তার নজির পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণে, যেখানে অদ্ভুতভাবে ব্যক্ত হয় যে," সৃষ্টির আদিশক্তি এ পৃথিবীকে সাগর-শীর্ষে সংস্থাপন করেছেন, সেখানে তা শক্তিশালী নৌ-যান হিসাবে ভাসমান এবং যার বহুবিস্তৃত উপরিতল কখনই জলতলদেশে নিমজ্জিত হয় না।" এ সমস্ত সাহিত্য বাণিজ্যের স্বাদু গন্ধপূর্ণ এবং মূলত বৈদিক সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র এতটাই যে, অধ্যাপক

১. জে. কেনেডি, জে আর এ এস, ১৯৯৮ ; পৃ: ২১০-৭১

ম্যাক্সমূলার তাঁর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (History of Ancient Sanskrit Literature) গ্রন্থে বলেছেন, বৈদিক মন্ত্র বা স্তোত্রের আদি ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা এতটাই পরিবর্তিত হয়ে গেল কিভাবে, সমগ্র ব্রহ্মমানস খুঁজে পাওয়া যায় না। এরূপ বিচ্ছেদ কি করে সম্ভব হল অনুধাবন করা বিশেষ শক্ত যদি ঐতিহ্য পরম্পরায় আকস্মিক বা আক্রমণাত্মক বিচ্ছেদ কোথাও না ঘটে। এই বিচ্ছেদ বিদেশি প্রভাবেই সম্ভব যা কেবলমাত্র বাণিজ্যের পদচিহ্ন অনুসরণ করেই সম্ভাবিত হতে পারে। ভারতের উপর নিপতিত এই বিদেশি প্রভাব অবশ্যই হবে ষষ্ঠ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীর" এবং অতি অবশ্যই "বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনা নয়, কারণ এই মহান শিক্ষক দেখেছিলেন প্রত্যেক ভারতীয় জন্মান্তবাদে আস্থাশীল যা কিনা বৈদিক বিশ্বাস নয়।" এবং অবশ্যই তা বিদেশি হবে।[২] সুতরাং ভাবা যায় না যে, হিন্দুদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি এই সময়ের বিষয় এবং তখন থেকেই সামুদ্রিক চাষ-আবাদে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। দীঘাতে প্রাপ্ত কেভাধু সূত্র (খৃঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দী) বুদ্ধ কথাটি উল্লেখ করেছেন নীতিগল্প বলার প্রসঙ্গে।

"অনেকদিন আগে নাবিকেরা যখন সমুদ্রযাত্রা করত তখন তারা সঙ্গে নিত ডাঙা খোঁজা পাখি। জাহাজ সমুদ্রে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে নাবিকেরা ডাঙা খোঁজা পাখি ছেড়ে দিত। এই পাখি পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম বা উত্তর দিকে উড়ে উড়ে বেড়াত, মধ্য বিন্দুতে পৌঁছে যেত এবং বহু উপরে উঠে ডাঙার সন্ধান করত। যদি দিগান্তরেখায় সে ডাঙা দেখতে পেত, সেখান থেকে সে পুনরায় জাহাজে ফিরে যেত। এরূপ আচরণ করত।" মি. রিহস্ ডেভিস মন্তব্য করেন, "এরূপ নীতিকথা মূলক গল্প সাধারণত বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হত না। আসলে যে সত্যটা ধরা পড়ে তা হল সাধারণ জ্ঞানের বিষয়।"[১]

ব্যাবিলন পতন তার উত্থাপনের মতোই আকস্মিক এবং এ-সব ঘটনাও ঘটে রাজা দারিয়ুস (৫৭৯-৪৮৪ খ্রীঃ পৃঃ)-এর রাজত্বকালে। প্রাচীনকালে যে বাণিজ্যিক স্মৃতি ফলক অধিক সংখ্যায় চোখে পড়ত খ্রীষ্টয় পঞ্চম শতক থেকে তা আর তেমন চোখে পড়ে না। পারস্যের বিজয় কেবল যে ব্যাবিলন ধ্বংস করেছে তা নয়, মিশর পর্যন্ত তার বিজয় বিস্তৃত করেছে। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যে খাল খনন এরা হয়েছিল তা শুকিয়ে এসেছিল। এবং নদী বাহিত জলধারা বাঁধ-এর জন্য ব্যাহত হতে লাগল এর ফলে আরবরা বাণিজ্যের

১. কেনেডি, জে আর এ এস, ১৯৯৮ ; পৃঃ ৪৩২

কদর বুঝতে পারল, ইয়েমেন, পলমায়ার ও ব্যাবিলনের ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহ দেখাতে লাগল। চলদিন, দারিয়ুসের অভিযান সত্ত্বেও, ঘেরহা ও অন্যত্র ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকল।

দারিয়ুসের বিজয় এক বিশাল সাম্রাজ্যকে তার শাসনাধীনে এনে দিয়েছিল। এই সাম্রাজ্য আলেকজান্ডারের সাম্রাজকে স্পর্শ করেছিল। দুইজন সম্রাটই যদি ভূমির জন্য ক্ষুধার্ত হন, তবে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বসবাস করতে পারেন না। সংঘাত অনিবার্য ছিল। তাঁর বিজয় অভিযান পরিচালনা করার জন্য আলেকজান্ডার সুযোগ খুঁজছিলেন। এক অভিযানের দাপটে তিনি দারিয়ুসের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে ছিলেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করে ফেললেন মিশর, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত।

আলেকজান্ডারের এই বিশাল অভিযানের অভিপ্রায় অবশ্য অনেকটাই অনুমান ভিত্তিক। দারিয়ুসের হাতে যে অপমান যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছিল তা অন্যতম কারণ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। অধ্যাপক ল্যাসেন অবশ্য আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে মন্তব্য করেন, স্বর্ণক্ষুধাই আলেকজান্ডারের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। এবং গ্রীসে ভারতীয় পণ্যের উপস্থিতি তাতে প্ররোচনা সৃষ্টি করেছিল। গ্রীস ও জুডিয়া বাণিজ্যে নিযুক্ত মানুষের মুখের কথায় এই বাণিজ্যিক সংযোগের প্রভাব পড়েছিল। চাউল (ওরিজা), আদা বা জিঞ্জার (জিঞ্জিবার) এবং দারুচিনি বা চিন্নামন (কার্পয়িন) এই সব গ্রীক নামের তামিল প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়েছিল যথাক্রমে ওরিসি, ইন্সিভার এবং কারাভা। গ্রীক শব্দের সঙ্গে তামিল শব্দের এই মিল প্রমাণ করে গ্রীক ও তামিল শব্দের ওতপ্রোত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রীক ব্যবসায়ীরা যেমন ঐসব দ্রব্য তেমনি এই নামগুলিও ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করেছিল তামিল ভূমি থেকে। আবার যবন (Javan), যে নামে এই পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যবসায়ীরা পরিচিত হত, প্রাচীন সংস্কৃত কবিতায় আবশ্যিকভাবে গ্রীকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত তা গ্রীক শব্দ যাওনিস (Jaonis) থেকে উৎপন্ন যার অর্থ দাঁড়ায় তাদের নিজেদের ভাষায় গ্রীক।"[১]

আরও একটি শব্দ আছে, এই শব্দগুচ্ছের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, যা গ্রীকে হাতির সমান্তরাল শব্দ, যেমন এলিফস্ (Elephas) যা মিশরীয় ভাষায় ইবু (Ebu) এবং সংস্কৃতে ইভা (Ebha), তা অধ্যাপক ল্যাসেনের মতে সংস্কৃত থেকে জাত।

আলেকজান্ডারের মতলব যেরূপেই থাক না কেন, ভারতবর্ষ নামক দেশটাকে

১. 'ইন্ডিয়ান শিপিং' ; পি. কে. মুখার্জি ; পৃঃ ১২১

ভালোভাবে জানার পর তাঁর এমন ধারণাই হয়েছিল যে, দুই দেশকে এক বাণিজ্যিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ বাঁধনে বাঁধতে হবে।

আলেকজান্ডার দেখলেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতমানের ব্যবসাপত্র একচেটেভাবে জায়ারের ফিনিশীয় কর্তৃক পরিচালিত। তারাই নাকি পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতীয় পণ্য পৌঁছে দেয়। ভারতের সম্পদ সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে ফিনিসীয়দের প্রতি তার ঈর্ষার ভাব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। "এই সময় পর্যন্ত তিনি যে দেশ দেখেছিলেন তা ছিল এত ঘনবসতিপূর্ণ, সুসভ্য, প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, শিল্প সম্ভারে পরিপূর্ণ এবং তা ছিল ভারতের সেই অংশের মতো, যেখানে তিনি সেনাবাহিনী পরিচালন করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে সর্বত্র বলা হয়েছিল, এবং সম্ভবত অতিরঞ্জন করেই, ভারতের গাঙ্গেয় অংশ ছিল যথার্থ উন্নত। এবং এ-পর্যন্ত তিনি যা দেখেছেন, তার থেকে অনেক উন্নত ছিল ঐ গঙ্গাবাহিত অংশ। ফলত, আশ্চর্যের ব্যাপার কিছু নয় যে, সেই মহান নদী যে ভূভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত সেই ভূভাগ দেখা ও জয় করার আগ্রহ তাঁর দেখা দেবে এবং তার সম্পদ, রাজত্ব বা খ্যাতি সেখানে তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছে এসব তিনি ভাববেন।"[১] উত্তর ভারতের যে সব অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন তা তিনি পুরুকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। পুরু তাঁর সহযোগীতে পরিণত হয়েছিলেন। এর পরিমাণ ছিল চার হাজার শহরের কম নয়। মি. রবার্টসন মন্তব্য করেন, "খুব কম করে হলেও, তা জাতি বা বর্ণ বা শহরের একটা অস্পষ্ট ধারণা কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বিরাট সংখ্যক বলতে হবে। সিন্ধু নদীপথে নৌবাহিনী যেমন অগ্রসর হয়েছে, নদী পাড়ের গ্রামগুলির লোকজন যে সম্মান তাদের দেখিয়েছে তা পুরুরাজ-এর প্রতি প্রদর্শিত সরকারি সম্মানের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।[২]

তাঁর (আলেকজান্ডারের) সেনাপতি পলেমি, অরিস্টবুলাস (Aristobulus) এবং নার্কাস (Nearchus)-এর লেখা স্মৃতিকথা অথবা জার্নাস ভারতবর্ষ সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যাদি গ্রীস অথবা ইউরোপবাসীর কাছে খুলে দেয়। মিশর জয় করার পর আলেকজান্ডারের ইচ্ছা হয়েছিল, ভারতের সঙ্গে গ্রীসের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এরকম উদ্দেশ্য পোষণ করে তিনি নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন করেন। সে শহর প্রাচীনকালে বৃহত্তম বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বহু রাধাবিপত্তি পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই মর্যাদা তার অক্ষুণ্ণ থাকে।

১. 'ডিসকুইজিসন' ; ডব্লু. রবার্টশন ; P: ১৬-১৭
২. তদেব, পৃ: ২২

তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন ভারতবর্ষকে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করবেন স্থায়ীভাবে এবং যদি তিনি বেশি দিন বেঁচে থাকতেন, সে স্বপ্নের সবটা না হলেও আংশিক সাফল্যমণ্ডিত করতেন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি তাঁর সাম্রাজ্য পত্তনের পর পরই মারা যান ফলে তার সাম্রাজ্যও ছত্রখান হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রদেশের শাসকগণ সমগ্র সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। উচ্চাশা প্রণোদিত হয়ে, একে অপরের থেকে বেশি শক্তিধর হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এবং ব্যক্তিগত আগ্রহ ও শত্রুতাবশত তারা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিল। এ রকম ধারণা করা ভুল হবে যে, আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পতনের পরই ভারত ও গ্রীসের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়, পক্ষান্তরে বলা যায়, সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর হয়। আলেকজান্ডারের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী উদ্যোগী সেনাপতি সেলুকাস পারস্য সাম্রাজ্য জয় করার পর আলেকজান্ডার-বিজিত প্রদেশগুলি তাঁর নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে চাইলেন। এ-রূপ জয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক লাভালাভ সৃষ্টি করা এবং তার বিশাল সৈন্য বাহিনীর দ্বারা তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণ করা সম্পর্কে সেলুকাস পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁর পক্ষে অনুকূল হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত (গ্রীকেরা সন্দ্র কোটাস) ছিলেন একজন সদাশয় সার্বভৌম শাসক। মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যে তিনি ছিলেন একজন আধুনিক মানুষ, যাঁর বুদ্ধি ও বীরত্ব দুইই ছিল। সেলুকাস তার শত্রুপক্ষের অধিকতর শক্তিমত্তা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পেরে শান্তিস্থাপনে উদ্যোগী হলেন এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিসকে তাঁর রাজদূত হিসাবে প্রেরণ করলেন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করতে মেগাস্থিনিসের পর প্রেরণ করলেন দায়ামাকাসকে। গ্রীকরা দীর্ঘদিন ধরে গ্রেসিয়-ব্যাক্ট্রিয়ান-এর মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করেছে যদিও তার কলেবর ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিচার করার উপকরণ খুব কমই আছে।

চীনা-ঐতিহাসিকেরা আমাদের জানাচ্ছে, যে যিশুখ্রিস্টর জন্মের একশ ছাব্বিশ বছর আগে তাতার যাযাবর উপজাতির একটি শক্তিশালী বড় দল চীনা আবাসস্থল থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং বহুসংখ্যক দলের তাড়া খেয়ে পশ্চিমাঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হয়। যদিও স্থলপথে যোগাযোগ এ-ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হল, আলেকজান্দ্রিয়া সমুদ্রপথে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়েই থাকল। লাগস-এর পুত্র পলেমি তার শাসনকালে ভারতীয় বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর পুত্র ফিলাডেলফাস ভারতীয় পণ্যসামগ্রী সরাসরি আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য লোহিতসাগর ও নীলনদকে যুক্ত করে একটি খাল খননের কাজে হাত দেন।

প্রকল্পটি অবশ্য ছিল খুব-ই বিশাল এবং ফলে তা বাতিল করা হয়। তিনি অবশ্য লোহিতসাগরের পশ্চিমাংশের উপকূলে একটি নগর নির্মাণ করেন এবং নাম দেন বেরিনিস্ এবং তা ভারতের প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্য চলাচলের বন্দর হয়ে ওঠে।

"কিন্তু যখন-ই মিশর ও সিরিয়ার রাজারা তাঁদের নিরতিশয় আগ্রহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব নিয়ে তাদের প্রজাসাধারণের জন্য ভারতীয় পণ্যের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হলেন তখনই এমন একটা শক্তি পাশ্চাত্যদেশে জন্মলাভ করল যা উভয়ের ক্ষেত্রেই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। সৈন্যশক্তি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাহায্যে রোমানগণ ইতালি ও সিসিলিকে হাত করে শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাতন্ত্র কার্থেজকে পরাভূত করল। খ্রী: পূ: ৫৫তে ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীস জয় করল, সিরিয়ায় তাদের রাজত্ব বিস্তার করল এবং অবশেষে বিজয়ী জয়পতাকা তুলতে উদ্যোগী হল মিশরের বিরুদ্ধে যে মিশর মহান বীর আলেকজান্ডার কর্তৃক বিজিত এবং তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট শক্তি হিসাবে মাথা তুলে অবস্থান করছিল।"

মিশর জয় করার মধ্য দিয়ে ভারতের আকর্ষণীয় বাণিজ্য-ভাণ্ডারের ফল পাওয়া গেল। কিন্তু এ পথই একমাত্র পথ ছিল না। আরও একটা পথ ছিল যে পথে ভারতীয় পণ্য পাশ্চাত্যে যেত। এটাও ছিল স্থল পথ, যে পথে সলোমন ভারতীয় পণ্য জুডিয়াতে জমায়েত করার ব্যবস্থা করতেন। ইউফ্রেটিস ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যভূমি দিয়ে এ পথে অবস্থিত টাডমোর বা ডালমায়রা শহর দিয়ে বিস্তৃত ছিল। রোমান কর্তৃক সিরিয়ার বশ্যতা স্বীকারের পর পালমায়রা স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছিল এবং জনবহুল ও উন্নত শহরে পরিণত হয়েছিল। এটা ছিল বিলি-ব্যবস্থার কেন্দ্র। কিন্তু রোমানদের লালসার সীমা ছিল না। জিজোবিয়ার পক্ষে সামান্যতম দুর্ব্যবহারের অজুহাত দেখিয়ে পালমায়রার রানিকে পরাভূত করে রোমানরা সেই শহরটাও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

কিন্তু পালমায়রার রোমান সাম্রাজ্যভুক্তিই রোমানদের পক্ষে ভারতীয় পণ্যের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ আরও একটি শক্তি, একইভাবে শক্তিশালী প্রাচ্যদেশে যার উত্থান সম্ভাবিত হচ্ছিল। পার্থিয়ানরা মধ্য-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সীমা রোমানদের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে ফেলেছিল। পার্থিয় ও রোমের বিবাদ খ্রী: পূ: ৫৫ থেকে খ্রী: পূ: ২০ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তখনও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত। "খ্রী: পূ: ৫৫ থেকে খ্রী: পূ: ২০-এর যুদ্ধ দুই সাম্রাজ্যের পক্ষে পারস্পরিক উন্নত নৈতিক সম্মানীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এবং অগাস্টাস রোমান নীতি হিসাবেই তা পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, ইউফ্রেটিস

নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্তই রোমান সাম্রাজ্যের সীমা নির্ধারিত থাকবে এবং তা অতিক্রম করে রোম-শক্তি বিস্তারলাভ করতে পারবেন।"[১]

খ্রিস্টীয় শতাব্দী থেকে রোম সাম্রাজ্যের দু'শ বছরের নীতি ছিল "ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, পার্থিয়ার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রকার স্থলপথ বন্ধ করে দেওয়া এবং চিরশত্রু রোমের সঙ্গে লাগাতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক পরিহার করে চলা।[২]

রোম সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপনের বিধিবদ্ধ অবস্থায় ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিশেষভাবে চালু এবং যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। ভারতীয় বন্দরের প্রতি আগ্রহ পরিচালিত হয়, ভ্রমণ ও বাণিজ্যিক বৃত্তান্ত রচিত হয় ব্যবসাদারদের সুবিধার জন্য। খ্রীস্ট্রীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন মিশরবাসী গ্রীক হিপ্পোলাস আবিষ্কার করেন যে, ভারতীয় ঋতুচক্রে বর্ষা আগমনের নির্দিষ্ট সময় আছে এবং এইভাবে নাবিকদের সমুদ্রে যাত্রার সুবিধা সৃষ্টি করে থাকে। এই সময়েই একজন গ্রীক ব্যবসায়ী লেখেন, "দ্য পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী" অথবা "গাইড টু দ্য ইন্ডিয়ান ওসেন বা ভারত সাগরের ভ্রমণের নির্দেশিকা" নামক গ্রন্থ। ভারতীয় বাণিজ্যিক কার্যাবলী সম্পর্কে এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ। আর একজন গ্রীক পর্যটক ইসাডোর অব দ্য চরকস্ পার্থেনিয়ান রাজ্যে ভ্রমণ করেন এবং বাণিজ্যিক বিবরণ সম্পূর্ণ করেন, সঙ্গে স্থলপথের বিবরণও লিপিবদ্ধ করেন। এর পূর্বে প্রাচ্য দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যক্তির হাত থেকে পেতে হয়। আরব বা ভারত সম্পর্কে সমস্ত তথ্য গোপন করত পণ্য দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা চিরস্থায়ী করতে। আর পার্থিয় ভারতীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে উপশুল্ক আদায় করতে চাইত। "যাতে এ-সব উন্নতমানের দ্রব্যাদি যা রোমে আমদানি করা হত তার উপর পার্থিয়ান সম্রাট বেশি বেশি উপশুল্ক লাভ করতে পারে, আরবরাও অনুরূপভাবে লাভবান হতে পারে, না হলে বন্দরে রোম কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা, ভারতীয় দ্রব্যাদিও তার নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার ও রোমের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।"[৩]

কিন্তু যাকে বলা যায় আধুনিককালের কলম্বাস সেই হিপ্পোলাস কর্তৃক মৌসুমী বায়ুর আবিষ্কার রোমানদের দীর্ঘকালের চাহিদা পূরণ করল। জাতীয় শক্তির চরিত্র পরিবর্তনের ফলে ভারত মহাসাগরে তার প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করল। পেটিয়া

---

1. Isidore of charax "Parthian Stations"; Ed. W. H. Schoff; P-21
2. Isidore of charax "Parthian Stations"; Ed. W. H. Schoff; P-19
3. Periphus of the Erythean Sea; W. H. Schoff; P-5

(Petia) ও গেরহা, পলমায়রা এমন কি পার্থিয়—তাদের গতানুগতিক বাণিজ্য গতিমুখ পরিবর্তনের ফলে রোমানদের হস্তগত হল। দক্ষিণ আরবের হোমরাইট (Homerite) রাজ্য কঠিন সময়ের মুখোমুখি হল, তার রাজধানী ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, এমন কি গেল কিছু ভালো লোক, এবং যখনই ঘসানিভস্ রোমের ঘাড়ের উপর নত হয়ে পড়ল, আবিসিনিয়া ফুলে ফেঁপে উঠল তার পুরাতন শত্রুর নত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে। এ-সব ঘটনা ঘটতে থাকলে পরবর্তী সমুদয় ঘটনা পরিবর্তিত হতে পারত। ইসলামের হয়ত আবির্ভাব ঘটত না। এবং বৃহত্তর রোম তার আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি টেমস্ থেকে সরিয়ে গঙ্গাকেন্দ্রিক করে তুলত। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্যতা বড় কঠিন। যে সব সম্পদ রোমানদের হাতে পড়েছিল ক্রমশ তা বিজিত রাজ্যের বিদ্রোহ দমনের জন্য, নিজদেশে গৃহযুদ্ধ দমনের কারণে এবং বেগতিক ব্যবসার ভারসাম্য রক্ষায় অনবরত ধাতুমুদ্রা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সব ব্যয় হয়ে গেল। এ-ভাবে সম্পদ বা ধাতুমুদ্রা বাজে ভাবে ব্যয় হয়ে যাওয়াটা যে কঠিন বাস্তব ও আতঙ্কের কারণ সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই কারণ এতে উৎপাদন বাড়ল না, শিল্প দ্রব্য কিছু তৈরি হল না যে দেশে সম্পদ বাড়বে।

ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য সম্পর্কে আমাদের তথ্যের যথেষ্ট প্রাচুর্য আছে কিন্তু কোনওভাবেই তা প্রশ্নাতীত নয়।

তথ্য প্রমাণের প্রথম সূত্র হল ভারত ও সিংহল থেকে রোমে যে সব দূত প্রেরিত হয়েছিল তারা।

প্রথম দূত আসেন সিংহল থেকে এবং প্লিনির বিবরণ থেকে তা জানা যায়। কিন্তু সঠিক তারিখ জানা যায়নি। কিন্তু কতকগুলি পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি থেকে প্রমাণ হয় তা ৪১ থেকে ৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাঁকে ক্লডিয়াসের দরবারে পাঠানো হয়েছিল। তিনি এমন এক সময়ে সেখানে পৌছেছিলেন অত্যন্ত গুরতর সব ঘটনা, যেমন এগ্রিপিনার গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্র বা মিসালিনার নির্মম মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং যা রোমান ঐতিহাসিকদের এই দৌত্য সম্পর্কে বেশি বেশি করে বলতে অনুপ্রাণিত করে। সিংহলের রাজা চন্দ্রমুক সিওয়া এই দূতকে প্রেরণ করেছিলেন। রাজা ৪৪ থেকে ৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[১]

এরপরেও কয়েজন রাষ্ট্রদূত প্রেরিত হন। দ্বিতীয় জন আসেন ১০৭ খ্রিস্টাব্দে ট্রোজানের দরবারে। তৃতীয়জন আসেন অ্যান্টোনিয়াম পায়াসের রাজত্বকালে ১৩৮ সালে, চতুর্থ জন আসেন ৩৬১ খ্রি: জুলিয়ানের দরবারে এবং পঞ্চম রাষ্ট্রদূত

1. J. R. A. S. 1860; Vol XVIII; P- 349-50

আসেন ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ানের আমলে। এই রাষ্ট্রদূতদের সম্পর্কে ভারতীয়রা কোনও মতামত ব্যক্ত করেননি। রোমান ঐতিহাসিকেরা তাঁদের সম্পর্কে যা লিখেছেন, মাত্র সেটুকু থেকে এই দৌত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা অবশ্য এ বর্ণনা রেখেছেন যে ভারত ও রোমের মধ্যে লাগাতার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল। তা ছিল প্রাণবন্তও এবং "সার্ভিয়াস এবং তার পুত্র কমোডাসের রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিরা এবং পালমাইরা উভয় স্থানই বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং উন্নতও ছিল। ভারতের সঙ্গে রোমানদের সম্পর্ক ছিল উচ্চ পর্যায়ের। তারপর রোমান সাহিত্যও ভারতীয় ব্যাপারে অধিক অগ্রহী হয়ে ওঠে এবং প্রাচীনতর কালের নজির মোতাবেক আলেকজান্ডারের আমলের ঐতিহাসিকদের অথবা প্রেরিত দূতদের কিছু উদ্ধৃতি বা বর্ণনার উপর নির্ভর করে থাকেননি। উপরন্তু অন্যান্য স্বাধীন উৎস থেকেও তথ্যাদি আহরণ করেন।[১]

অন্যান্য তথ্য প্রমাণ, অধিকাংশই শৈল্পিক চরিত্রের, সেই সিদ্ধান্তকেই শক্তিশালী করে। ড: হার্থ তাঁর, চিন এবং রোমান প্রাচ্য গ্রন্থে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত চিনা ঐতিহাসিক সাঙস্যু-র ৪২০ থেকে ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন "পশ্চিমা-মহাসাগরের অনেক দূরে টাটস (সিরিয়া) আই এন চ্যু (ভারত-এর যে পথ বর্তমান সেখানে দুই হান রাজবংশের দূতেরা অনেক কষ্টভোগ করেন। যদিও বাণিজ্য সম্ভার পাঠানো হয়, বাণিজ্য তরীও পরিচালিত হয় কিন্তু সামুদ্রিক বায়ুর তীব্র গতিময়তা তাদের অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেল। আমরা যে-সব পাহাড় পর্বত জানি, তার থেকেও উচ্চতর পাহাড় সেখানে পরিসৃষ্ট হয়। অনেক নতুন জাতিবর্ণের উপজাতি পরিলক্ষিত হয়, এমন শ্রেণীর মানুষ তারা যাদের আমরা চিনি না। সমস্ত প্রকার মূল্যবান দ্রব্যাদি, যা জল ও স্থলভাগ থেকে প্রাপ্ত, তাদের কাছ থেকেই আসলে প্রাপ্ত। তাছাড়া গন্ডারের শিং দিয়ে তৈরি মণিমুক্তা, বৈদুর্যমণি, সর্প-মণি, অ্যাসবেস্টস ক্লথ,—এই সব অত্যাশ্চর্য কৌতুককর সম্পদ এবং ভগবান বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত ভক্তি—সবই এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য উপকরণ বা নৌ-বাণিজ্যের উপাদানে পরিণত হয়েছিল।

প্রাচীন নিদর্শন নিয়ে গবেষণারত আরও একজন চিনা ঐতিহাসিক মা-টুয়াজলিন তার গবেষণায় বলছেন, "৫০০ থেকে ৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে ভারত টা-ছিন রোমান সাম্রাজ্য, এবং অ্যানাস অথবা এ এস ই-র সঙ্গে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য করত।"[২]

---

1. J. R. A. S. 1860; Vol XIX; P-276
2. J. R. A. S. 1860; Vol XIX; P-307

জনৈক সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লেখক বলিষ্ঠভাবে বলেছেন যে, পালমায়ারের পতনের পর ভারত ও রোমের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক আর ছিল না। তিনি বলেছেন, রোমানরা ইথিওপিয়ার প্রধান বন্দর আদুলে তাদের বাণিজ্য স্টেশন স্থাপন করে।" যদিও কনস্টানটাইনের সময়ে অনেক অর্থনৈতিক সমুন্নতি সংঘটিত হয় তবুও বলা যায়, আদুলের পরে আর রোমানদের কোনও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম ছিল না।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক নির্দেশ অবশ্য বিপরীত সিদ্ধান্ত করতে আগ্রহী। মি. ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেন, "বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত বেশ কিছু রোমান কলোনি দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করে খ্রীষ্টীয় দুই শতকের মধ্যে। কিছু ইউরোপীয় সৈন্য যাদের বলা হয় ইয়াভনাস এবং বোবা ম্লিকাস (অসভ্য, অ-গ্রীক) সৈন্যদের পোশাক পরে তামিল রাজাদের দেহরক্ষীর কাজ করত। পাশাপাশি ইয়াভনাসদের বিশাল জাহাজ মুজিরিজদের নামিয়ে দিচ্ছে গোলমরিচ বা পিপুল জাতীয় জাহাজবাহিত মালপত্তর তোলার জন্য যা রোমান স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করা হয়েছে।"[১] রোমান ব্যবসা পরিচালনার কলোনি ছিল তাই নয়, "রোমান সৈন্যরা পান্ডায়া এবং অন্যান্য তামিল রাজার সেবায় নিযুক্ত ছিল"।[২] এবং "পান্ডা আর্যপ্পাডায় কাডারেথা নেভুঞ্জ চেলিয়ান-এর রাজত্বকালে রোমান সৈন্যরা মাদুরা ফোর্ট-এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিল।"[৩] মুদ্রায় খচিত নকশা থেকেও জানা যায়, ভারত ও রোমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

(অর্ধপৃষ্ঠার মতো স্থানে লেখক কিছু লেখেননি : সম্পাদক)

ভারতবর্ষ ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে এই যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তা কয়েক বিষয় পর্যালোচনা করলে সহজবোধ্য মনে হবে "মার্ক এ্যান্টনির কাল থেকে জাস্টিনিয়ানের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রী: পূ: ৩০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ৫৫০ পর্যন্ত পার্থিয়ান ও সাসসানিয়ান্স-এর বিরুদ্ধে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে মৈত্রীবদ্ধ শক্তি হিসাবে অবস্থান করেছেন। বাণিজ্যিক গুরুত্বের দিক থেকে, বিশেষ করে পূর্ব-পশ্চিমের সংযোগকারী অন্যতম প্রধান সংযোগ পথ ব্যবহারকারী হিসাবে কুশান ও শক-দের মিত্রতাপাশে আবদ্ধকারী

1. Early History of India; P-400
2. ইন্ডিয়ান সিপিং; মুখার্জি; পৃ: ১২৮
3. ইন্ডিয়ান সিপিং; মুখার্জি; পৃ: ১১৮

শক্তিরূপে পরিগণিত। কারণ কুশান ও শকরা-ই সিন্ধু উপত্যকা ও ব্যাকট্রিয়া অধিকার করেছিল, যা রোমের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিল।"[১]

ভারত ও বিদেশী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা দেখব কি কি বিষয়ে লেন-দেনের বাণিজ্য চলত, বাণিজ্য পথ এবং ভারতের বিখ্যাত সমুদ্র বন্দরের অবস্থান।

পেরিপ্লাস, টলেমির ভূগোল এবং খ্রিস্টীয় টপোগ্রাফি এ-বিষয়ে প্রধান উৎস যার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উপকরণ ও ভারতের বন্দর সংস্থানের পরিচয় জানা যায়। পেরিপ্লাস নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি রপ্তানি বাণিজ্যের উপকরণ হিসাবে উল্লেখ করছেন :

(১) দামি সুগন্ধি মলম, (২) করটাস, (৩) বিলিয়াম (৪) হাতির দাঁত, (৫) লিসিরাম (Lycirem) , (৬) কুগেট (Qugate) (৭) সর্বপ্রকার সুতি বস্ত্র (৮) রেশমি বস্ত্র (৯) ম্যালো বস্ত্র (Mallow cloth) (১০) সুতা (Yarn) (১১) পিপুল (Long Pepper) (১২) হীরা (Diamonds) (১৩) নীলকান্ত মণি (Sapphires) (১৪) কচ্ছপের খোলস (Tortoise Shell) (১৫) সর্বপ্রকার স্বচ্ছ গ্রহরত্ন/পাথর (Transperent stones of all kinds) (১৬) মুক্তা (Pearls) (১৭) ম্যালাবাথরাম (Malabathrum) (১৮) ধুপ বা সুগন্ধি দ্রব্য (Incense) (১৯) নীল (Indigo)

আমদানি দ্রব্যাদি :

(১) মদ (Wine) (২) তামা (Copper) (৩) টিন (Tin) (৪) সিসা (Lead) (৫) প্রবাল (Coral) (৬) পাতলা পোশাক ও নিকৃষ্ট মানের অন্যান্য দ্রব্যাদি (Thin clothing Inferior sarts of all kind) (৭) সুইট ক্লোভার (Sweet Clover) (৮) ফ্লিন্ট এবং ক্রুড কাঁচ (Flint and Crude glass) (৯) রসাঞ্জন (Lantimony) (১০) স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (Gold & Silver coins aceruing from the fovourable balance of trade.

পেরিপ্লাস অথবা ভারত মহাসাগর সংক্রান্ত মেরি গাইড বইতে নিম্নলিখিত বাণিজ্য বন্দরের উল্লেখ অছে :

(১) বারিগাজা অথবা একালের বারুচ, পশ্চিমভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। বারুচ-এর সঙ্গে দুটি শহর যুক্ত পায়থান এবং টাগারা।

(২) সউপারা—আধুনিক সুপারা, বসাইনের সন্নিকটে।

১. ইন্ডিয়ান শিপিং ; মুখার্জি ; পৃ: ১৩৯

(৩) কলিয়েন বা একালের কল্যাণ।

(৪) সীমানা—একালের চেম্বুর বলে অনুমিত।

(৫) মান্ডা গোরা

(৬) পলাই পাটামি

(৭) মেলিজেইগারা

(৮) টিনডিস্

(৯) মুজিরি

(১০) নেলকিন্ডা

টলেমির ভূ-বিদ্যা গ্রন্থে "সিন্ধুনদ থেকে গঙ্গা পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্র উপকূলের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে এমন শহর ও বন্দরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বন্দরের মধ্যে ছিল, সিরাষ্ট্র (সুরাট) মোনোগ্লোসোন (গুজরাটের ম্যাঙ্গরোল) আরিয়েক (মহারাষ্ট্র), সউপারা, মুজিরিজ, বাকারেই, মাইসোলি (মসলিপটনম), কৌনগারা (কোনারক) এবং অন্যান্য।"[১]

কয়েকজন তামিল কবি দক্ষিণ ভারতের কিছু বাণিজ্যিক বন্দরের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেন, সতেজ উন্নত শহর মুচিরি, যেখানে বিশালকায় অথচ সুশ্রী ইয়াভানস্-এর জাহাজ ফোমের ধুলো উড়িয়ে পেরিপ্লাসের জল কেটে কেটে আসে যেগুলো চেরালার সম্পত্তি আগে স্বর্ণ নিয়ে কিন্তু চলে যায় পিপুল বা গোলমরিচ ভর্তি করে। আর একজন লিখছেন, মাছ-এর বদলে ধান, বস্তাবন্দী করে ঘরে তোলা হয়।

বস্তাবন্দী গোলমরিচ গৃহস্থরা বাড়ি থেকে বাজারে নিয়ে আসে। বিক্রয় পাট্টা হলে স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় জাহাজ থেকে, বাজরা চেপে মূল্যবান সামগ্রী সব মুচিরি উপকূলে আসে সেখানে মূলের উত্তাল তরঙ্গ কখনও থামে না এবং সেখানে বুদ্দুভ্যান এর চেরারাজ সেই সব মহা মূল্যবান সাগরের বা পাহাড়ের দ্রব্যাদি দেখতে আসেন স্বয়ং।"[২] কাভেরী পাচ্চিনাম অথবা পুকারের এর বর্ণনা (পেরিপ্লাসের কর্ম ও টলেমির খাবেরি) সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী। কাবেরীর

---

১. আর. কে. মুখার্জি ; 'ইন্ডিয়ান শিপিং'; পৃঃ ১৩৪
২. আর. কে. মুখার্জি; 'ইন্ডিয়ান শিপিং'; পৃঃ ১৩৫

উত্তর তীরে অবস্থিত এসব বন্দর ছিল যেমন প্রশস্ত তেমনি গভীর এবং বড় সাগর থেকে সরাসরি তা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ লাভ করত এবং যাদের পাশ একটুও ঢিলা করতে বা নামিয়ে দিতে হত না। এ শহর দু'ভাগে ছিল বিভক্ত। একভাগ মারুভাব পক্কাম সমুদ্র উপকূলের সংযোগ করেছে। এর সন্নিকটে প্লাটফরম, গোদাম ঘর ও অয়ার হাউস তৈরি হয়েছে যেখানে জাহাজ থেকে খালাস করা মালপত্তর জমা করা হয়। এখানে কাস্টম ডিউটি দেওয়ার পর চোলারাজের প্রতীক চিহ্ন লাগিয়ে মাল চিহ্নিত করণ হয় এবং ব্যবসায়ীদের ওয়ারহাউসে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। নিকটেই ইয়াভনা (বিদেশি) ব্যবসার আস্তানা। সেখানে দ্রব্যাদি তোলা হয় বিক্রয়ের জন্য। বিদেশি ব্যবসাদারদের প্রধান কার্যালয়ও এখানেই অবস্থিত যেখানে বিদেশি জমায়েত হয়ে রকমারি ভাষায় কথা বলে। সুগন্ধী মলম ও পাউডার, ফলেলও সুগন্ধী তৈল, দর্জি যারা রেশম, সুতি বস্ত্রের বাজ করে। চন্দনের ব্যবসাদার, প্রবাল, মণিমুক্তা, সোনা, মুল্যবান গ্রহরত্ন শস্য-ব্যবসাদার রজক, মাছ ব্যবসাদার, মাংসের কারবারি কর্মকার, ছুতার মিস্ত্রী, পিতল ব্যবসায়ী, তামা ব্যবসাদার, মুদ্রাকর, ভাস্কর, স্বর্ণ ব্যবসায়ী, জুতা মিস্ত্রী এবং খেলা প্রস্ততকারক—সবার আবাস স্থল হল ভারাভার পাক্কম্।১

ব্যবসা বাণিজ্যের পথ যা ভারত থেকে পশ্চিমের দেশ সংযোগ করেছে সেগুলি দু'ভাগে বিভক্ত (১) স্থলপথ, (২) সমুদ্র পথ।

একথা সঠিকভাবেই বলা হয় যে, ব্যক্তিগত স্থান পরিবর্তন সভ্য মানুষের একটা অভ্যাস। প্রাচীনকালের মানুষ তাদের যুথচর স্বভাবের জন্য অথবা নিরাপত্তার অভাবে, সর্বদা দলবদ্ধভাবে চলফেরা করেছে। তাদের এই স্বভাব তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি রূপায়ণ করেছে। ফেরিওয়ালার স্বভাব তাদের সহজাত ছিল, ফলে প্রতিযোগিতার ভয়ে পরস্পর লেনদেন ব্যাহত হওয়ার ভয়ও ছিল না। গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের পিঠে জিনিসপত্রের বোঝা চাপিয়ে তারা এমন অসুবিধাজনকভাবে চলাফেরা করত যে, সহজ গতি সম্পন্ন আধুনিক মানুষ তার ব্যবসাদারি মনোভাব সত্ত্বেও ধনদৌলতের দেবতাকে বরং পরিহার করে চলবে, অসুবিধার মধ্যে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করবে না। ক্যারাভান বাহিনী সম্পর্কে মি. হারবার বলছেন, "এর পথ ব্যক্তিগত পছন্দ অ-পছন্দের উপর নির্ভর করত না, উপরন্তু তা ছিল প্রতিষ্ঠিত নির্ধারিত বিষয়। যে শুষ্ক নিষ্পাদ বিস্তীর্ণ ভূমি তাদের পাড়ি দিতে হত, প্রকৃতি সেখানে খুব অল্পই বিচ্ছিন্ন বিশ্রামের স্থান সৃষ্টি করে রেখেছে, যেখানে পামগাছের

১. উদ্বৃতি : ইন দ্য ক্যালকাতা রিভিয়ু ; খন্ড ১৯ ; পৃ: ৩৪৫

ছায়ায় শীতল ঝর্নাধারার পাশে মানুষ ও শিকারী জন্তুগুলো পরিশ্রান্ত দেহে ক্ষণকাল বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। এই বিশ্রামের স্থানগুলি বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছে এবং প্রায়শ মন্দির ও ধর্মস্থানে পরিণত হয়েছে যার ছত্রছায়ায় ব্যবসাদার তার বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, তীর্থযাত্রীরা আশ্রয়লাভ করেছে।"[১]

এ-সব শর্ত সাপেক্ষে ক্যারাভান পথগুলি কখনও সোজা-সরলভাবে গড়ে ওঠেনি। সর্বদাই তা ছিল আঁকাবাঁকা এবং যখন প্রাচীন ব্যবসা কেন্দ্রের মানচিত্রের দিকে তাকাই, আমরা লক্ষ্য করি, ছোট ছোট রাস্তা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে বা অতিক্রম করে গেছে, ফলে বিভিন্ন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। যা হোক, আমরা ভারত থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত দু'টি অজানা প্রধান বাণিজ্য পথের সন্ধান জানতে পেরেছি।

উত্তর শেষ প্রান্ত অক্‌সাস্ নদী বরাবর বিস্তৃত হয়েছে এবং ক্যাস্পিয়ান সাগরের উত্তর অববাহিকা পরিব্যাপ্ত করে কৃষ্ণসাগরের সমকেন্দ্রাভিমুখী হয়েছে এবং তারপর কনস্টান্টিনোপল-এর দিকে প্রসারিত হয়েছে। মধ্যভাগ সরল সোজা পথ যার অনেক শাখা পথ দেখা গেছে যেগুলি বাজারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তা ক্যাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ অববাহিকার থেকে শুরু হয়েছে এবং তেব্রিজ এরজেম ট্রেবিজনড এবং কৃষ্ণসাগর বরাবর থেকে তারপর কানস্টান্টিনোপল পর্যন্ত গিয়েছে। ভারত ও পশ্চিমের মধ্যে এই দু'টিই হল প্রধান স্থল বাণিজ্য পথ।

দুটি জলপথ ও ছিল, যাদের মধ্যে একটি আবার অর্ধেকটা জলপথ। তাদের একটি ছিল লোহিতসাগর বরবার। ভারত মহাসাগরের জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছনোর জন্য সাগর পাড়ি দিত। অথবা জাহাজগুলি আরও এগিয়ে দক্ষিণ আরব দেশের বন্দরগুলি ও অডেন-এ পৌঁছুত। এবং সেন্ট্ অব বাবেল ম্যান্তভের (অশ্রু-গেট) বরাবর লোহিতসাগরের জল ভেঙে আরব উপকূল জেড্ডা এবং মিশরীয় উপকূলে বার্নিসে পৌঁছুত। বার্নিস থেকে ভারবাহী পশুদের পিঠে মালপত্র থিব্‌স ও কোজ-এ নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে থেকে নীলনদ পাড়ি দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া এবং সেখান থেকে ইউরোপ নিয়ে যাওয়া হত। অন্যান্য জলপথের সন্ধান পাওয়া যাবে পারস্য উপসাগরে। যে সব জাহাজ বারুচ থেকে ছাড়ে এবং তীর ঘেঁষে চলে, বাসোরা যাওয়ার পথে ওমন উপসাগর বরাবর মাস্কেট এবং ওরমাজকে স্পর্শ করে। পারস্য উপসাগরের মুখে বাসোরা থেকে মালপত্তর ক্যারাভান যোগে ইউফ্রেটিস

১. ক্যালকাতা রিভিয়ু ; খণ্ড ১৯; পৃ: ৩৪৫

ও টাইগ্রিস্-এর উপকূলে বহন করা হয়—ভূমধ্যসাগরের অ্যান্টিক পর্যন্ত ব্যাবিলানিয়ার মধ্য দিয়ে।

এই দুই জল বাণিজ্য পথ এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান কিন্তু স্থল ভাগের রাস্তার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে সব বন্ধ করা হয়েছে এবং চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এবং বন্ধ হওয়ার ইতিহাস সম্ভবত এশিয়া মহাদেশের এমন কি ঘটনা যা ইউরোপের ইতিহাসকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।
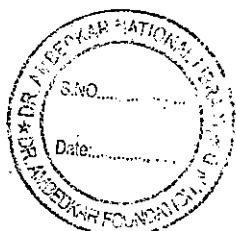
অধ্যায় ২

মধ্যযুগে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অথবা ইসলাম-এর উত্থান এবং পশ্চিম ইউরোপের সম্প্রসারণ

ইসলামের জন্ম এবং গ্রেগরি দ্য গ্রেট-এর অধীনে রোমে পোপের ক্ষমতার সংহতিকরণ সমকালীন ঘটনা। এ-সময়টা ছিল ধর্মযাজকদের মাধ্যমে শাসনের কাল। এবং প্রাচ্য দেশ আর একবার ধর্মীয় প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে ছিল তৎপর, যার মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে ইসলাম ধর্মীয়করণ প্রায় সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। আফ্রিকা বা এশিয়ার কথা বা অনুরূপ কোনও বৃহৎ বিষয়ের কথা ছেড়ে দিতে হবে, এই ঘটনার উৎস ছিল ছোট।

মহম্মদের জন্মেরও বহু পূর্বে, আরব দেশ ছিল নানা উপজাতি অধ্যুসিত এবং তারা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্যিক মধ্যস্থতায় বা দালালের কাজ করে উন্নতিসাধন করতে সমর্থ হয়েছিল। পেট্রা থেকে দামাস্কাস পর্যন্ত ধনাঢ্য ও আশ্চর্য সুন্দর শহরের ধ্বংসাবশেষ আরবদের প্রাচীন সম্পদের সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু স্ট্র্যাকোর সিদ্ধান্ত অনুসারে আরবীয় সম্পদের এই শ্রীবৃদ্ধি শুষ্কপ্রায় হয়ে আসে যখন রোমানরা ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। ভারত ও আরবের সম্পদ লোহিতসাগরের পশ্চিম তীরভূমিতে মাইওস হরমোস-এ স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে উঠের পিঠে চেপে যায় থিবস্-এ এবং তারপর নীল নদ পথে তা আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছায়। এই কর্মাবনতির ফল স্বরূপ আরবরা হয়ে যায় "মরুভূমির যথার্থ সন্তান।"

অর্থনীতিগতভাবে বলা যায়, আরবদের থেকে দরিদ্র দেশ আর নেই। আরব, বালুকাময় শিলাখচিত এবং গিবন যেমন বলেছেন অসুখী দেশ। কর্ষণোপযোগী জমি এবং জলের অপ্রতুলতা হেতু আরব বসতি স্থাপনের মাধ্যমে স্থায়ী জাতি সত্তায় পরিণত হতে পারেনি। তারা যাযাবর ও উপজাতিই থেকে গেল, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

ঐক্য আর সৃষ্টি হতে পারল না। তাদের এই অনৈক্যের ফলে আরবীয়রা বার বার বিদেশি আক্রমণকারিদের দ্বারা দলিত-মথিত হয়েছে। আবিসিনিয়ান, পারসিয়ান, মিশরের সুলতান এবং তুর্কির শাসক—প্রত্যেক্যেই নিজের নিজের মতো করে ইয়মেন রাজ্যকে নিজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছে এবং পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনার আনুগত্য দাবি করেছে বহু অত্যাচারী প্রজা পীড়ন করেছে এবং আরবের একটি অংশ রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই আরবদের স্থায়ীভাবে দমিয়ে রাখতে সমর্থ হয়নি। তারা অসীম ক্ষমতাবান সব শাসক, যেমন সিসোট্রিস, সাইরাস, পাম্পি এবং ট্রোজানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। আরবদের মধ্যে এই স্বাধীনতা স্পৃহার আপাত কারণ তার ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে।

আরবীয় ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান ছিল নিকৃষ্ট মানের, অ-মার্জিত ও অ-সংস্কৃত। জাঁকযমক পূর্ণ সুবিস্তৃত শাস্ত্রীয় পৌরাণিক কাহিনী অথবা কোনও দার্শনিক ভিত্তি তাদের ছিল না। "ভারতবাসীর ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি আরবীয় ধর্ম বলতে সূর্য চন্দ্র এবং স্থির তারকার পুজো বুঝায়।"১ প্রত্যেক উপজাতি, প্রত্যেক পরিবার, প্রতিটি যোদ্ধা, অনুষ্ঠানাদি সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে এবং তার অত্যাশ্চর্য পূজা পদ্ধতির ভিত্তি রচনা করে, নেয় ; কিন্তু প্রত্যেক যুগে জাতি মক্কার ধর্ম পাশাপাশি তার ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে।"২ নিকৃষ্ট মানের ধর্মাবলম্বীদের (খ্রিস্ট, মুসলমান বা ইহুদি নয় এমন) অন্য কোনও নতুন ধর্মে পরিণত করা কোনও কঠিন কাজ নয়, কারণ প্যাগানরা ধর্মান্ধও নয়, তাদের মানসিক দৃঢ়তাও তেমন জোরালো নয়। এই অসংস্কৃত আরবরা উত্তরাংশে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করে, দক্ষিণে তারা নজরানদের সঙ্গে, উত্তরপূর্বে ইহুদিদের সঙ্গে এবং পারশ্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তারা জরথুশত্রীয় সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে জীবনযাপন করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই নৈকট্যের ফলে মহম্মদের জন্মের এবং হানিফদের প্রতীকতা তৈরির আগে থেকেই আধ্যাত্মিক একেশ্বরবাদী আরবদের মধ্যে ভাবে আদান-প্রদান ছিল।

স্বাধীনভাবে, অথবা হানফি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনও ভাবে, একজন আরব উট পরিচালক, মহম্মদ এমন ধারণা অন্তরে পোষণ করতেন যে, অধঃপতিত আরবদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো যাবে। এ-জন্য যেমন নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন, তেমনি কাবাশরিফে অসংখ্য দেবদেবীকে মানবিক বলিদানের

---

১. গিবন ; 'ডিকলাইন এন্ড ফল অব দ্য রোমান এমপায়ার'; ৫ম খন্ড; পৃ: ৩২৭

২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩২৭-৮

ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য এই সামান্য অবদান নিয়ে অবতার রূপে আত্মপ্রকাশের জন্য কেউই অন্যায়ভাবে দাবি করত না। কিন্তু তিনি নিজে বলিষ্ঠতা এবং বিশ্বাস যোগ্যতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর পরিবারে এবং জাতির মধ্যে, ইসলামের সাথে প্রয়োজনীয় শাশ্বত সত্য এবং কাহিনী প্রচার করেছিলেন। 'যে ঈশ্বর একজন-ই আছেন, এবং মুহামেত্ই ঈশ্বরের বাণী প্রচারক দূত।'[১] মহম্মদ-এর জন্ম ঘিরে ঘটনাবলী তার ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে আত্মঘোষণার পক্ষে আপাতগ্রাহ্য বিষয় ছিল। এটা মনে রাখতে হবে যে, আরবদেশে যে রকমারি উপজাতি বসবাস করত, তারা সম-স্বাধীনতা ভোগ করত। অবশ্য এই সমস্ত উপজাতীয় মানুষেরা খোরেশ উপজাতিকে সম্মান জানানোর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিল, যে উপজাতি কাবা মন্দিরের কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল এবং যাজকীয় কর্তৃত্বও ছিল তাদেরই যারা আবার হাসেমের পরিবারভুক্ত মানুষ এবং প্রধানত মহম্মদের পিতামহের পক্ষে ছিল। আরবীয়দের মধ্যে এক মহিমান্বিত অবস্থায় থাকার সুবাদে মহম্মদ একেশ্বরবাদী ভাবধারা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচারের সুবিধা পেয়েছিলেন। অবশ্য মহম্মদের প্রচারিত নীতিতে নতুনত্ব তেমন কিছু ছিল না। তিনি নিজেও প্রবক্তা হিসাবে নতুনত্বের অধিকারী তেমন নন। তাঁর কোরআন-ও ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে এক প্রকার সমন্বয়।

তাঁর শিক্ষার মূল্য যাই থাক না কেন, আরবরা তাঁর প্রতি বিরোধিতার মনোভাব পোষণ করতে লাগল, এতটাই যে, হাসেমাইতরা সমাজের কাছে নিম্নতর বা নিন্দিত হতে লাগল। মহম্মদের বিষয়ে আরবদের মিশনারি মনোভাব এতদূর অনমনীয় হয়ে উঠল যা বর্তমানে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মতো অধৈর্য হয়ে আরবীয়রা হাসেমাইতস্দের মহম্মদকে বহিষ্কার করতে বাধ্য করল, ফলে তাঁর জীবন সংশয় পর্যন্ত হয়ে উঠল এবং তিনি মদিনার দিকে দৃষ্টি দিলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন না যে, সেখানেও তাঁর যথার্থ অভ্যর্থনা জুটবে কিনা। সুতরাং যে ক'জন অনুগামী মক্কাতে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তাদের মাধ্যমে মদিনাবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাদের সহানুভূতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই, তিনি মদিনাতে যান এবং তাঁর লালিত-পালিত তরতাজা ধর্মমতকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হন, যা অবশ্য "আতুরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হত, যদি না মদিনাবাসী বিশ্বাস ও সম্মানের সঙ্গে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত পবিত্র ধর্মমতকে বরণ করে নিত।"[২] তাঁর মদিনাতে বসবাস মহম্মদের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা সৃষ্টি

১. গিবন, 'ডিকলাইন এন্ড ফল অব দ্য রোমান এমপায়ার' ; ৫ম খণ্ড; পৃ: ৩৩৭

২. তদেব; পৃ: ৩৫৬

করেছিল। তাঁর যাজকীয় অফিস আইন বিভাগকে যুক্ত করেছিল এবং বিচার বিভাগ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তিনি একজন মিশনারি শাসক-এ পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং কামান দেগে তিনি তাঁর ধর্মমতকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। একজন স্বাধীন মানুষের পছন্দ দ্রুত ধাবমান মক্কাকে সার্বভৌমত্বের উচ্চতায় স্থাপন করেছিল। পদমর্যাদা থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা যে আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তাতে আক্রমণাত্মক এবং আত্মরক্ষামূলক দুই যুদ্ধ লড়াই তাঁর পক্ষে সম্ভব হত। মানবিক অধিকারের ঘাটতি যা ছিল তা পূরণ করা হয়েছিল এবং ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি বলীয়ান হয়েছিলেন। তাঁর নতুন প্রকাশ করণের মাধ্যমে মদিনার ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আশ্বস্ত করেন দৃঢ়তর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে, যা প্রমাণ করে যে, তাঁর পূর্ণের প্রবর্তনার মধ্যে দুর্বলতা ছিল। দৃঢ় বিশ্বাসের স্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালনা করা হয়েছে, জামার বা ছাড় দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত এবং তিনি তখন তাঁর ধর্মমত প্রবর্তনার ক্ষেত্রে অস্ত্র শান দিচ্ছেন, পৌত্তলিকতাকে ধ্বংস সাধনে তৎপর অবিশ্বাসী জাতিকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে আদেশ প্রদানে অকুণ্ঠিত।"[১] এরূপে পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার পর তিনি তাঁর শ্রেণী এবং রাজত্বকে বৃদ্ধি করতে যত্নবান হলেন, প্রথমত, মক্কার খোরেশদের পরাজিত করার মধ্য দিয়ে। আরবরা যেমন ছিল ব্যবসায়ী তেমনি ছিল দস্যু এবং মদিনাতে মোহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর মদিনা দিয়ে খোরেশদের ব্যবসা বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল। এতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে খোরেশরা মদিনার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে লাগল। মোহম্মদ কিছুদিন সমঝোতার চেষ্টা করে শেষে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন। এবং তাঁর জন্মস্থান শহর অধিকার করে নিলেন। এইভাবে তিনি শক্তি ও সম্পদ দুইই বৃদ্ধি করলেন।" বন্ধুত্ব, পূর্ণ আনুগত্য অথবা যুদ্ধ-কোনটি পছন্দ, মহম্মদ তাঁর শত্রুদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন। যদি তারা ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আস্থা প্রকাশ্যে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে তা হলে তারা তাঁর পুরাতন শিষ্যত্বের জাগতিক আধ্যাত্মিক সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করবে এবং একই পতাকাতলে বসার অধিকার ভোগ করবে।"[২] এইভাবে তাঁর অনুগামীদের বিজয়ের দিকে প্রাগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে মহম্মদ তাঁর সদিচ্ছাকে তাঁর উত্তরসূরী খলিফাদের ওপর আরোপ করলেন। "আলির বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা, মোয়াওয়াইয়ার নিখুঁত দূরদর্শিতা তার প্রজাদের সমকক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যুৎসাহী করে তুলল, এবং লড়াই করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে দিল। ফলে তাদের ধর্ম-প্রবর্তকের বিশ্বাস ও প্রভাব বৃদ্ধির

---

১. গিবন; 'ডিকলাইন এন্ড ফল অব্ দ্য রোমান এমপায়ার', ৫ম খণ্ড; পৃ: ৩৫৯
২. তদেব; পৃ: ৪০০

ক্ষেত্রে কার্যকর ভাবে সহায়ক হয়ে উঠল দামাস্কাস রাজপ্রাসাদের অহমিকা এবং অলসতার মধ্যে, যখন ওমাইয়া হাউসের উত্তরাধীকারী রাজকুমারগণও একই রকম স্বভাবপ্রাপ্ত তখন রাজনীতিবিদ ও যাজকদের অবস্থাও খুবই নিসঙ্গ। তবুও অপরিচিত দেশের লুঠের মাল তাদের সিংহাসনের তলে এনে জমা করা হত এবং আরবদের মহত্ব জাতীয় শক্তির মাপকাঠিতেই বিচার হত। তাদের প্রধানদের দক্ষতার ভিত্তিতে নয়। তাদের শত্রুদের দুর্বলতার কারণে অবশ্য অনেক কিছুই বাদ দিতে হবে। পারস্যের রোমানদের, এবং ইউরোপের বর্ব্বরদের সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়িত সময়ে মাহোমেত-এর জন্ম সৌভাগ্যের ঘটনা। ট্রোজান সাম্রাজ্য কনন্টানটাইন বা শাসেমেন উলঙ্গ আরব বেদুইনদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত।"[১]

সম শক্তি ও সাফল্য নিয়ে তারা অগাস্টাস ও অর্টকসারটাস বিজয়ীকে পরাস্ত করেছে এবং বিরুদ্ধ শক্তিকে তারা দমিয়ে দিয়েছে। দমিয়ে দিচ্ছে শিকারী শত্রুকে, যাদেরকে অনেককাল ধরে ঘৃণা করে এসেছে। ওমরের দশ বছর প্রশাসন পরিচালনার সময়সীমার মধ্যে আরব বেদুইনরা তাঁর অধীনে এনেছে ছত্রিশ হাজার শহর ও দুর্গ, অধিবাসীদের চৌদ্দ হাজার মন্দির ও চার্চকে ধ্বংস করেছে, চৌদ্দ হাজার মন্দিরকে নির্মাণ বা সংস্কার করেছে। সবই তারা করেছে মহম্মদের ধর্ম প্রচারের নামে। মহম্মদের মক্কা যুদ্ধের একশত বছর পরে, তাঁর উত্তরাধিকারিদের শক্তি ও রাজত্ব ভারত থেকে আটলান্টিক মহাসাগর, রকমারি ও দূরের যেমন (১) পারস্য, (২) সিরিয়া, (৩) মিশর, (৪) আফ্রিকা, (৫) স্পেনের প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে।[২] এই মহান মুসলমান সাম্রাজ্যে "আমরা উদ্দেশ্যহীনতার অনুসন্ধান করেছি ভাঙা যায় না এমন একতাবোধ এবং সহজ আনুগত্য যা অগাস্টাস ও অ্যান্টোনিমস্ সরকারে পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল। কিন্তু মুসলিম ধর্মে এই প্রগতি বিশাল শূন্যতায় মতামত ও আচরণে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সমরকন্দ এবং সিভাইলে সম আন্তরিকতায় কোরআনের ভাষা ও বিধি পর্যালোচিত হল। মুরবাসী ও ভারতবাসী আলিঙ্গনাবদ্ধ হল এক দেশবাসী হিসাবে এবং মক্কার পূর্ণ্যার্থী পরিব্রাজকরূপে। আরবী ভাষা টাইগ্রিস-এর পশ্চিমাংশের জনপ্রিয় মুখের ভাষা হিসাবে গৃহীত হল।"[২]

সমগ্র ইতিহাসের বিষয় ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী আরব বেদুইনদের বিবরণ কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করে দেখা যেতে পারে। একজন পরিচিত লেখক বলেছেন, " আরবদের আকস্মিক অভ্যুত্থান আপাত দৃষ্টিতেই আকস্মিক। শতবর্ষের ব্যবধানে আরবদের স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া চলছিল। এটা ছিল শেষ মেমেটিক স্থানান্তরকরণ যা

১. গিবন, 'ডিকলাইন এন্ড ফল অব দ্য রোমান এমপায়ার'; ৫ম খণ্ড; পৃ: ৪০০-১

২. তদেব; পৃ: ৪০১

আরবদের অর্থনৈতিক পতনের সঙ্গে যুক্ত। **** সংক্ষেপে বলতে গেলে, মহম্মদের অনেক পূর্বে আরব ছিল অশান্ত এবং ধীরগতি সম্পন্ন নিয়ন্ত্রণ বিহীন সুসভ্য পারস্য ভূমিতে প্রবৃষ্টি হচ্ছিলই, যেখানে আর্মানিয়ানরা ইতোপূর্বেই প্রবেশলাভ করেছিল।

ধর্ম নয়, ক্ষুধা ও ধনতৃষ্ণা হল নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, কিন্তু ধর্ম প্রয়োজনীয় ঐক্যবোধ ও কেন্দ্রীয় শক্তি সরবরাহ করতে পারে। ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী বেদুইনদের ধর্মবিস্তার, তার নিজস্ব ভিত্তিভূমিতে ও সমকালে অপ্রধান আমদানিকৃত বিষয় বলে গণ্য হতে পারে—রাজনৈতিক প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। আন্দোলনটি ইসলামের আন্দোলনের অনেক আগেই তার পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে, তখনও ইসলাম বক্তব্য ও সাংগঠনিক শক্তি পায়নি।"[১]

একটি নতুন ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যেও যেমন, ঐ সময়ের অর্থনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যও বটে, মহম্মদের মক্কা ত্যাগের ছেচল্লিশ বছরের মধ্যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার পরিমন্ডলে নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল, যারা অস্ত্রশস্ত্র সহ কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের সম্মুখে আবির্ভূত হল এবং তা দখল করে নিল (খ্রী: পূ: ৬৬৮-৬৭৫)। এ দখলকারি ৭ বছর স্থায়ী হয়েছিল, অবশ্য ফল কিছু লাভ করা যায় নি। দখলদারিরা কনস্টাস্টিনোপল্-এর শক্তি ও সম্পদের থেকে আলোর সন্ধান পেয়েছিল বটে। রোমানরা সমশক্তি নিয়ে তাদের ধর্ম ও সাম্রাজ্যের সমকক্ষ হয়ে উঠল এবং দ্রুত ধাবমান আরব বেদুইনদের সংখ্যা ও শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করল, পূর্বে ও পশ্চিমে, সাময়িকভাবে হলেও, বেদুইনদের বিজয় কেউ প্রতিহত করতে সমর্থ হল এবং যে বেদুইনরা কনস্টান্টিনোপল দখল এবং খ্রীষ্ট ধর্মের সম্ভাবনাকে দমিয়ে দিতে পারত।

মুসলমান ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপল দ্বিতীয়বার দখল করে (খ্রিস্টীয় ৭১৬-৭১৮) কিন্তু ফল একই রকম হয়।

এইসব বিজয়ের মধ্যে আরবরা ক্রমশ সেলজুকদের আক্রমণে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে লাগল। তাদের এই উত্থানের মধ্যেই বাগদাদের আববাসইদ খলিফ খোয়াইম অধীশ্বর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন, প্রথমে বুইড এর সাইট বংশ দ্বারা পরে প্রচণ্ড শক্তিধর ফাতেমা প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা।

এরূপ শোচনীয় অবস্থা বিপাকে পড়ে আব্বাসাইদ খলিফ, সেলজুক তুর্কিকে

১. 'কেম্ব্রিজ মিডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি'; ২য় খণ্ড; পৃ: ৩৩১-২

অভ্যর্থনা করলেন, যিনি কট্টর মুসলমান হিসাবে তার সব শক্তি ও জাঁকজমককে ফিরিয়ে দিতে সমর্থ।

"মুসলমান মানদণ্ডে গোঁড়া ইসলামের শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও অত্যাধুনিক সাটে মতবাদ যা টিকে থাকার ক্ষেত্রে বিপদজনক এর প্রভাব থেকে মুসলমান জগতকে উদ্ধার করা সদ্‌গুণের পরিচয় বহন করে। সভ্যতারও তাদের থেকে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কারণ তারা এমন একটা নিরপেক্ষ* শক্তির প্রতীক যা পারস্য ও আরবীয় শক্তির ঐক্যবদ্ধতা সম্ভব করে তোলে, যা মহার্ঘ সেলজুক শাসনাধীনের সময়ে জাতীয়-তুর্কি সাহিত্যিক সম্পদ যা সেই একই ভাষার মাধ্যমে রূপে এবং তারই বিনিময়ে তা সম্ভব হয়েছিল।"[১] সেলজুক অসংখ্য উপজাতি বা পরিবার নিয়ে গঠিত যাদের একটির নাম ছিল গাজ (Guzz)। প্রতিনিয়ত লড়াই করে এমন সব দলের মধ্যে গাজ পরিবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে, অন্যান্য দলের মতো সু-মনোভাব সম্পন্ন. ছিল না, এবং প্রতিবেশী মুসলমান প্রদেশের পক্ষে একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পিগু আরস্‌টান (ইসরাইল)-এর নেতৃত্বে তারা অক্‌সাস্ পার হল, এবং পারস্যর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে মেরোর যুদ্ধে গজনির রাজা মাহ্‌মুদকে পরাজিত করে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। কিছুদিনের মধ্যেই মধ্য এশিয়ার সর্বত্র হেল্লেসপন্ত পর্যন্ত সেলজুকরা তাদের আধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হল।

"অলপ্ আরসলা বিরাট বিজয়ের পর যে বিজয়ের ফলশ্রুতিতে গ্রিক সম্রাট বন্দী হয়েছিলেন (১০৭১)। এশিয়া মাইনর স্থলপথে তুর্কিদের সামনে খুলে গিয়েছিল। ফলে ইসরায়েলের আরস্‌টান পিগুর পুত্র কুতুলমিস এবং তাঁর পুত্র সুলেমানের পক্ষে হেলেসপন্ত পর্যন্ত অনুপ্রবেশ সহজ হয়েছিল, তারপরও রোমানের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যারা সিংহাসন নিয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, এশিয়ার নিসিফোরাস ব্রিনিয়াস এবং ইউরোপের নিসিফোরাস বোটাসিয়েতস্‌কেও বন্দী করা সহজ হয়েছিল। পূর্বের জন সুলেমানের নিকট সাহায্যের আবেদনও করেছিলেন এবং তাঁর সহায়তায় কনস্টান্টিপোল পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সিংহাসনেও বসেছিলেন।"[২]

অল্প দিনের মধ্যেই তারা আন্টিওক দখল করে নিলেন এবং সিরিয়ান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব প্রদান করলেন এবং এমন সাফল্যের সঙ্গে তাদের সৈন্যশক্তিকে ১২৩৪-এর

---

১. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা ; ১১তম সংস্কার; প্রবন্ধ : সেলজুক

২. তদেব, ১১তম সংস্করণ ; পৃ: ৭১২

মধ্যে এমন স্থানে অগ্রসর করিয়ে নিয়ে গেলেন যে, এশিয়া মাইনরের প্রায় সর্বত্র সেলজুকীয় সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করল।

কিন্তু সেলজুকীয় সাম্রাজ্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য হল, আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং বাহ্যিক আগ্রাসন-এর ফলে। বহিরাগত আগ্রাসন পরিচালনা করল মোঙ্গলরা। মোঙ্গলদের প্রাচীন ইতিহাস রহস্য ও কিংবদন্তিতে আবৃত। চেঙ্গিস খাঁ, মোঙ্গলদের নায়ক, ১২২৭ সালে কিলিয়েন উপত্যকায় মৃত্যুর সময় "তাঁর পুত্রদের জন্য এমন একটা সাম্রাজ্য রেখে যান যা চীনসাগর থেকে দিনেপারের তীরভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[1] চেঙ্গিস খান ওগডাইকে তাঁর খোকান বা উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে যান এবং অন্যান্য দাবিদারদের আংশিক ভাবে দিয়ে যান। ওগডাই তাঁর সাম্রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।" একটা বিশাল বাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি চীনের দক্ষিণাংশের দিকে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। কিউ বংশের রাজ্য সীমা অতিক্রম করেন এবং এক-ই সময় টুলি কোনচি দিয়ে হুনাজ প্রদেশের দিকে অগ্রসর হন। যৌথ আক্রমণের মুখে কিউ বাহিনী বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সৃষ্টি করে কিন্তু মোঙ্গলদের দক্ষতা ও সাহস সমস্ত প্রতিবোধ ভেঙে দেয় এবং ছিন্নভিন্ন শত্রুদের ব্যাপকহারে হত্যা করে ক্যায় ফ্যাঙ্ এর রাজধানী দখল করে নেয়। ক্যায় ফ্যাঙ্ ফু থেকে সম্রাট জুনিং ফু-তে পালিয়ে যান, সেখানে মোঙ্গলরা দ্রুত ধাববান হয়। কয়েক সপ্তাহের লাগাতার যুদ্ধ বিরতি ভয়াবহ অনাহার সহ্য করে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনী মোঙ্গলদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। স্বয়ং সম্রাট উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।[2] এতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে ১২৩৫ সালে ওগাডি চীনের ইয়াং সি-কিয়াং এর অববাহিকায় দক্ষিণাংশে সাঙ্ বংশের বিরুদ্ধে এবং কোরিয়ায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন।

একইভাবে পূর্ব এশিয়ায় তাঁর বিজয় নিষ্পন্ন করে ওগাডি পশ্চিম এশিয়ার দিকে মনোযোগ দিলেন। ১২৩৬ সালে তিনি জর্জিয়া ও গ্রেট আর্মেনিয়া জয় করেন, কার ও তিফলিস অধিকার করেন, তার ভ্রাতুষ্পুত্র বাটুর নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাবাহিনী পূর্ব ইউরোপে পাঠান। বাটু বুলগারের রাজধানী বোলগারি দখল করেন, ভলগা পার হয়ে রায়াজান দখল করেন ১২৩৭ সালের ২১ ডিসেম্বর এবং এমন বর্বর দুষ্কর্ম সাধন করার পূর্বে ঘোষণা করলেন যে, "মৃতদের নির্মিত্ত কাঁদার জন্য কোনও চোখই খোলা থাকবে না।" তিনি ভ্লাদিমীর ও কোঝেল্ক সহ মস্কো জয় করেন। পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির ভাগ্যও একই রকম হল।

---

১. 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা', ১১ খণ্ড; পৃ: ৭১২

প্রায় সমকালে মোঙ্গলদের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কিরা, যারা অট্টোম্যানস্ নামে খ্যাত ক্ষমতায় উঠে এল। তারা এমন যাযাবর জাতি হিসাবে পরিগণিত যারা সঙ্গরিয়া ও গোবি মরুভূমির সমভূতিতে বসবাস করত।

"কারা খানের পুত্র ওঘুজকে বলা হয় অট্টোম্যানদের জনক। তারা ১২২৭ সালে ইতিহাসে প্রথম আবির্ভূত হয়। সেই বছর একটি যাযাবর জাতি, সংখ্যায় দু'শ থেকে চার'শ মতো হবে, মোঙ্গলদের চাপে পড়ে মধ্য এশিয়া থেকে বাড়ি ঘরে ফিরছিল। তারা সেলজুক সুলতান কোনিয়ার আলাউদ্দীন কায়কোবাদের কাছে বৃথাই আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। তারা ইউফ্রেটিস হয়ে আসার সময় দুর্ঘটনাক্রমে তাদের পরিচালক নেতা জলে ডুবে যান, এবং দলে একটা এলেমেলো সমস্যা দেখা যায়। ঘটনাটি ঘটে জবার দুর্গের অদূরে। তখনও যারা নদী পার হয়নি। এখন ব্যক্তিরা অসম্মত হল, স্বভাবতই এই অশুভ দুর্ঘটনা তাদের নিরুৎসাহিত করল, তারা তাদের, সাথীদের অনুসরণ করতে চাইল না। তারা শ'চারেক যোদ্ধা নিমজ্জিত নেতার পুত্র এরটোগ্রুল-এর সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এরটোগ্রুল প্রথমে পূর্বে জিরাম-এর জেসিন-এ ক্যাম্প স্থাপন করলেন। আলাউদ্দীন-এর নিকট দ্বিতীয় আবেদন অনেক ফলপ্রসু হল। কিন্তু অভিবাসীদের সংখ্যা বেশি না থাকায় তাদের ভীতি দূর হল না। অ্যাঙ্গোবার নিকটবর্তী কাজারাবাগ এদের বসবাসের জন্য দেওয়া হল। বলা যায় বেশ ভাল-ভাল চারণভূমি তারা পেয়ে গেল। পেল শীতের আশ্রয়। এরটোগ্রুল যে সহযোগিতা সেলজুকিয়ান সম্রাটকে দিয়েছিলেন তার পরিবর্তে পেয়েছিলেন জায়গীর। এখানেই এরটোগ্রুল নব্বই বছর বয়সে ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তার পুত্র ওসমান উপজাতির নেতা হয়েছিলেন।

যখন তাব্রিজের শাসক গজনির মাহ্‌মুদ খান এবং চেঙ্গিজ খাঁর একজন লেফটেন্যান্ট-এর আক্রমণে সেলজুকীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার উপক্রম তার অধিকাংশ সামন্ত প্রজা তার পতনকে ত্বরান্বিত করল, বাধা দিল না, এই প্রত্যাশায় যে তাদের জায়গীরকে তারা স্বাধীনভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে। কিন্তু ওসমান তাঁর আনুগত্যে দৃঢ় ছিলেন এবং গ্রিকদের বার বার পরাভূত করে তাঁর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকারী প্রভুর পতন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন। কারোজা হিসারের উপর তাঁরই প্রথম কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় (১২৯৫) এবং সেখানেই সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভায় তাঁর নাম সুলতান হিসাবে প্রথম উত্থাপিত হয়। সেই বছরই আলাউদ্দীন কায়কোবাদ, দ্বিতীয়, এইভাবে যে জমি তিনি জয় করে নেন, তার কর্তৃত্বভার তারই উপর অর্পন করেন এবং স্বাধীন অধিকারের স্বীকৃতি স্বরূপ ঘোড়ার লেজ, ড্রাম, পতাকা উপহার দেন। গ্রিকদের ওপর ওসমানের বিজয়ী জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকে। ব্যক্তিগত শৌর্য এবং লর্ড

অব হ্যারমন কায়া কেজসি মিখাল-এর সঙ্গে অনুকূল শক্তি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি আইন কোয়েল, বেলিজিক ও ইয়ার হিসার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হন। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে সেলজুক সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে গেল এবং তার ধ্বংস স্তূপের উপর অনেকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হল। তার উপকারী অভিভাবক সুলতান আলাউদ্দীন দ্বিতীয়-র মৃত্যুর পরই ওসমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এই কারণেই তুর্কি ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার পর থেকেই অট্টোমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হল মনে করেন যে তুর্কি সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত ছিল।

"তুর্কি জাতি এশিয়া মাইনর-এ শাসনকার্য পরিচালনা করে। তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা করে মিশর-এ। তুর্কিরা সিরিয়া ও মেসোপটোমিয়াতেও মোঙ্গলদের অধীনে সংখ্যালঘু শাসনকার্য পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে চেঙ্গিস খাঁর বংশধরেরা পারস্যে খালিফের সাম্রাজ্যের দখল নিতে সফল হয়েছে। ভোলগা ও উরাল পর্বতের বন্য পার্বত্য অঞ্চলে সার্বভৌমত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে, অনুরূপে অকসাসের সমতল ভূমিতে বা টারটারির মরুভূমিতেও ঠিক একই ফললাভ হয়েছে। মধ্য এশিয়ায় শক্তি বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে, চীনে সমর্থ হয়েছে সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দিতে এবং হিন্দুস্থানে মহান মোগল নামে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিতে সমর্থ হয়েছেন।"[২]

কিন্তু তুর্কি সাম্রাজ্যের উপরও এক সময় এমন আঘাত নেমে এল যে মনে হল চিরতরে বোধহয় শেষ হয়ে যাবে। "যে সময় সুলতান ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছেন, যখন তাঁর কর্তৃত্বকে প্রশ্নাতীতভাবে এশিয়া ও ইউরোপের বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে সবাই মেনে নেয়, যখন খ্রীষ্টীয় জগৎ তাকে সভয়ে তাকে পৃথিবীর চাবুক বা ঐশ্বরিক শাসনের উপায় হিসাবে ভাবছে ঠিক সেই সময়ে এক অধিকতর শক্তিশালী চাবুকের আঘাত তাকে দমন করার জন্য নেমে এল। বায়াজিদে (Bayezid) দাপটের সঙ্গে যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই ভয়ঙ্কর বিজয়ী বীর ছিলেন তিমুর, তাতার, আমরা যাকে বলি 'তৈমুরলঙ্গ' (Tamurlane)। চেঙ্গিস খাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের যে তুচ্ছ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উপর উন্নততর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন তৈমুর। তৈমুর তরবারির মুখে সব কিছু এনে ফেলেছিলেন এবং বায়াজিদের সব প্রদেশকে বশীভূত করেছিলেন। ১৪০২ সালে তাতার ও তুর্কিরা মুখোমুখি হল। তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপলের ক্ষমতা খর্ব করার কাজে যখন ব্যস্ত তখন সুলতান তৈমুরলনের বিজয়ের সংবাদ শুনলেন। বায়াজিদ দ্রুত সৈন্য

২. স্ট্যানলি লে পুল; "টার্কি", নিউইয়র্ক ১৮৯৯; পৃ: ৭

সংগ্রহ করে নিজেই যুদ্ধযাত্রা করলেন কিন্তু আঙ্গোরার যুদ্ধে হেরে গেলেন। এবং তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রাসাদ টুকরো টুকরো হয়ে গেল।"১ চরোমোৎকর্ষ দক্ষতা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের বিরল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এশিয়ার স্বেচ্ছাসেবী উৎপীড়ক, বা ধর্মীয় ক্রোধ এর নিকট তুর্কি সাম্রাজ্যের অবশেষে পতন হল। "অটোমানস্-এর ইতিহাস মনে হল হঠাৎ থেমে গেল। তা প্রকাশ করার ভাষা নেই, তা এত ভয়ঙ্কর, বেয়োজিদের পতন, সেই আকাশ থেকে পাতালে, এমনই বিপর্যস্ত অবস্থা, লজ্জাজনক বন্দীদশা।"[২]

দুর্ভাগ্যবশত তৈমুরলন্ এই বিজয়ের ফলভোগ করার জন্য বেঁচে থাকেননি। এবং তাঁর এই আপাত আঘাত অটোমান সাম্রাজ্যের উপর সাহিত্য কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি। মি. লেজপুল বলছেন, "তুর্কিদের শাসনের সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল তার বলিষ্ঠতা। জ্ঞানী প্রবক্তারা বার বার তার পতনের বার্তা ঘোষণা করেছেন বটে, কিন্তু সদ্‌সত্ত্বেও তা টিকে গেছে। প্রদেশের পর প্রদেশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তবুও সুলতান সুমহান সিংহাসনে সমাসীন, রকমারি প্রজাতির প্রজাদের দ্বারা কখনও সম্মানিত, কখনও বা আশঙ্কিত। যদি এটাই বিবেচনা করা যায়, কত কম সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন, এই তুর্কি সম্রাট প্রজাদের শান্ত করতে কত কম ঝামেলা তিনি সহ্য করেছেন, ভাবলে বিস্ময়বোধ হয়, কত দৃঢ় ছিল তাঁর কর্তৃত্ব, কত অকম্পিত ছিল তাঁর শক্তি, ডজনখানেক বছরের মধ্যেই নষ্ট প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হল মহাম্মুদ-এর শক্ত সমর্থ নেতৃত্বে, এবং অটোমান সাম্রাজ্য ১৪০২ সালের প্রবল আঘাতে দুর্বল হওয়া তো দূরে থাক, তার পতনের পর অধিক শক্তিশালী হয়ে জেগে উঠল। যেন এক ঘুমন্ত দৈত্যের ঘুম ভাঙার মতো জেগে উঠল, যেন নতুনতর কোনও জয়ের পর জেগে উঠল।"[১] নতুনভাবে উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে মহম্মদ এশিয়ার ব্রুসা থেকে রাজধানী ইউরোপের অদ্রিয়ানোপল্-এ স্থানান্তরিত করলেন। সেলজুক তুর্কি হেলেসপন্ত-এ পৌঁছলো কিন্তু অটোমাস-এ পরিত্যক্ত হল তা পার হওয়ার জন্য। কনস্টান্টিনোপল ছিল তুর্কি শাসকদের স্বপ্ন। তারা অটোমাসের এই নগরী বিজয়ের স্বপ্ন দেখার কাল থেকে অনেকেই এই রোমনগরীতে অধিপত্য বিস্তারের আশা পোষণ করতেন। "বজ্রগর্ভ বায়াজিদ তা অবরোধ করেন। মুসা তাকে কবজা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মুরাদ২ ধৈর্যসহকারে তা দখলের পরিকল্পনা করেন। এই নগরী জয় করার ছাড়া অন্য কিছুতে কারো তৃপ্তি নেই। আশেপাশের প্রদেশগুলি তো দীর্ঘদিন ধরেই অটোমানস অধ্যুষিত হয়েছে। কিন্তু সম্পদে সৌন্দর্যে

১. স্ট্যানলি লে পুল, "টার্কি", নিউইয়র্ক ১৮৯৯; পৃ: ৭

শক্তি ও অবস্থানে রাজধানীর নিজের আকর্ষণ বিশেষভাবেই স্বতন্ত্র এবং তুর্কিদের কাছে তা মুকুটের আকর্ষণের মতোই দুর্বার।"[২] ষষ্ঠ অটোমানস সম্রাট মহম্মুদ-২ শহর দখলের সুযোগ সন্ধানে অপেক্ষা করছিলেন। সম্রাটের আক্রমণাত্মক আয়োজনের সুযোগ বুঝে তিনি ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে নগর আক্রমণের জন্য তৈরি হলেন। এ-নগরের পতন না হয়ে এতদিন টিঁকে থাকাটাই বিস্ময়কর। কারণ "এ-সময়ে বাইজানটাইন সম্রাজ্যের অবস্থা এমন ছিল যে, তার শক্তির প্রয়োগ অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছিলে। বস্তুত সময়ের ব্যবধান বা গৃহীত সময় বিচার করতে হবে অভীষ্ট ফলদানের সম্ভাবনার লক্ষ্যে, তার রক্ষাকারীদের গুণাবলীর সংরক্ষণের ভিত্তিতে তা বিবেচনা করে লাভ নেই।"[৩] পৃথিবীতে কনস্টানস্টিনোপলের মতো সুবিধা জনক অবস্থান অন্য কোনও দেশের আছে বলে মনে হয় না। তা এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপকে সংযোগ করেছে। যেই এখানে থেকেছে, এই তিন মহাদেশের অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। কনস্টান্টিনোপল-এর শক্তি সম্পর্কে ড: কানিংহাম বলেছেন, "যেমন একটা নতুন শতাব্দী এসেছে। একটা নতুন উপজাতি শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। চতুর্থ শতাব্দীতে যখন এর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তখন গথরা এর দখল নিয়ে নেয়। পঞ্চম শতাব্দীতে হানস্ ও ভান্ডালরা আসে, ষষ্ঠ শতকে স্লাভস্। সপ্তমে অধিকৃত হয় আরব ও পারস্য কর্তৃক। মগ, বুলগার এবং রুশরা এর দখল নেয় আট ও নয়ের শতকে। এমন এর সম্মান ভেনিস ও চতুর্থ ক্রুসেডে অধিকৃত হওয়ার মাধ্যমে এবং ল্যাটিন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে নষ্ট হওয়ার পরও তুর্কিদের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ চলতে থাকে। এ-দেশ প্রচণ্ড নাড়া খায় কিন্তু ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত বিনষ্ট হয়নি।[৪]

এটা একটা মহৎ সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই রোমনগরী অনেক আক্রমণ সহ্য করেছে, প্রতিহত করেছে। এবং শাশ্বত সভ্যতার বিধ্বস্ত প্রকোষ্ঠগুলি রক্ষা করেছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও এটা মহান সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট পূর্বে মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। বর্বর আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সহ্য করে এই শাশ্বত সভ্যতা তার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে দিয়েছে। কনস্টান্টিনোপল পুর্বাঞ্চলে যা করেছে, ট্যুরস্ তা করেছে পশ্চিমাঞ্চলে, যদিও সম্ভবত খুব ভালভাবে তা পারেনি। কনস্টান্টিনোপল দখল করতে সমর্থ হয়ে তুর্কিরা দখল নেওয়ার অনেক আগেই আরবরা দক্ষিণে জমায়েত হয় এবং

২. স্টেইনলি লেজ পোল; 'টার্কি' ; পৃষ্ঠা: ১০৭-৮

৩. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা; ২৭তম খণ্ড; পৃ: ৪৪৩

জিব্রালটারের পশ্চিমাংশ দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। এখানে তাদের প্রাথমিক অগ্রগতি বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয় না, কারণ পশ্চিমের দেশ, গথ এই আক্রমণের মুখে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না এবং ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্পেন বাবর ও আরবদের হাতে পরাজিত হল এবং মুর অভিবাসীদের আক্রমণে ভেসে গেল। উৎসাহিত আরবরা ভাল দেশ-এ অভিযানের কথা ভাবে কিন্তু ডিউক অব অ্যাকুইলেন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি অবশ্য পরাজিতও হন ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ডক্স-এ নিকটবর্তী স্থানে। দ্বিগুণ উৎসাহে শক্তিতে তারা এগিয়ে যায় পয়ট্যুরস্ দিকে এবং ট্যুরস্-এ অভিযান করেন। কিন্তু তারা আরও শক্তিশালী শত্রুর কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফ্রোঙ্করা মর্টেলের চার্লস্ দ্য হ্যামারের নেতৃত্বে আরবরা পরাজিত হয় এবং পাকাপাকিভাবে তাদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আরবরা আর পায়ারনিস পার হওয়ার কোনও চেষ্টা করেনি। ইউরোপীয় সভ্যতার ভাগ্যে কী ঘটত যদি আরবরা তাদের পরাজিত করতে পারত, তা অনুমান করাও শক্ত। এইটুকু বলা যায় যে, ফ্রান্স থেকে মুরবা অনেক অগ্রগামী ছিল। অধ্যাপক রবিনসন বলেন, "ঐতিহাসিকেরা সাধারণভাবে এটা মনে করেন যে, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, দ্য হ্যামার এবং বর্বর সৈন্যরা ট্যুরস্ এর কাছে পরাজিত এবং তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারা যদি দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাসের সুযোগ পেত, তারা ফ্রাঙ্করা যা করতে সমর্থ হয়েছে তার চেয়ে দ্রুতগতিতে কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হত।"[১]

যখন এশীয় যাযাবররা মধ্য এশিয়ার সমস্ত প্রকার শান্তিপ্রিয় কার্যকলাপ বিপর্যস্ত করে তুলছিল তখন রোমান সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং জার্মান জনগণের বিরামবিহীন যুদ্ধ বিগ্রহে ইউরোপ টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ছিল।

এমত অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি প্রচুর ছিল। দ্রুত বিনিময়যোগ্যতা টাকার অভাবে সমগ্র-পশ্চিম ইউরোপেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম মোটের উপর আশাবাদী ধর্মবিশ্বাস। তা ছিল আরাম-বিরামময় জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধর্ম অর্থনীতির গতিরুদ্ধ করে দিল। 'ন্যায্যমূল্য' নীতি এবং পাইকারি বিক্রয়ের ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করল ভীষণভাবে। খ্রিস্টানদের তেজারতি ব্যবসার নীতি বাণিজ্যিক কার্যকলাপের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছিল। সুদে টাকা লেনদেন সবার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইহুদিরা যেহেতু খ্রীষ্টয় ধর্মবিশ্বাসের আওতায় পড়ে

১. ব্রেসলি এবং রবীনসন; 'আউটলাইন অব্ ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি পার্ট-১' (এন. ওয়াই) ১৯১৪; পৃঃ ৩৬৪

না, তারাই অর্থের লেনদেনের উৎস হয়ে দাঁড়াল এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

"এই লাগাম-বিহীন মানুষগুলি ইউরোপের অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে লাগাল। কিন্তু তারা খ্রীষ্টানদের কাছে চরম দুর্ব্যবহার পেতে লাগল। যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্যও তারাই অভিযুক্ত হল।"[১] এ-ছাড়া তাদের নিকট থেকে বিরক্তিজনক অবস্থান কর আদায় করা হতে লাগল, যা ছিল তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিধি-বহির্ভূত। ভৌগোলিক জ্ঞান বিভ্রান্তিকরভাবে শোচনীয়। সামুদ্রিক বিপদ কোনওভাবেই কম ছিল না। এবং জলদস্যুরা ছিল সর্বদা একটা ভীতির উৎস। সম্রাটের কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমান রাস্তাঘাট ছিল শিরঃপীড়ার কারণ।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাদির সম্মিলিত শক্তির মধ্যে এতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না যে, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপে বিরাজ করছিল এক দীর্ঘ ঘুমপাড়ানি অবস্থা এবং এক প্রকার অসাড় বিরক্তিকর একঘেয়েমি।

কনস্টান্টিনোপল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন মনোযোগ দেয়নি। তার নীতি ছিল বলপ্রয়োগকারী। বসফোরাস অবস্থানের জন্য সে পূর্ণ বাণিজ্যিক সুযোগ কখনও ভোগ করতে পারেনি। পশ্চিমের দেশ ও কনস্টান্টিনোপল-এর মধ্যে তেমন কোনও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না। বাণিজ্যিক কাজকর্ম সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করত।

(এরপর কিছু অংশে লেখা নেই, সম্পাদক)

* * * * *

না, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সমকালীন আইন কানুনের চেয়ে সিরিয়া ও মিশরের বেদুইন সম্পর্কিত আইনকানুন অনেক বেশি স্বচ্ছ, উজ্জ্বল।

কিন্তু এতসব ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যেও ইতালি ব্যবসায়িক ও বুদ্ধিজীবীদের রক্ষা করেছে। নবম শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইতালিতে যথার্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম হয়েছে। এই সময়টা ছিল ইতালীয় নগর-প্রজাতন্ত্রের জাগরণের কাল। প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্য ছিল এমন বিষয় যা পেয়ে তারা স্ফীত হয়েছে। প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্র "প্রাচ্যে জাঁকজমক ছিল।"

প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল অমলফি। ৮২০ সালের মধ্যে প্রাচ্য দেশ-এর নিকট থেকে সে সবলে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার স্বাধীনতা। তার সামুদ্রিক কাজকর্ম এত দ্রুত প্রসারলাভ করে যে, ২০ বছরের মধ্যে তাদের নৌ-বাহিনী রোমের উপর

বেদুইনের নৌ-আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি অর্জন করে। তাদের কল কারখানা (আধুনিক কালের কলকব্জা) ছড়িয়ে পড়ে পালারমো, সিরাসাস্, মেসিনা, দোরাজো এবং কনস্টান্টিনোপল এবং বাণিজ্যিক দেশ হিসাবে তার খ্যাতি এত ব্যাপকতা পায় যে, 'ট্যাবুলা অমলফিটাজা প্রত্যেক অন্তর্দেশীয় সমুদ্র বন্দরের উপকূলের ব্যবসাদারদের মধ্যে চলতি আধুনিক বলে গণ্য হয় এবং প্রজাতন্ত্রে তা প্রধান বিনিময় মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়, বিশেষত ল্যাটিন ইউরোপ ও লেভাউটদের মধ্যে।"[১]

অমলফি এত ক্ষুদ্র পোতাশ্রয় ছিল যে, তা বিরাট সংগ্রহশালা হিসাবে পরিগণিত হওয়ার পথে বাধা ছিল। সেজন্য তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হয়েছে। নর্ম্যান্স্দের স্থল বাহিনীর শিকার তাকে হতে হয়েছে, যে নেপলস্ সালের্নো অথবা বৃন্দিসিকে পরাস্ত করেছে পাশাপাশি সামুদ্রিক শক্তি অন্য উন্নত সিটি স্টেট-এর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে।

অবশ্য অমলফি পরাস্ত হলেও ভেনিস মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। "শার্লেমেন-এর সময় থেকে এড্রিয়াটিক-এর রানি লেটিন জগতে রাজনীতিতে, তেমনি বাণিজ্যে একটা স্থান করে নেন। ইতালির অন্যান্য বন্দর বা পোতাশ্রয় শহরের তুলার এর অবস্থানের মধ্যেই কতকগুলি সুবিধা ছিল। তা সমুদ্র দিয়ে প্রধান ভূ-ভাগ থেকে বিভক্ত ছিল এবং উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে তা লেগুনের ছোট প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত। কতকগুলি খাল দিয়ে প্রায় সর্বত্র ঘেরা—ভেনিসকে মনে করা হত, যেমন তার বাসিন্দরা, তেমনি বিদেশিরাও মনে করত, এদেশ আক্রমণের বাইরে। মহাদেসোর রাজনৈতিক অস্থিরতা আন্ডিলার সময় থেকে একে প্রায় পরিত্যক্ত করে তুলেছিল। এর জলপথের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল করেছিল, উপনিবেশ স্থাপন, এমন কি জয় করার পক্ষেও অনুকূল করে তুলেছিল।"[২]

তার সদাশয় কল্যাণকর নিরপেক্ষতা এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রতি তার আনুগত্য বিশেষভাবে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল, কারণ পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যের শক্তি হ্রাসে অর্ডেট্রিক উপকূল তার প্রভাবের আওতায় আসে। এবং বাইজানটাইনের উপকূলের প্রধান বাজার, এন্টিওক, আইনোপুস্টিয়া, আডানা টারসাস, আন্তালিয়া, স্টোবি লোস সিওচ ইপিসাস্ প্রভৃতি খোলা রাখা হয়েছিল ভিনিসিয়ান ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। এ রাজ্যের বাণিজ্যনীতি ছিল খুব দূরদর্শী ও বিজ্ঞ। সে এরূপ

১. রেমন্ড বিজলি; 'দ্য ডন অব মডার্ন জিওগ্রাফি', ২য় খণ্ড; পৃষ্টা ৪০১

২. তদেব; পৃষ্ঠা: ৪০১

নীতি গ্রহণ করত যে, 'বলবানের পক্ষে থাকে, বিশেষ করে সামুদ্রিক সংগ্রামে।' এই নীতিই সে মেনে চলত। এতেই সে শত্রুকে পরাভূত করতে সমর্থ হয়েছে। এবং বলবানদের অনুগ্রহভাজন হয়ে সে তার নিজ মহত্ব অর্জন করেছে।

আর একটি নগর রাষ্ট্র জেনোয়া, প্রাচ্য-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে কিছু বিলম্বে। তার উত্থান সূচিত হয় ১০৯৭ সালে। "এ-রাষ্ট্রের উৎস খুঁজতে হবে 'ক্যাম্পদ্যাগনায় বা রাজনৈতিক সংগঠনে। একাদশ শতকে স্পর্শ করে তার জন্ম, স্বাধীনভাবে নির্বাচিত এর ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে বিকাশ কর্তৃক সমর্থিত যেমন।[১]

১০৯৭ থেকে ১১২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে এবং লিভানটাইন উপকূল ও আফ্রিকায় কল-কারখানা নির্মাণ করে। তার ব্যবসা-বাণিজ্য আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্য দিয়ে মিশর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং টিউনিস ও দক্ষিণ উপকূলবর্তী শহরেও ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্য দিয়ে বিস্তারলাভ করে।

জেনোয়া মতোই আর একটি রাজ্য ছিল পিসা, জন্মলাভ করে ১০৮৫ সালে। অস্ত্রশক্তির সাহায্যে সে মুসলমান ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের নিকট থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। তার বাণিজ্যসম্ভার এত বিরাট ছিল যে, পশ্চিমীরা এই জলদস্যুর চেহারা দেখে বিস্ময়াভিভূত, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে শহরের রাজপথ পর্যন্ত সর্বত্র তার বিস্তার। পেগান, তুর্ক সিরিয়ানস, পার্থিয়ানস, এবং চলদিনস্— সর্বত্র শহর, শহরের দেওয়াল, সর্বত্র সে আছে। এখানে সবাই, জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে।'[২] পিসা থেকে বেশি সচেতনতা ও সুযোগ কারো নেই, তার সামুদ্রিক কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর।

এইসব রিপাবলিকের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ তার প্রথম অবস্থায় গতিসম্মত হয় ক্রুসেডের দ্বারা। অবশ্য ক্রুসেডের মেগাশক্তির দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত নই। যদিও এ সময়ের সব চেয়ে বড় মিলিটারি শক্তি ছিল ক্রুসেড। ক্রুসেডের ব্যবসায়িক দিকই আমাদের বিবেচ্য ছিল। সেটাই আমাদের আকর্ষণ দাবি করে।

সাগরের বিপদ এবং ভীতি দুটোই আছে।[৩] সে জন্য সমুদ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা মানুষের খুব কমই থাকে। "সেকালে একথা সত্যিই বলা যেত যে, কোনও দায় না থাকলে কেউ সমুদ্র যাত্রা করত না। কারণ সমুদ্রযাত্রা ছিল এক প্রকার বন্দিদশা

১. রেমন্ড বিজলি; 'দ্য ডন অব্ মডার্ন জিওগ্রাফি' ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা ৪১৯

২. তদেব; পৃষ্ঠা ৪২৭-২৮

৩. 'নেমোসিস অব নেশনস' : পৃ: ২১৯-২০

যার মধ্যে ডুবে যাওয়ার অতিরিক্ত আশঙ্কা ঝুঁকি রয়ে গেছে।"[১] জলপথের ব্যবস্থার গুরুত্ব অবশ্য ক্রুসেডারদের কাছে বোঝানো হয়েছে প্রথম ক্রুসেডে (১০৯৬-৯৯) এ স্থলপথের ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এবং জলপথের যোগাযোগ যে এই ইতালীয় রিপাবলিকের হাতেই রয়েছে সে কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং ক্রুসেডারগণ এই সব রিপাবলিকের কাছে বেশি-বেশি করে দাবি করতে শুরু করল। সদ্যউন্নত বাণিজ্যের সুবিধাও রিপাবলিকগুলিই পেত।

খ্রিস্টধর্মকে সেবা করার মাধ্যমে রিপাবলিকগুলি আসলে নিজেদেরই সেবা করত। তারা ব্যবসা বৃদ্ধি করত বহুগুণ, তারা আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। সর্বোপরি তারা একটা সুবিধাবাদী রাজনৈতিক অবস্থান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল, লেভেন্ট উপকূলবর্তী স্থানসমূহে, এবং সময় অতিবাহিত হলে ক্রুসেডের রাজপুত্রদের নিকট তারা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। তারা তাদের অধিকারকে আরও মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে সমর্থ হল যেহেতু পবিত্র যুদ্ধের দায় মুখ্যত তাদের উপরই এসে বর্তাল, যেহেতু তারাই হয়ে উঠল শক্তি হিসাবে প্রধান।"[২] ক্রুসেডকে মনে হল অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হতে লাগল। ক্যাথলিকদের দ্বি-কোটিক উদ্দেশ্য ছিল, যা সেন্ট বার্নার্ড এর কথায় স্পষ্ট হল, দ্বিতীয় ক্রুসেডের সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, "অসংখ্য মানুষের মধ্যে প্রচন্ড বদমাইস, অধার্মিক, অপবিত্রকারী, নরঘাতক এবং মিথ্যা হলফকারী বাদে সামান্য কিছু মানুষ পারে যাদের বিদায় দু'ভাবে সুবিধা সৃষ্টি করে। তাদের ত্যাগ করে আনন্দ করে, প্যালেস্টাইন তাদের আনন্দ করে তাদের পেয়ে। দুইভাবেই তারা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে: এখানে তাদের অনুপস্থিতি, ওখানে তাদের উপস্থিতি"।[৩] অসন্তুষ্ট মহৎ ব্যক্তিগণ, অস্থিরচিত্ত যারা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে ইচ্ছুক অপরাধীগণ এবং পাপীদের ক্রুসেড সম্পর্কে মতামত ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে যারা পবিত্র ফলে রোমান্টিক তাদেরও লক্ষ্য দিশা ছিল।

"কিন্তু ধূর্ত ব্যবসায়ীগণ, প্রজাতন্ত্রের নাবিকগণ ক্যাথলিক লর্ড এবং শ্রমিকদের চেয়ে ক্রুসেডদের ভিন্ন চোখে দেখত। ধর্মীয় উৎসাহ বিবর্জিত তারা ছিল না। কিন্তু তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মাপকাঠিতে একে চর্চা করত, মানসিক অনুভূতির মাপকাঠিতে নয়। ইসলাম ব্যাপারে একপ্রকার অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের। খ্রিস্টের উপদেশাবলীর প্রতি আবেগ বিশাল শ্রদ্ধাবোধ প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত যোদ্ধা ও

---

১. রেমণ্ড ব্রিজলি, খণ্ড-২; পৃ: ৪০৭
২. তদেব; পৃষ্ঠা : ৪০৭
৩. তদেব; পৃষ্ঠা : ৪০৭

অভিযাত্রীদের প্রতি উদ্দীপিত করে তুলেছিল। ভেনিস বা পিসা, জেনোয়া বা অমলফিতে যারা শাসন কার্য করত, বেচাকেনা করত তাদের প্রতি ব্যবসায়িক শ্রদ্ধাবোধের কোনও অভাব ছিল না।"[১] ক্রুসেডের ফলাফল ছিল প্রত্যাশার বিপরীত। ক্রুসেডাররা যা চাননি তা তাদের লাভ করতে হয়েছিল অথচ লভ্যাংশ কোনও অংশে ক্ষুদ্র ছিল না। স্থলভাগে যা ক্রুসেডের পূর্ণ প্রকাশ, অনেক পশ্চিমাদেশের জলভাগেও তা পূর্ণ প্রকাশের সময়। এবং ধর্মীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে সংগ্রামের প্রধান ফল পাওয়া যাবে খ্রীষ্টান বাণিজ্যের বিকাশের মধ্যে। এবং প্রাচ্য বা মুরসভ্যতার মধ্যে তা লক্ষ্য করা যাবে না। কেননা প্রাচ্য—প্রাশ্চাত্যের নিরতিশয় দ্বন্দ্বের মধ্যে ইউরোপ ও ক্যাথলিক জগতে সামান্যই স্থায়ী লাভ পাওয়া সম্ভব, অবশ্য রাজনৈতিকভাবে। বিপরীত ক্রমে বাণিজ্যের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় জাতিগুলির কাছে একটা ভবিষ্যতের বাস্তব ছবি তুলে তুলতে পারে। ক্রুসেডের সম্মুখ যুদ্ধ ব্যর্থই হয়েছে, কিন্তু ক্রুসেডীয় দ্বন্দ্ব এক ধরনের নতুন সভ্যতা, বাস্তব উন্নতির বার্তাবহ। এক অস্থির দুর্বিনীত উচ্চাশা যার ফলাফল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবজাগরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাবে। বিত্তবান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের মধ্যেও পাওয়া সম্ভব এবং সর্বোপরি ইউরোপীয় অস্ত্রবিদ্যা ও পৃথিবীব্যাপী তৎপরতার মধ্যে পাওয়া যায়।"[২]

এসব কথা ক্রুসেডের সহ্যশক্তির অতিরঞ্জিত বর্ণনা বলে মনে হতে পারে এবং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, তারা ইউরোপে এক প্রকার উদারনৈতিক শিক্ষা চালু করেছেন এবং ব্যবসায়ীদের স্থায়ী পা রাখার জায়গা করে দিয়েছে যেখানে খ্রিস্টীয় শাসকরা বরং ধ্বংস কার্য সাধন করেছেন।

ক্রুসেডারদের সাহায্য করার জন্য ইতালীয়রা অভূতপূর্বভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকে এলাকার অধিকার লাভ করেছিল অবশ্য তা চীনদেশীয় বাণিজ্য স্থানের মতো ছিল না। ভূমধ্যসাগরীয় পূর্বপ্রান্তের দেশসমূহের জন্য তারা প্রত্যেকে প্রতিযোগিতা করত। "সিরিয়ার ক্রুসেডের মোসলেম পশচাদভূমির মধ্যে পড়ে চারটি বাজার: আলেপ্পো, দামাস্কাস, হেমস্ বা এমেসা এবং হাওয়াথ, তারও পশ্চাতে পড়ে বাগদাদের বৃহত্তর বাণিজ্য কেন্দ্র এবং মসুলের ছোট সংগ্রহশালা এবং বাসোরা বা বাসরা, টাইগ্রিস আলেপ্পো ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র—ক, খালিপের আম্বাসাইড থেকে এন্টিয়োক, পশ্চিমাংশের লাউ ডিসিয়া পর্যন্ত। এই পথ ইদ্রিসি যাকে বলেছেন বিরাট

---

১. রেমণ্ড ব্রিজলি: 'আউটলাইন অব ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি' খণ্ড-২; পৃ: ৪০৮

২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৪১

ইরাক, পারসিয়া ও খোরাসানের গ্রেট অ্যাভেনিউ এবং আলেপ্পির রেশম বাজার দূর প্রাচ্যের আরব দূরের দেশ সমূহের তাদের সম্পর্ক প্রমাণ করেছে। এমন কি ত্রয়োদশ শতকের শেষাংশেও অনেক ভেনিসের ব্যবসায়ী এখানে বসবাস শুরু করে রেশম ও ফটকিরির কারবার করার জন্য। ক্রুসেডাররা এন্টিয়োক সিটি দখল করার পর যে মাজশ বস্তু বা গোলমরিচ পুপুল জাতীয় দ্রব্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তা ভারতবর্ষের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় পথে বাণিজ্য যোগাযোগ প্রমাণ করে। বয়স্ক সানাটো সঠিকভাবেই চতুর্দশ শতকের গোড়াতে একথা বলেছেন প্রাচীনকালে প্রাচ্যের অধিকাংশ ব্যবসায়িক দ্রব্যাদি এই পথেই রোমান সাগরে প্রবেশ করত।"[১] ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের এই লোহিতসাগর পথে ঘন-ঘন যাতায়াত ভারত এবং আলেকজান্দ্রিয়ার দুই পৃথিবীর বাণিজ্যের বাজারে" কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

ইতালীয় রিপাবলিকগুলি প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যসম্পদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় এবং মহাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত অতি-উষ্ণ ভূমিতে অবস্থিত অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে এবং এইভাবে 'ভূমধ্যসাগরীয়—অঞ্চলে অবস্থিত ইউরোপীয় তৃণাঞ্চল বাণিজ্যের আওতায় আনে। উত্তরাঞ্চল মূলত আধা বর্বর অঞ্চল বলে গণ্য হত। বাল্টিক উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যকর্মাদি অল্পই হত। ভাইকিং ছিল'অর্ধ ব্যবসায়িক এবং অর্ধেক জলদস্যু কবলিত।' "যতটা আমরা জানি, এই বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম (উত্তরাঞ্চলে) ফিনিশীয় বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম এবং গ্রিক উদ্যোগ থেকে ভিন্নতর ছিল দুইভাবে। তা সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত ছিল না। ফিনিশিয়রা বিশেষ বিশেষ স্থানে ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছিল এবং মাতৃভূতি থেকে বেশ কিছু দূরে তাদের ব্যবসায়ের শাখাপ্রশাখা এবং অধিকার ও দায়বদ্ধতা স্থাপন করেছিল। কিন্তু শহর ও কলোনিতে অশ্ব ব্যবসা তেমন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়নি। স্ক্যানভিনেভীয় জলদস্যুরা ছিল অভিযানপ্রিয় যারা বের হয়ে যেত ভাগ্যান্বেষণে, কোনও রাজ্যে নিজেকে অভিষিক্ত করতে। অশ্বারোহী অভিযাত্রীদের শহর জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রবণতা অধিক ছিল, অন্যান্য জার্মান ভাষাভাষীর তুলনায় তারা চাষ আবাদ করতে বা কলোনি স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল, এবং কখনও তাদের শক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে কোনও এক স্থানে সংহত করত না।"[২] না, তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে, অশ্বারোহীরা শান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক। তুলনায় দীক্ষিত হওয়ার পর, ফ্লেমিশ-শহরে শান্তিপ্রিয় জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হল। তা ইংলন্ডের পশম উৎপাদনের সঙ্গে খুব যুক্ত হয়ে পড়ে। ফ্লেমিশ কাপড়চোপড়ের সঙ্গে তার বিনিময় ঘটে।

১. রেমণ্ড ব্রিজলি, ২য় খণ্ড; পৃ: ৪৪১

২. উইলিয়াম কানিংহাম: 'ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন (মডার্ন টাইমস)'; পৃ: ১১০

ফ্লেমিশ হাউস অব লন্ডনকে ঘিরে ফ্লেমিশ ব্যবসায়ীগণ সংগঠিত হয় এবং তাদের ব্যবসাপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। জার্মান ব্যবসা-বাণিজ্য জার্মান হাউস থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ফ্লামডাস-এর বাইরে। এটা হল উত্তর জার্মানির অনেকগুলি শহরের কন্‌ফেডারেশন। এই জার্মান হ্যানসিটিক লিগ মধ্যযুগের সবচেয়ে বিস্তৃত বাণিজ্য কেন্দ্র। এ সংগঠন বাল্টিকের দ্রব্যাদি, যেমন লৌহ ইস্পাত, রৌপ্য, আলকাতরা, লবণ, লবণাক্ত ও স্মোকড ফিক্‌, ফার, অম্বর এবং অন্য কয়েকটি মোটা দ্রব্য সংগ্রহ করে। জিনিসপত্র, যা দূরের দেশ থেকে আমদানিকৃত এবং ইতালীর ব্যবসা বাণিজ্যের শহরের মাধ্যমে আনা হত। এইভাবে এই ইতালিয় এজেন্সির মাধ্যমে "আরব ও পারস্যের ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের, এমন কি চিনের উৎপাদিত দ্রব্যাদি পশ্চিম ইউরোপে আমদানি হত যেমন প্রাচীন যুগে, তেমনি সমগ্র মধ্যযুগে। রেশম ও সুতা কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি, নীল ও অন্যান্য রজতক দ্রব্যাদি সৌরভযুক্ত কাঠ ও কাষ্ঠদ্রব্যাদি, আটা, মাদক ও অন্যান্য ড্রাগ, মুক্তা, চুনি বা পদ্মরাগমণি, হীরক, নীলকান্তমণি ও অন্যান্য দামি মণিমুক্তা, সর্বপ্রকার খাওয়ার মশলা, দারুচিনি, আদা, পিপুল সোশ, রূপা, লবঙ্গ, এবং অন্যান্য মশলা, এশিয়া থেকেই পাওয়া সম্ভব ছিল।"[১] এভাবে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য একটা জীবন্ত প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল তাকে বিভিন্ন পথে পরিপুষ্টি দান করা হয়।

কিন্তু এই প্রক্রিয়া প্রথমে ইসলামের উত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা যখন কল্পনা করি ব্যবসা-বাণিজ্য স্থল ক্যারাভ্যান-এ বোঝা চাপিয়ে সম্পন্ন হত, আমরা বুঝতে পারি কত প্রকার বাধাবিপত্তি তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। কারণ ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী সৈনিকরা দ্রুত চলাচল করার জন্য যে বাধা বিপত্তি দেখা দিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তা বাধার সৃষ্টি করত। এশিয়া থেকে ইউরোপ যাওয়ার চারটি বাণিজ্য পথ ছিল। এবং এগুলি সবই আরব বেদুইনদের চলাচলের ক্ষেত্রের উপর দিয়ে অবস্থিত ছিল।

"ধর্মযুদ্ধের দিনগুলিতে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর বরাবর স্থলভাগে রাস্তা যুদ্ধোন্মাদ মুসলমান শক্তির দখলে ছিল, আর একটি ঘুরপথে ও অধিকতর ব্যয়বহুল রাস্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। স্থলার্ধে জিনিসপত্র বহনের জন্যই এরূপ পথের দরকার ছিল। এই রাস্তা প্রথমে সিন্ধু উপত্যকা বরাবর বিস্তারিত তারপর পার্বত্য অঞ্চলে ভারবাহী পশুর সাহায্যে মালপত্র টানানো হয়, তারপর অকসাস ও

১. এডওয়ার্ড স্লো পি চিনি; সোসাল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিস্ট্রি অব্‌ ইংলন্ড; পৃঃ ৮৬

সর্বশেষ ক্যাসপিয়ান সাগর বরাবর। এটি একটি প্রাচীন রাস্তা, এখন ভেনিস ও জোনোয়া তা ব্যবহার করে থাকে। ক্যাস্পিয়ান থেকে এ-রাস্তা ভোলগার দিকে জারিন নামক স্থানে গেছে, তারপর সমগ্র দেশের মধ্য দিয়ে ডন পর্যন্ত গেছে, এখানে নদীর মুখে শহরে টানা এখন যার নাম অজর, ভেনিস ও জেনোয়া বাণিজ্য শহর। তারমধ্যে ভেনিসের তো দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে একটা কনসাল ছিল। পরবর্তীকালে জেনোয়া থিয়োডোসিয়ার বর্তমান নাম ক্রিমিয়ার জাত্তার বাণিজ্য কেন্দ্র হয়।"[১]

"ইসলাম চারদিক থেকে খ্রিষ্টধর্মকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল। কি পূর্ব দিক, কি দক্ষিণাঞ্চল, মুসলমান ধর্ম প্রাচীণ তুলে দিয়েছিল ক্রুসের অগ্রগতির বিরুদ্ধে।"[২] কিন্তু এই ইসলাম ও ক্রুসের মহতী সংগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। "ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিপথে অট্রোমান অবরোধ বা বাধা কেবল ভূমধ্যসাগরীয় রিপাবলিকগুলিতেই বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, এই আঘাত জেনোয়া এবং ভেনিসের ওপর আঘাত সৃষ্টি করে এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের সমগ্র প্রক্রিয়ায়ও আঘাত সৃষ্টি করে। যে পথে এশিয়ার সম্পদ খ্রীষ্টীয় জগতের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে পৌঁছায় তা হল হ্যান্সিটিক লিগ"[৩] হ্যান্সিটিক প্রধানত ইতালীয় রিপাবলিক দিয়ে আসা প্রাচ্য দেশীয় পণ্য দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করেই লাভবান হয়। প্রাচীনকাল থেকে "জার্মানি ও উত্তর ইতালীয় উচ্চভূমি রিপাবলিকের (*ভেনিসের) উপর প্রাচ্য দেশীয় সম্পদের জন্য নির্ভরশীল ছিল এবং যখন ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে মশলা বোঝাই জাহাজ ডুবে যায় একজন বর্ণনাকারী একে রীতিমত দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেন।[৩]

ভারতীয় বাণিজ্য হ্যান্সিটিক ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করত। যখন প্রাচ্য বাণিজ্যে টান পড়ে তখন ইউরোপীয় সংগ্রহশালাও দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে অস্বীকার করে।"[৪] এই প্রাচীন বাণিজ্য রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা (**) ইউরোপের পশ্চিমাংশের ব্যবসাপত্রের বিস্তার নির্ভর করে। সমস্ত বিষয়টি চমৎকারভাবে ধরা পড়ে যখন প্রফেসর এ. এফ. পোল্যান্ড বলেন, আমেরিকা কেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে এসে আবিষ্কৃত হল, তিনি বলেন, এটা একটা আত্মবিরোধী কথা হলেও সত্য যে,

---

১. ডবলিউ. এম. ক্যানিংহাম; "ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন" (মডার্ন টাইমস); পৃ: ১৩০

২. ডব্লু. ডব্লু. হাস্টার ; 'এ হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' খণ্ড-১; পৃ: ৫২

* অস্পষ্ট এবং মুছেফেলা শব্দ

৩. ডব্লু. ডব্লু. হান্টার, খন্ড, ১, পৃ: ৫৩

৪. ব্রিজলি; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ: ৪০৫

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে, কারণ তুর্কিরা বাধার সৃষ্টি করে। এই যোগাযোগ হয়তো যথেষ্ট বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী যোগাযোগই সর্বদা যথেষ্ট নয়। জার্মানদের একটা প্রবচন আছে মানুষ হল সে যা খায়, তাই। এটা হয়তো (.......) কারণ সেইসব মানুষের লক্ষ্য হল......... (এই অংশ অসম্পূর্ণঃ সম্পাদক)।

□ □ □

অধ্যায় ৩

প্রাক-ব্রিটিশ ভারত

পৃথিবীতে যে-কোনও বস্তুর চেয়ে প্রতিরোধের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর চাহিদা রয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কাজেকর্মে তার চেয়ে বড় কিছুর অভাব বোধ করে না।

গ্রিকরা যেমন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একটা কথাও বলে না, অথবা নগর-রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও ধারণাও পোষণ করে না, রোমানরা কিন্তু তার বিপরীত, পৃথিবীতে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী মানুষ যারা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছে যে, তা তাদের উত্তরাধিকারীদেরই ঐতিহ্য।

তারা দাবি করে যে, তারা এক উন্নত জাতি, যারা এমন এক উচ্চমানের সংস্কৃতির অধিকারী যা অন্য কোনও সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। তারা এ-দাবিও করে যে, তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাদিও উন্নতমানের এবং তারা জীবনযাত্রায়ও সুদক্ষ, বিশারদ। তারা আরও দাবি করে যে, বাদবাকি নিকৃষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, যাদের সংস্কৃতি অতি নিম্নমানের এবং যারা জীবনচর্যায় আদৌ সুদক্ষ নয় এবং যাদের শাসন ব্যবস্থাও স্বেচ্ছাচারী যুক্তি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারেই তাদের অনুন্নত ভ্রাতা-ভাগিনীদেরকে উন্নত করা ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য তাদের পালন করতে হবে, অন্যভাবে বললে ভুল হবে না যে, তাদের জয় করে নিজ উন্নতমানের সংস্কৃতিকে মানবতার তাগিদেই তাদের উপর প্রয়োগ করা কর্তব্য।

ব্রিটিশও ঠিক একই ভাবে, সমযুক্তিতে ভারতীয়দের উপর তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগ করেছে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা, ভারতের ক্ষেত্রে যে-নীতি দ্বারা চালিত, তা হল লুই বসওয়েলিয়ানা যার অর্থ হল প্রশংসার নীতি। তাদের দৃষ্টি কোনও না কোনও ভাবে ব্রিটিশের ভারতীয় পূর্বপুরুষদের অপরাধকে আলোকিত করে, সদগুণকে নয়। তারা মোঘল ও মারাঠা শাসকদের স্বেচ্ছাচারী বা দস্যু নামে অভিহিত করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের শাসনাধীনে অবস্থিত জনগণের নৈতিক মান ও সভ্যতার উপরও নিন্দা ও কলঙ্ক আরোপ করেছেন। ব্যক্তির পক্ষেই এরূপ স্বাভাবিক, অন্যকে নিচু না করে নিজেকে তুলে ধরা যায় না।

* পাণ্ডুলিপিতে এই অধ্যায়ের নম্বর ছিল ৫—সম্পাদক

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা এক প্রকার বিভ্রান্তিতে ভুগেছেন এবং তা হল, ব্রিটিশ শাসনকে তাঁরা তাঁদের নিকট বা দূরের পূর্বসূরিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁদের উচিত ছিল ঐতিহাসিক রীতিনীতি অনুসারে তাঁদের ভারতীয় শাসকদের তাঁদের-ই দেশীয় সমকালীন শাসকদের সঙ্গে তুলনা করা। অনেক ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিই আদৃত হতে পারত যদি আমরা ঘনিষ্ঠভাবে এই নীতি পদ্ধতি মেনে চলতে পারতাম। এটা তো ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে এমন দয়ার ব্যাপার নয়, যে মুসলমানদের সময়ের হিন্দুদের অতীব দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে যখন আমরা জানি যে, রোমান শাসকদের সময়ে অ্যাংলো স্যাকসনদের অবস্থা কেমন হয়েছিল। যখন "একজন ইংরেজ মানেই দাঁত-খিঁচুনি, তখন একজন বিচারক নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন দুর্বৃত্তায়নের উৎস, নিযুক্ত হলেন ম্যাজিস্ট্রেট যাঁর কাজ হল সঠিক বিচার কার্য পরিচালনা করা, কিন্তু আসলে তিনি হলেন নিষ্ঠুরতম স্বেচ্ছাচারী শাসক, বিরাট দস্যু, তার চেয়ে সাধারণ চোর ডাকাত তো ছেলেমানুষ......যখন বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অনেক টাকার মালিক হলেন অথচ সে টাকা কোথা থেকে এল প্রশ্ন উঠল না ; যখন উচ্ছৃঙ্খলতা এত বড় যে স্কটল্যান্ডের রাজকুমারীকেও গা ঢাকা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় আবরণ পরিধান করতে হয় কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বড়ই দৃষ্টিকটু।"

বহুকথিত মুসলমান নিষ্ঠুরতা জেরুজালেম বিজয়ের সময় প্রথম ক্রুসেডারগণ যা করেছিল তার তুলনায় এমন কিছু নয়। ৪০,০০০ লোককে নির্বিচারে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। অস্ত্র সাহসীদের থামায়নি, ভিরুকেও বিনয়ী করেনি। বয়স, বা নারী পুরুষ নির্বিশেষে কোনও দয়া প্রদর্শিত হয়নি ; যে অস্ত্রে মা বিদ্ধ হয়েছে সেই এক-ই অস্ত্র শিশুকেও বিদ্ধ করেছে। জেরুজালেমের রাস্তা শবে ভর্তি, প্রতিটি গৃহ থেকে আতঙ্কের আর্তনাদ শোনা যেত।"

এইভাবে যদি আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং পাশাপাশি ইংলন্ডের ইতিহাসের উপর লক্ষ্য রাখি এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর তুলনা করি আমরা দেখব যে, আমরা প্রতিটি দেশীয় রোল্যান্ডের জন্য একজন ইংরেজ অলিভার আছেন। ভারতবর্ষের ইংরেজ ঐতিহাসিকদের জন্য স্যার টমাস মুনরো যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা আমরা পুনরায় উচ্চারণ করব। তিনি বলেছিলেন, "আমরা যখন অন্যান্য দেশকে ইংলন্ডের সঙ্গে তুলনা করি, আমরা সাধারণ আজকের ইংলন্ডের কথা বলি, আমরা সংস্কার যুগের আগে যাই না। আমরা প্রত্যেকে বিদেশকে অজ্ঞ এবং অসভ্য ভাবি, ভাবি না যে, তাদের অগ্রগতির অবস্থা আমাদের মতোই বা কখনও-কখনও আমাদের চেয়েও উন্নত এবং তা খুব দূরের সময় ধরেও নয়।"

সুতরাং আমাদের 'স্বেচ্ছাচারী ও দস্যু' যারা ইংরেজ শাসকদের পূর্বে ভারতবর্ষ শাসন করত তাদের দিকে ফিরে তাকাতে হবে, তাদের কর্মকীর্তি ও স্ব-স্ব কালে ভারতীয় জনগণের অবস্থা কেমন ছিল তা পর্যালোচনা করতে হবে।

এরূপ জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োজন এই কারণে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তার সঠিক মূল্যায়ন এইভাবেই হতে পারে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই, যেহেতু সে বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি।

আমাদের এরূপ স্পষ্ট ধারণা রয়েছে যে, মুসলমান বিজয়ের আমলে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের উন্নতি ঘটে। কনৌজের সমৃদ্ধি এবং সোমনাথের মন্দির এর বড় নজির। এটা ভ্রান্ত ধারণা যে, মুসলমান সার্বভৌম রাজারা বর্বর ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। অপর পক্ষে তাদের অধিকাংশ ছিলেন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। গজনির মহম্মদ "এরূপ ঐশ্বর্য, এরূপ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রতিপত্তি প্রদর্শন করতে সমর্থণ হন যে, তাঁর রাজধানীতে সাহিত্যের প্রতিভাধরদের সমাবেশ ঘটে, যা এশিয়ার অন্য কোনও রাজসভায় দেখা যায় না। ধনসম্পদ সংগ্রহে যদি লোভীও হতেন, তিনি বিচারে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাঁর এমন জাঁকজমক ছিল যা কিভাবে খরচ করতে হবে তা তিনি জানতেন।"

তার স্বনামখ্যাত উত্তরসূরির মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা (সুলতানা রিজিয়া)। ফিরোজ শাহ্ ছিলেন একজন নাম করা প্রশাসক। জনগণের জন্য তাঁর কাজের নমুনা: " ৫০টি নদী বাঁধ জলসেচের জন্য, ৪০টি মসজিদ নির্মাণ, ৩০টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১০০টি ক্যারাভ্যান সিরিজ, ৩০টি রিসর্ভর, ১০০টি হাসপাতাল, ১০০টি স্নানাগার, ১৫০টি ব্রিজ, এছাড়াও অন্য বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন আনন্দ ও ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে। সর্বোপরি যমুনা নদীর সঙ্গে যেখানে হাউসি ও হিসার নির্গত হয়েছে এবং এই কাজটি আংশিকভাবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সংস্কার সাধিত হয়। এই সরকারের অধীনে ঐতিহাসিকেরা সরকারিভাবে রায়তদের দিকে অংশগ্রহণ করে। তাদের বাড়িঘর আসবাব, সোনা ও রূপার অলঙ্কার যা তাদের মহিলারা পরত........ মিলো ডি কন্টি, একজন ইতালীয় পর্যটক ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করেন, গুজরাতে যা দেখেছেন তার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। গঙ্গা পারের সুন্দর ফুল বাগান ও ফল বাগান দেখেছেন। তিনি মারাজিয়া পৌঁছনোর আগে চারটি শহর অতিক্রম করেন। এই শহর ছিল সোনা রূপও মূল্যবান ধাতু দ্রব্যে পূর্ণ। তাঁর

বর্ণনা বারবোরা ও বার্টিমার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। এরা পরিক্রমা করেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ক্যাম্বের বর্ণনা দিয়েছেন, সুন্দর সৌষ্ঠবযুক্ত শহর হিসাবে তার অবস্থান এক সুন্দর দেশে, যেখানে সব দেশের ব্যবসায়ী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। যেখানে ফ্লান্ডার্স-এর মতো আর্টিসন এবং উৎপাদক থাকেন। সিজার ফ্রেডারিকও অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন গুজরাটের। এবং ইবন বতুতা যিনি মহম্মদ তুঘলকের স্বেচ্ছাচার ও নিষ্পেষণের মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভ্রমণ করেন, যখন দেশের অনেক স্থানে বিদ্রোহ চলছিল, বৃহৎ জনবহুল শহরের বর্ণনা করেন এবং সেই সব রাজ্যের বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন যেখানে বিশৃঙ্খলা চলার পূর্বে সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করত।”

বাবর, ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এদেশের সম্পদশালী রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এদেশের বিশাল জনসংখ্যা এবং সর্বত্র কারিগর-শিল্পী লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি জনহিতকারী শাসক ছিলেন। জনহিতকর কাজকর্ম করেছিলেন। শেরশাহ কিছুদিনের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর ব্যতীত তিনিই ছিলেন মহত্তম মুসলমান শাসক। বাবরের মতো তিনিও বহু জনহিতকর কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। আকবরের জনকল্যাণকামী প্রশাসন এত বহুলপরিচিত যে, কোনও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

শাহজাহান, যিনি শাসক হিসাবে যত না প্রজা শাসন করেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন তাঁর পরিবারের পিতা, তিনি মহত্তম ঐশ্বর্যশালী হিসাবে চিহ্নিত হন। তাঁর রাজত্ব ছিল সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ।

মোঘলদের শেষ সম্রাটদের সমসাময়িক মারাঠা রাজত্বের জনগণের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন পর্যটক বলেছেন, “সুরাট থেকে আমি ঘাট বরাবর অগ্রসর হলাম। এবং যখনই আমি মারাঠাদের দেশে পৌঁছলাম, আমি সরলতা ও সুখ সমৃদ্ধির স্বর্ণ যুগের জগতে উপস্থিত হলাম বলে মনে হল। মনে হল প্রকৃতি এখানে অপরিবর্তিত। যুদ্ধ ও দুঃখ এখানে অজানা। মানুষজন খুশি, উৎসাহী স্বাস্থ্যবান এবং বাধাহীন অতিথেয়তা এখানে শাশ্বত সদ্‌গুণ। প্রত্যেক বাড়ির দরজা খোলা থাকে, এবং বন্ধু প্রতিবেশী ও আগন্তুক একাকার, সাদরে আমন্ত্রিত হয়।”

টিপু সুলতানের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক বলেন, “যখন একজন ব্যক্তি, কোনও এক অপরিচিত দেশের মধ্যে চলতে-চলতে দেখতে পায়, জমিতে চাষ আবাদ ভাল, লোকজন আছে এবং পরিশ্রমী, শহরগুলি নবনির্মিত, ব্যবসা-বাণিজ্য সুবিস্তৃত

শহরাঞ্চলের বিস্তার ঘটছে, এবং প্রতি বিষয়ের উন্নয়ন ঘটছে ফলত সুখের সন্ধান মেলে, তা হলে তিনি এই সিদ্ধান্তেই আসবেন যে, এ দেশের সরকার জনগণের সম মনোভাব সম্পন্ন। টিপুর দেশের এই হল চেহারা। এবং তাঁর সরকার সম্পর্কেও এই আমাদের ধারণা।"

"তাঁর দেশে সর্বত্র লোক বসতি ছিল এবং দেশের মাটি যতটা শস্য দিতে পারে ততটাই চাষ আবাদ হত।"

তাঁর সরকার যদিও কঠোর ও খামখেয়ালি স্বেচ্ছাচারী ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী প্রজা লালন পালন করত, নির্যাতনের উর্দ্ধে প্রজারা ছিল তার ধন সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার। তার নির্দয়তার লক্ষ্য ছিল তার শত্রু হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিরা।

ক্লাইভ বাংলাকে বলেছেন, এমন দেশ সেখানে সম্পদের শেষ বলে কিছু নেই। ম্যাকলে বলেছেন, "মুসলমান স্বেচ্ছাচার মারাঠা দস্যুতা সত্ত্বেও বাংলা প্রাচ্য দেশ জুড়ে ধনী স্বর্গের বাগান বলে অভিহিত হত। এর জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি হত। দূরের প্রদেশ সমূহ প্রতিপালিত হত তার শস্য ভাণ্ডারের ভর্তি খাদ্যশস্যের দ্বারা এবং লন্ডন ও প্যারিসের মহান মহিলারা তার তাঁতে তৈরি বস্ত্র পরে সম্মানিত হতেন।"

কিন্তু ব্রিটিশ দ্রব্যাদির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হল। সমুন্নতি ভারত থেকে বিদায় নিল এবং ইউনিয়ন জ্যাক-এর বিজয় ঘোষিত হল।

জনশক্তির প্রতিষ্ঠা হল সংসদে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে।

কোম্পানির আইন যা হোক বিজ্ঞ বিষয় ছিল না। এ-ছিল কঠোর, তা নিরাপত্তা ছিল কিন্তু সম্পত্তির বিনাশ ঘটল। শাসন প্রণালী স্বচ্ছ ছিল না। অ্যাডাম স্মিথ 'বণিকদের কোম্পানিকে স্বাধীন বলতে অপারগ যদিও তারা স্বাধীন হয়ে উঠেছিল বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, "ব্যবসা, অথবা কেনাবেচার সম্পর্ক ছিল তাদের প্রধান ব্যবসা, এবং অদ্ভুত দুর্বোধ্যতা দিয়ে সার্বভৌমত্বকে তারা ব্যবসার পরিপূরক ভাবত। সার্বভৌমত্ব হল যে দেশ তারা শাসন করছে তার স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়।"[১]

অ্যাডাম স্মিথ-এর কোর্ট অব্ প্রোপ্রাইটর ও ডিরেক্টরদের সমালোচনাও, যা শেষ অধ্যায় আছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সত্য বলে মেনেছেন যে, দেশের স্বার্থের

১. 'ওয়েলথ অফ নেশন' (ক্যান্যার্স সং), খণ্ড-২; পৃ: ১৩৬-৭

সঙ্গে প্রত্যেক প্রোপ্রাইটরের স্বার্থ এক, ফলে তার ভোট তার দেশে যেমন এখানেও কিছু প্রভাব প্রদর্শন করবে। কিন্তু তাদের অন্যতর বৃহত্তর গুরুত্বের ব্যাপার ছিল। প্রায়শ একজন মহৎ ব্যক্তি কখনও-কখনও একজন সাধারণ মানুষ যার আধুনিক দৃষ্টি রয়েছে কিছুদিন তার প্রভাব খাটিয়ে চলতে পারে এবং ফলে ভারতে তার ওপর তার ভোট নির্ভর করছে তার জন্য চিন্তাভাবনা করে না। "এমন কি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ধ্বংস বা সুরক্ষা যাঁর দরুণ তার ভোট রয়েছে তার কথাও বিশেষ চিন্তাভাবনা করে না। অন্য কোনও সার্বভৌম শক্তিও টিকতে পারে না, জন্মও নিতে পারে না—এমন সম্পূর্ণভাবে সে সম্পর্কে নিরাসক্ত যে, তাদের জনসাধারণ সুখী কি দুঃখী, তাদের সাম্রাজ্য উন্নতি করছে না অবনত হচ্ছে, তাদের প্রশাসনিক উন্নতি হচ্ছে না অবনতি হচ্ছে—এ সম্পর্কে ভাবে না। এরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটরগণ হলেন একটা বড় অংশ।"

এটা হল, সম্ভবত কোম্পানির শাসন বিষয়ে মোটের ওপর সুদূর প্রসারিত অভিযোগ। কোম্পানির শাসকের প্রথম দিকে এমনটা ছিল, ধীরে-ধীরে এই দুর্নীতি দূর হয়।

স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় শাসন, কোথাও স্থানীয় জনগণের কোনও বক্তব্য ছিল না। তাঁরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা দফতর থেকে বিতাড়িত সামান্য কেরানি ছাড়া তারা অন্য কিছু ছিল না।

অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল যে, গভর্নররা অথবা উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ তাঁদের ক্ষমতার জোরে উপদেষ্টা অথবা দেশের জনগণের পক্ষে চিন্তাশীল সব কাজকর্ম করতে বাধ্য হত। সত্যি কথা বলতে কি, চার্লস ডিকেন্স যেমন অঙ্কন করেছেন, স্যার হন বাউলির মতো অথবা 'গরিরের বন্ধু'র মতো: তোমাদের একমাত্র কাজ, আমার সম্পূর্ণ জনগণ, আমার সঙ্গে থাকা। আমি তোদের জন্য চিন্তাভাবনা করব। তোমাদের কষ্ট করে কোনও কিছু ভাবতে হবে না। আমি জানি কোনটা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। আমি তোমাদের চিরস্থায়ী পিতামাতা। এ-হল সর্বপ্রকার জ্ঞানী-তত্ত্বাবধানযুক্ত বিধান। মানুষ যা করতে পারে, আমি তা পারি। গরিব মানুষের বন্ধু এবং পিতা হিসাবে আমি আমার কাজকর্ম করি। আমি তার মনকে শিক্ষিত করে তুলি সর্বক্ষণের জন্য, সর্বশ্রেণীর জন্য। আমার উপরই সর্ববিষয়ে নির্ভর। তাদের নিজেদের জন্য কিছু করণীয় নেই।"

এই বাউলি-বাক্য, সন্দেহ নেই, ঐশ্বরিক নির্দেশের কাজ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের সবটাই কম করে হলেও ভারতের জন্য মারাত্মক অবশ্যই ইংলন্ডের জন্য অনুকূল।

এমন করে ইংলন্ড উন্নতি করে, পক্ষান্তরে ভারত পারে না, আমাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে যখন আমরা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগে ও পরে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা স্মরণ করি, এবং স্মরণ করি ইংলন্ডের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অবদানের কথা।

স্যার জোসিয়া চাইল্ড ১৫৪৫-এর পরেও ইংল্যান্ডের উন্নতির কৌতূহলোদ্দীপক তুলনামূলক একটা বর্ণনা করেছেন।

তাঁর মতামত অনুসারে বলা যায়, ১৫৪৫ সালে 'ইংলন্ডের ব্যবসাপত্তর ছিল নগণ্য, ব্যবসাদাররা ছিল সামান্য ও নিম্নমানের" তিনি বলেন, "কিন্তু এখন আগের হাজার পাউন্ডের তুলনায় অনেক লোক আছে যারা দশ হাজার পাউন্ডের মসনবদার। সন্দেহ হলে বয়স্কদের জিজ্ঞাসা করে দেখা যাবে। ষাট বছর পূর্বে সম্পত্তির ভাগ বাবদ মেয়েকে পাঁচ শত পাউন্ড দেওয়া হত, এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে দু হাজার পাউন্ডের বেশি হয়েছে কিনা ; এবং ভদ্রমহিলারা তখনকার দিনে সার্জের গাউন পরে ভালো পোশাক পরতে পেরেছে বলে মনে করতেন এখন চেম্বারমেইড সে পোশাক পরে লজ্জা পাবে কিনা। তখনকার দিনের একটি কোচ-এর পরিবর্তে বর্তমানে একশত কোচ হয়েছে কিনা। আমরা এখন এক বছরে যা ট্যাক্স প্রদান করি আমাদের পূর্বপুরুষেরা তা কুড়ি বছরে প্রদান করতেন কিনা। কাস্টমস্ও যথেষ্ট উন্নত এক ভাগ হয়েছে ছয় ভাগ, আগের তুলনায়। ব্যবসার যা পরিমাণ হয়েছে ট্যাক্সের পরিমাণ তত বৃদ্ধি নয়।"

১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্যবসাদার শ্রেণী অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন যে, "শহরের বিক্ষোভের দরুন চার্লস প্রথম কখনই পলায়ন করতেন না, এবং শহরের সাহায্য ছাড়া চালর্স দ্বিতীয়-এর পুনরুত্থান হত না।"২

ভারতবর্ষের অবদান আছে অথবা ইংলন্ডের নানা উন্নতিতে অবদান রাখতে তার প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে।

সম্পদের বৃদ্ধিতে ব্যবসা সর্বাগ্রে স্থাপন করা দরকার। মোট মজুত পণ্য সম্পদ ব্যারোমিটার বিশেষ যার প্রয়োগ ঘটিয়ে ব্যবসার অবস্থাটা আমরা জানতে পারি। এর ফলে ভারতীয় পণ্য ইংলন্ডের বাজারে কতটা মূল্য পায় সেটাও জানা সম্ভব। "১৮শ শতক জুড়ে কোম্পানির পণ্য সামগ্রী সর্বদাই মূল মূল্যের অধিক। ১৭২০ সালে অধিহার ছিল ৪৫০ পাউন্ড, কিন্তু ১৭৫৫ তে তা ছিল ১৪৮ পাউন্ড।

১. 'ডিসকোর্সেস অব্ ট্রেড' (১৭৭৫); পৃ: ৮, ৯, ১০
২. টি. চি. মেকলে; 'হিস্ট্রি অব্ ইংলন্ড' অধ্যায়-৩

আসল মূল্যের চেয়ে এই মূল্য অনেক নিকটের। ১০% গড় ডিভিডেন্ড ধরলেও সুদ ক্রয় মূল্যের উপর সমতা রক্ষাকারী ৫৩$\frac{১}{৩}$%। ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত এর পতন ঘটতে থাকে, তখন এর লভ্যাংশের সম্ভাবনা আকস্মিক দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য স্তর ২৩৩ পাউন্ডে ওঠে। পরের বছরে কর্ণাটক যুদ্ধের ফলে তার পতন ঘটে ৬০%। ১৭৭৯ থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত মূল্যস্তর যুক্তিনিষ্ঠ স্তরে ছিল। গড় ১৫০ পাউন্ড, যদিও ১৭৮৪ সালে এই স্তর কমে দাঁড়ায় ১১৮ পাউন্ড ১০ শিলিং ০ পেন্স। পিট-এর আইনের পর মূল্যস্তর ঊর্ধ্বগতি হয় এবং ১৭৮৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৫ পাউন্ড ১০ শি ০ পেন্স-এ। ক্রমান্বয়ে এই ওঠামানা বিশেষভাবে কমতে থাকে। কোম্পানি এখন সার্বভৌম শাসক, ব্যবসায়ী কর্পোরেশন মাত্র নয়। শেয়ার হোল্ডারদের কোম্পানি এখন সুদ দেয় এবং তার স্টক তার মূলধন এর উপর লভ্যাংশ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। ঝুঁকির কোনও সুযোগই নেই। পরবর্তী বছরের ভারতীয় বাজেটের উপর তার ব্যালান্স শিট নির্ভরশীল।[১]

যে হারে শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়তো ভারত ইংল্যান্ডের সম্পদ সৃষ্টিতে কতটা সাহায্য করে তার প্রকাশ ঘটায়। "১৭০৯ সালের সম্মেলনের পূর্বে তার শিল্প-ব্যবসা যদিও ওঠানামা করেছে সর্বদাই বড় রকমের লভ্যাংশ সৃষ্টি করেছে। ১৬৮২ সালে ডিভিডেন্ড অতিবৃদ্ধি হয়ে ১৬০%। কিন্তু শতাব্দীর শেষাংশে চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৭০৯ সালে, সম্মেলনের পর মাত্র ৮% বৃদ্ধি ঘটে, ১৭১০ সালে ৯%, এবং দুই বছর পরে ১০%, শতাব্দীর গড় বৃদ্ধি প্রায় ৯% এবং তা ঘটে ১৭৬৮ থেকে ১৭৭১ সালের মধ্যে। ১৭২৩ সালে সামান্য হ্রাস ঘটে ফরাসী কোম্পানির প্রতিযোগিতার ফলে, এবং আরও ১% হ্রাস ঘটে মূলধন বৃদ্ধির ফলে এবং সুইডিশ কোম্পানির প্রতিষ্ঠার ফলে ১৭৩২ সালে। ১৭৪৪ সালে তা পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘটে ৮% এবং এই হার চলতে থাকে এগারো বছর ধরে ইউরোপ ও কর্ণাটকে লাগাতার যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও। ১৭৫৫ সালে অমীমাংসিত বিষয়গুলি অবশেষে ফলপ্রসু হতে থাকে এবং ২% হ্রাসপ্রাপ্ত ঘটে। ১৭৬০ সালে বর্ধমান ও অন্যান্য প্রদেশের সমর্পণের ফলে কোম্পানির ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল-এর বৃদ্ধি ঘটে এবং ডিভিডেন্ড হয় ৬% সুতরাং যে টাকা বিলি ব্যবস্থা হয় তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৯১,৬৪৪ পাউন্ড। ১৭৬৭ সালে বাংলার টেরিটরিয়াল সার্বভৌমত্ব স্বীকারের ফলে ডিভিডেন্ড বৃদ্ধি ঘটে ১০% ফলে যে টাকা বিলি হয় তা দাঁড়ায় ৩,১৯,৪০৮ পাউন্ড। এই বৃদ্ধি ছিল নিতান্তই অমূলক এবং এর কারণ ভারতের শ্রীবৃদ্ধির অতিরঞ্জিত রূপ প্রদর্শন। উন্নত লভ্যাংশ সৃষ্টি হবে ধরে নিয়ে বর্দ্ধিত হারে ডিভিডেন্ড ঘোষিত হল

---

১. এফ. পি. রবিনসন: 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'; পৃ: ১৬১
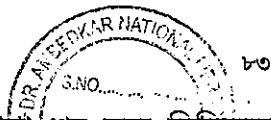
কিন্তু লভ্যাংশের সবটা আদায় হয়নি। ফলে উচ্চহারে টাকা ধার করে ডিভিডেন্ড মেটাতে হয়েছে। কোম্পানি পাঁচ বছর ধরে সুদিনের প্রত্যাশায় ঝুলে থেকেছে, কিন্তু ১৭৭২ সালে একটা আঘাত এল এবং ডিভিডেন্ড ১২½ থেকে নেমে ৬% হল। লর্ড নর্থ তখন হস্তক্ষেপ করলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণার ব্যাপারটা মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর প্রয়োগ ঘটানো হল অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এবং ডিভিডেন্ট বৃদ্ধি করা হতে লাগল ধীরে ধীরে। ১৭৯২ সালে টিপুর সঙ্গে শান্তি চুক্তির পরিণামে কোম্পানি ২,৪০,০০০ পাউন্ড আয় পেল এবং ২% অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপূরণ লাভ করল ১,৬০০,০০০ পাউন্ড এবং ১৮০২ সালে ডিভিডেন্ড ১১% হল।"[১] এ-ছাড়া " যে টাকা ইংরেজ জনগণকে প্রদত্ত হল ইংলন্ডের ব্যবসাদারদের ইউনাইটেড কোম্পানি কর্তৃক দেয় যারা ইস্ট ইন্ডিজ-এ ব্যবসা করছিল তাদের সুবিধার্থে" ১৭৯৮ সাল থেকে ১৮০২ সালের মধ্যে মি. ম্যাকফারসন যা নির্ধারণ করেন তা হল ২৫,৩৪৩,২১৫ পাউন্ড।"[২] আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ৩,৮৫৮,৬৬৬ পাউন্ডের দায় বহন করে ভারত যে কেবল ইংলন্ডকে সাহায্য করেছে তাই নয়। আমেরিকায় এর শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা দান করেছে। মি. ইয়েল তাঁর নিজের নামে যে ইয়েল কলেজ স্থাপন করেন ভারতীয় ব্যবসা থেকে টাকা তুলে তাকে দেওয়া হয়।

ভারত থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সব সহায়তা ইংলন্ড পেয়েছিল, সেন্ট জর্জ টাককার যেমন লিখেছেন, তা নিম্নরূপ :

(১) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেছে তাদের অধিকৃত রাজ্যাংশ থেকে তার পরিমাণ বার্ষিক দেড় মিলিয়ন স্টার্লিং এবং টেরিটরিয়াল ঋণের সুদ দেওয়ার পরও ওই টাকা উদ্বৃত্ত থেকেছে এবং ওই টাকা ইংলন্ডের ভারত থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ দান।

(২) "প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ টেরিটোরিয়াল ঋণের টাকা যা ইউরোপের ব্রিটিশ প্রজারা ধরে রেখেছে তার একটা বড় বার্ষিক সুদ যার পরিমাণ দাঁড়ায় দুই মিলিয়ন স্টার্লিং ইংলন্ডের প্রতি ভারতের পরোক্ষ দান হিসাবে গণ্য হতে পারে।"

'পরোক্ষ প্রাইভেট দান যা সঞ্চয় ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে প্রাপ্ত যা টাককার নির্ধারিত তিন মিলিয়ন স্টার্লিং বার্ষিক বর্তমান সময় পর্যন্ত হিসাব (১৮২১ মাস)

(৩) "ভারতীয় জল জাহাজ যা মাল বহনের জন্য তৈরি, ইস্টার্ন সাগরে, তা ইংলন্ডের মালও কম বহন করে দেয়নি।

(৪) "ভারত বিজয়ের ফলে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের দাঁড়ানোর ও জীবিকার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে.....এর জন্য উপযুক্ত জীবিকা নির্ধারণ করা কষ্টকর ছিল। ভারতে তাদের চাকরি পাওয়ার স্থান হয়েছে।

ভারত ইংলন্ডকে তার উন্নতিতে যে সব সহায়তা প্রদান করেছে তার মধ্যে এইগুলিই সব নয় :

এ-সব পরোক্ষ দিকগুলি ছাড়াও, ভারতের ক্ষতি করার আরো অনেক প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ইংলন্ড প্রয়োগ করেছে। এগুলি সংরক্ষণের প্রথানুসারে কার্যকর করা হয়েছে। ভারতীয় দ্রব্যাদি ও ভারতীয় উৎপাদিত দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইংলন্ড সুবিধা করতে পারে না। এ-সব ব্যাপারে ভারতবর্ষ ছিল ইংলন্ডের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর দেশ। ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা, যা ইংলন্ডের দ্রব্যাদিকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে দিচ্ছিল, তা বিনষ্ট করার জন্য ইংলন্ড কয়েকটি সংরক্ষণমূলক নীতি গ্রহণ করেছে।

নিম্নের তালিকা থেকে আমদানি শুল্ক লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে কত উচ্চহারে ভারতীয় দ্রব্যাদির জন্য ইংলন্ডে মাশুল দিতে হত।

দ্রব্যের নাম **মাশুল : শতকরা হিসাবে**

দ্রব্যের নাম	মাশুল শতকরা হিসাবে	দ্রব্যের নাম	মাশুল শতকরা হিসাবে
অ্যালকোহল (Alocs)	২৮০	এলাচ (Cardemoms)	২৬৬
অ্যাসাফোফিডা (Assafoefida)	৬২২	নীরেস দারুচিনি (Cassiabuds)	১৪০
বেঞ্জামিন (Benjamin)	৩৭৩	লবঙ্গ (Cloves)	২৪০
সোহাগা (Borax)	১০২		
দারুচিনি তৈল (Oil of Cinnamon)	৪০০		
জৈত্রী (Mace)	৩০০০	কোকলাস ইন্ডিকাস (Coculus Indicus)	১৪০০
জায়ফল (Nutmegs)	২৫০	কফি (Coffee)	৩৭৩
অলিবানাম (Olibanum)	৪০০	কাবাব চিনি Cubebs)	৩২০

বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত রক্তবর্ণ আঠালো নির্যাস (Dragon's blood)	৪৬৫
রজন (Gamboge)	১৮৭
গঁদ (Gum Ammoniac)	৪৬৬
আটা বিশেষ (Myrph)	১৮৭
নাকস্ ভমিকা (Nux Vomica)	২৬৬
দারুচিনি তৈল (Oil of Cassia)	৩৪৩
গোলমরিচ/পিপুল (Pepper, Black)	৪০০
গোলমরিচ খোসা ছাড়ানো (White)	২৬৬
রেউচিনি জাতীয় লতা বিশেষ (Rhubarb)	৫০০
চাউল (Rice, Java)	১৫০
রাম (Rum, Bengal)	১,১৪২
সাগু (Sagu, pearl)	১০০
চিনি (Sugar, Bengal white)	১১৮
ডিটো (Ditoo, Hudding white)	১১৮
ডিটো (Low and brown)	১৫২

কিন্তু ইংলন্ড এরূপ উচ্চহার মাশুল ধার্য করেও থামেনি। সে দেশ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক ভারতীয় দ্রব্যের ওপর বিভেদমূলক আমদানি শুল্ক ধার্য করেছে। পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের চেয়ে ভারতীয় দ্রব্যের উপর সে বেশি শুল্ক ধার্য করেছে। এম, অ্যাকলোচ-এর বণিক অভিধান (কমার্শিয়াল ডিকশনারি)-এ উল্লিখিত তালিকা থেকে সে তথ্য জানা যাবে। ইস্ট ইন্ডিজ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের ওপর ধার্য শুল্কের তুলনা করলে তা স্পষ্ট হবে।

দ্রব্যাদির নাম	ইস্ট ইন্ডিজ			ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অন্যান্য		
	পা.	সি.	পে.	পা.	সি.	পে.
চিনি (কুইন্টাল প্রতি)	১	১২	০	১	৪	০
কফি (পাউন্ড প্রতি)	০	০	৯	০	০	৬
স্পিরিট মিষ্ট স্বাদ (গ্যালন প্রতি)	১	১০	০	১	০	০
স্পিরিট মিষ্ট নয় (গ্যালন প্রতি)	০	১৫	০	০	৮	৬
তেঁতুল (পাউন্ড প্রতি)	০	০	৬	০	০	২
তামাক (পাউন্ড প্রতি)	০	৩	০	০	২	৯
সুকাড্‌স (পাউন্ড প্রতি)	০	০	৬	০	০	৩
শাল কাঠ (৮ ইঞ্চি স্কোয়ার প্রতি লোড)	১	১০	০	০	১০	০
কাঠ (পরিমাণ গণনা করে নয়)		২০%		৫%		

ভারতীয় পণ্যের ওপর ধার্য মাশুল বিভেদমূলকই নয়। তার ব্যবহার বিধির উপর ধার্যযোগ্য। এটা প্রকাশ পায় ১৮১৩ সালে হাউস অব কমন্স্-এ গঠিত কমিটির মি. জন র‍্যাঙ্কিং-এর নিকট যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, তার থেকে

প্রশ্ন : ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস থেকে যে মালপত্র কেনা হয় তার ওপর ধার্য অ্যাড ভ্যালোরেম ডিউটি বলতে কি বুঝায় বলতে পারেন?

উত্তর : "মালপত্রের শ্রেণী বিচারে তাদের ওপর যে আমদানি শুল্ক ধার্য হয় তাকে বলে ক্যালিকো, তা হল শতকরা হিসাবে ৩ পাউন্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স। সে মালপত্র যদি গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত হয়, তা হবে অতিরিক্ত শতকরা ৬৮ পাউন্ড ৬ শি. ৮ পেন্স।

"এ-ছাড়াও অন্য প্রকার শ্রেণী আছে, তাকে বলে মসলিন, যার ওপর আমদানির শুল্ক ১০%। গৃহকাজে ব্যবহৃত হলে শতকরা ২৭ পাউন্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স।

"তৃতীয়ত আর এক শ্রেণী আছে, রঙিন দ্রব্যাদি যার ব্যবহার দেশে (ইংলন্ডে) হয় না, তার ওপর মাশুল নির্ধারিত হয় শতকরা হিসাবে ৩ পাউন্ড ৬ শি. ৮ পেন্স। তাদের ব্যবহার হয় কেবলমাত্র রপ্তানির জন্য।

সংসদে এই অধিবেশনে নতুন ২০% ডিউটি ধার্য হয়েছে অপরিবর্তিত আকারে। এটা ক্যালিকোর ট্যাক্স, নির্ধারণ করবে গৃহে ব্যবহারের জন্য শতকরা হার ৭৮ পাউন্ড ৬ শি. ৮ পেন্স, মসলিনের উপর গৃহে ব্যবহারের জন্য হবে শতকরা হার ৩১ পাউন্ড ৬ শি. ৮ পেন্স।"

সংসদের পক্ষেও এ হল অন্যায় দাবিপূর্বক আদায়, গভর্নর বা গভর্নর-জেনারেল-এর পক্ষেও তাই, কোনও অংশে কম নয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের বক্তব্য। ইউরোপীয়দের নৈতিক চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন তারা ভারতীয়দের সান্নিধ্যে আসে ; বলা যায় :

"ইউরোপ, তখন সবে মধ্যযুগীয় ভাবধারা কাটিয়ে উঠেছে, এশিয়ার নিয়ম-কানুনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে। মধ্যযুগীয় বিজয়ের ধারণা পূর্বদেশীয় শোষণের মধ্য দিয়ে তার ওপর আরোপিত হচ্ছে। মধ্যযুগীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা ভারতীয় ব্যবসার মধ্যে অবিরাম স্থায়িত্ব পেয়ে যাচ্ছে। পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, এশিয়ায় তাদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করছে যখন এই ধারণা ও পদ্ধতি আন্দোলিত হচ্ছে। ভারতে ইংরেজ উত্থান ষোড়শ শতকের ইউরোপীয় আদর্শবাদের পরিবর্তে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অর্ধ-মধ্যযুগীয় খ্রিস্টিয় মতবাদের পরিবর্তে এটা ছিল আধুনিক যুগের সম্পদ। তবুও ব্যক্তিগত লাভের মাপ কাঠিতে বিচার করে বলা যায়, ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"[১] "ব্যক্তি স্বার্থ অবশ্য দুর্নীতি ও মুষ্টিমেয়ের শাসনভিত্তিক আইনসভার দিকে আন্দোলিত করে, এবং রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায় শ্রেফ নীতিহীন....মানুষ বস্তুজগতের সুখের জন্য লড়াই করে। স্বর্ণ বলবানের শাসনের জন্য লালায়িত হয় এবং ভারতেও সে সময় এরূপ সাংঘাতিক শক্তির উদাহরণ অনেক ছিল।"[২]

১৭৫৭ সালের পালাশির যুদ্ধ এবং ১৭৬১ সালের ওয়ানদেওয়াস যুদ্ধ যথাক্রমে বাংলা এবং মাদ্রাসে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তারা এই দুই বিজয়কে খুব মূল্য দিয়েছে। পলাশির বিজয়ী ক্লাইভ হয়ে উঠলেন রাজা বানানোর কারিগর। তিনি নবাবের নিকট তাঁর সমর্থন অত্যর্পণ করেছিলেন, যিনি উন্নত শর্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি নবাবের নিকট থেকে কেমন যে উপঢৌকন পেয়েছেন তা নয়।

১. ডব্লু. ডব্লু. হান্টার ; 'এ হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া', খন্ড-১; পৃ: ৬
২. জি. বি. হার্টজ, 'দিওল্ড কলোনিয়াল সিস্টেম'; পৃ: ৪

পেয়েছিলেন জায়গির (এস্টেট) এবং লবণ তৈরির একচেটে অধিকার। স্বরাষ্ট্র বিভাগের আপত্তি সত্ত্বেও, সিভিল সার্ভেস্টদের অধিকার দিয়েছিলেন 'বার্কের কথায়' birds of prey and passage'—কতকগুলি প্রাইভেট ট্রেড-এর ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিপত্য স্থাপনের জন্য যার মধ্যে এদেশীয় লোকদের কোনও প্রকার অনুপ্রবেশ থাকবে না এবং যার ফলে মানুষ নির্যাতিত ও দারিদ্র্য স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল। ক্লাইভের সম্পদ এবং জনগণের দারিদ্র্য ম্যাকলে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, যাঁর কথায়,

"ক্লাইভের কাছে সম্পদের কোনও অভাব ছিল না, কিন্তু নিজের পরিমিতির মধ্যে বাংলার সম্পদাগার তাঁর কাছে উন্মুক্ত ছিল। স্তূপীকৃত ভারতীয় রাজপুত্রদের ব্যবহারের মতো প্রচুর মুদ্রা, যার মধ্যে ক্লোরিন্স বা বাইজান্টস্ কে নির্ধারণ করা কদাপি সম্ভব কোনও ইউরোপীয় জাহাজ উত্তমাশা পৌঁছানোর পূর্বে ভিনিসিয়ানদের পণ্যদ্রব্য বা মশলাপতি ক্রয়ের পূর্বে তা সম্ভব নয়। ক্লাইভ স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে, মণিমুক্তা হীরকখণ্ডের মধ্যে হাঁটেন এবং প্রচুর স্বাধীনতা......... সীমাহীন সম্পদ এইভাবে কলকাতায় জমা হয়ে গেল। অপরপক্ষে ত্রিশ মিলিয়ন মানুষ ডুবে গেল সীমাহীন সহায় সম্বলহীনতায়...... এই অপশাসন ইংরেজরা পরিচালনা করেছিল যা সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে মানায় না। সেই রোমান প্রাচীন শাসকের মতো, যিনি দুই এক বছরের মধ্যে একটা প্রদেশের সব সম্পদ নিঃশেষ করে দিতে পারেন একটা মার্বেল প্যালেসের প্রয়োজনীয় সব উপাদান, অথবা একটা ক্যাম্পোমিয়ার উপকূলের একটা বাথের, অম্বরের সমস্ত ড্রিঙ্কস্, পাখির গান, সৈন্যবাহিনীর একটা দল, জিরাপের একটা বাহিনী ; অথবা স্পেনিশ ভাইসরয়া, যিনি তাঁর পেছনে মেক্সিকো বা লিমার অভিসম্পদ ফেলে মাদ্রিদে প্রবেশ করছেন একটা উজ্জ্বল কোচে চেপে অথবা একটা ভারবাহী ঘোড়া যার ঘাড়ে রূপার বোঝা...... কিন্তু এখন অসহায়।"

ক্লাইভ সাহেব বাংলার মানুষকে শেষ করেছেন। প্রথম বড়লাট হেস্টিংস রাজা বা ক্ষমতাবাজ রাজাদের দিকে ফিরে তাকালেন। কাশীর রাজা ও অযোধ্যার বেগমের নিকট থেকে আদায়ীকৃত অর্থ ও তাঁর দুর্ব্যবহার রোহিলাখণ্ডের হত্যাকাণ্ড ক্যাথলিক অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক দার্শনিক এডমণ্ড বার্কের সহানুভূতি সৃষ্টি করে থাকবে, যিনি হেস্টিংসকে ইম্পিচমেন্ট করেছিলেন, যা সিসেরোয় স্মরণীয় ইম্পিচমেন্টকে স্মরণ করিয়েছেন। বার্ক নির্যাতিতদের প্রতি এরূপ আচরণের কারণ উদ্ঘাটন করেন এবং সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেন যাতে তাদের অপরাধ দূর হয় ও তাদের প্রতি অত্যাচারকারীর শাস্তি হয়। তাঁর সাহস থাকা সত্ত্বেও এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও এই ইম্পিচমেন্টে শেরিডন ব্যর্থ হন, কিন্তু তার সম্মানীয় ফল ব্যর্থ হয় না। এই একটা

ব্যর্থতা শত ব্যর্থতার সমান। লর্ড মরলো তাঁর বার্কের জীবনীতে বলেন "হেস্টিংস্ যে ছাড় পেয়ে গিয়েছিলেন তা বড় ছিল না। তাঁর ইম্পিচমেন্ট-এর শিক্ষা যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা হল এই যে, এশিয়াবাসীর অধিকার আছে যেমন, তেমনি ইউরোপীয়দের দায় আছে। একটি উন্নত জাতি অতি অবশ্য তার প্রজা জাতির ওপর চলতি উন্নত নৈতিক আচরণ প্রদর্শন করতে বাধ্য। বার্ক হলেন তাঁর দেশবাসী ও বিনীত প্রজাসাধারণের মধ্যে সংহতি স্থাপনের সম্মানীয় দয়ালু মহৎ দূত।

ফল হল এই যে, প্রত্যক্ষ শাসনতান্ত্রিক শোষণ অঙ্কুরে বিনাশপ্রাপ্ত হল। কিন্তু অন্য পরোক্ষ শোষণ-ব্যবস্থা চেপে বসল। এই পরোক্ষ শোষণ হল, অভ্যন্তরীণ পরিবহন শুল্ক। কোম্পানির কর্মচারীরা বেসরকারি ব্যবসাদার হিসাবে দেশীয়দের ওপর কর ধার্য করার এক্তিয়ার পেয়েছিল। এরূপ কর ধার্য করার জন্য তাদের অর্থনৈতিক সমুন্নতি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হল :

মি. হোল্ট ম্যাকেঞ্জি এরূপ শুল্ক সম্পর্কে বলেন :

> 'কোনও কোনও দ্রব্যের দশ রকমের কাস্টম হাউসের মধ্য দিয়ে শাস্তি ভোগ করতে করতে অগ্রসর হতে হত। প্রতিবারই অধীনস্থ চৌকি পার হতে হত। তারপর তারা প্রেসিডেন্সিতে পৌঁছত। কম বা কোনও প্রধান দ্রব্যই এরূপ বার বার ধাক্কা না খেয়ে পার হওয়ার অনুমতি পেত না।
>
> এমন কি কোনও দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোনও প্রকার অন্যায় দাবি নেই বা কোনও প্রকার বিলম্বের কারণ ঘটেনি, তবুও প্রথাই এমন যে, বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রচুর বাধা দেখা যেত। আন্তঃজেলা মাল চলাচল সহজসাধ্য ছিল না। যদি না উভয় জেলার দরদামের পার্থক্য মূল্য অন্যান্য বাণিজ্যিক শুল্ক মিলিয়ে সরকারি ধার্য লেভি ৫ বা ৭$\frac{১}{২}$% না মেটানো হত। এই স্বাভাবিক মূল্যের পার্থক্যকরণ হত, ভোগ্যপণ্যের শুল্ক নির্ধারণ হত এবং অতিরিক্ত করের বোঝা ভোগকারীকে মিটিয়ে দিতে হত।
>
> কিন্তু যখন সরকারি চাহিদা শুল্ক আধিকারিকদের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হয় অনেক দ্রব্য অল্প মূলধনের লোকেরা বহন করে অবশ্যই আটক করা হয়। ধনী ব্যবসায়ীগণ তাদের ওপর চাপানো লেভি পরিশোধ করতে পারে সহজেই কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের-ই লেভি প্রদান করার অসুবিধা। এতে তাদের লভ্যাংশই শেষ হয়ে যায়।

এতে ইংলন্ডের ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন খুঁজে পেতে চাইছে এটাই স্বাভাবিক। তারা রপ্তানির চেয়ে আমদানির দিকেই নজর দেয় বেশি করে। রেগুলেশন এগারোতে নির্ধারিত দ্রব্যাদির তালিকা দীর্ঘ কিন্তু রপ্তানির তালিকায় সামান্য ক'টি দ্রব্য আছে। যেমন নীল, তুলো, পশম ইত্যাদি।"

এটা জেনে রাখা ভাল যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিষয়ে লর্ড এলেনবরো নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছেন :

"সুতোর দ্রব্য কারক ইংলন্ডের উৎপাদকেরা মাত্র ২½% ট্যাক্স ডিউটি দিয়ে বস্ত্র আমদানি করে কিন্তু ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদকেরা সেখানে ৭½% ট্যাক্স দিয়ে থাকে, অতিরিক্ত ২½% এবং শেষে আর একবার ২½% এবং সর্বমোট ১৭½% পর্যন্ত ট্যাক্স দিতে বাধ্য হয়।

কাঁচা পশুচর্ম-র জন্য দিতে হয় ৫%, যখন তা চামড়ায় রূপান্তরিত তখন ৫% অতিরিক্ত দিতে হয়। জুতা তৈরি হলে আরও ৫% লাগে। মোট ডিউটি ১৫% ভারতের মধ্যেই এই ট্যাক্স দিতে হয়।

চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, শহরে চিনি ৫% কাস্টম, ৫% শহরের ডিউটি, রপ্তানি করতে হলে একই শহর থেকে ৫% এবং সব মিলিয়ে ভারতীয় চিনি ভারতেই ব্যবহৃত হচ্ছে ১৫% কর দিয়ে।

কমবেশি ২৩৫টি দ্রব্যের উপর অভ্যন্তরীণ ডিউটি ট্যাক্স দিতে হয়। ব্যক্তিগত ও গৃহে ব্যবহারের জন্য প্রায় প্রতিটি দ্রব্যের উপর ট্যাক্স লাগে। জিনিসপত্রগুলি যদি অনুসন্ধানের আওতাভুক্ত হয় তা হলে অশেষ বিরক্তি ও আপত্তির কারণ হয়। এটা অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় কারেন্সি প্রথার অসমতা।

এ-সবই ভারতীয় শিল্পকে হত্যা করার নামান্তর।

ফ্রেডারিক লিস্ট বলেন, "তারা যদি ভারতীয় সুতো রেশম বস্ত্র ইংলন্ডের বাজারে মুক্ত আমদানির সুযোগ দিতেন, তা হলে ইংরেজ সুতি রেশম প্রস্তুতকারকরা একটা সিদ্ধান্তে আসত। ভারতের সস্তা শ্রমিক ও কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা আছে তাই নয়, শতাব্দীর অভিজ্ঞতাও আছে, দক্ষতা এবং অভ্যাসও আছে।"

ভারতীয় ঐতিহাসিক এইচ এইচ উইলসনের অভিমত আরও জোরালো। এটা একটা দুঃখের ঘটনা, তিনি মেনে নেন। তিনি স্বীকার করেন :

ভারতের ওপর কম ভুল করা হয়নি, অথচ সে ভারতের উপর নির্ভরশীল। ১৮১৩ সালে বলা হয়েছে, ইংলন্ডে তৈরি দ্রব্যের তুলনায় ভারতের সুতো ও রেশম ৫০ ও ৬০ শতাংশ কম দামে বিক্রয় হবে। ফলে ইংরেজের দ্রব্যাদির ওপর ৭০ এবং ৮০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। অথচ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। এটা যদি না হত, যদি নিষেধাজ্ঞা না বর্তাত, তাহলে পয়েমলি ও ম্যাঞ্চেস্টরের মিল শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেত এবং স্টিম পাওয়ার চালু হওয়ার পরেও তা চালু করা সম্ভব হত না। ভারতীয় উৎপাদকদের ত্যাগের দ্বারা ওগুলি সৃষ্টি হয়। ভারত যদি স্বাধীন দেশ হত, সে প্রতিশোধ নিতে পারত, ব্রিটিশ দ্রব্যের উপর যে নিষেধাজ্ঞামূলক শুল্ক আরোপ করতে পারত, এবং নিজের উৎপাদনাত্মক শিল্পকে হত্যার চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে পারত। এরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের তার কোনও সুযোগ ছিল না। আগন্তুকদের দয়ার উপর তাকে নির্ভর করতে হত। শুল্ক ছাড়া ব্রিটিশ দ্রব্যাদি তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হত। এবং বিদেশি উৎপাদক রাজনৈতিক অবিচার করার জন্য বিদেশি হাত নিয়োগ করত যার সঙ্গে তার সমতার সম্পর্ক থাকত না। ফলস্বরূপ মি. চ্যাপলিনের কথায় বলা যায়। 'অনেক উৎপাদককে বাধ্য হয়ে কৃষি অবসরণ করতে হত, যা এমন একটি বিভাগ যে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত।"

এইভাবে দেখা যায় ল্যান্ড রাজস্ব নীতি কৃষিকে ধ্বংস করেছে এবং ইংলন্ডের প্রহিবিটরি প্রোটেকশনিস্ট নীতি দেশের শিল্পকে শেষ করেছে ; যে দেশের সম্পদ মৌমাছির ঝাঁককে আমন্ত্রণ করে এসেছিল এবং মধুর রস দিয়ে তাকে অনবরতই ভিজিয়ে রেখেছে।

ফলস্বরূপ দরিদ্র্যের দুঃখ ও দারিদ্র্যের কোনও সীমা পরিসীমা নেই এবং যা অনেক পর্যটক ও লাটসাহেব বিপদময় হৃদয়ে বর্ণনা করেছেন। বিশপ হেবার ১৯৩০ সালে ভারত ভ্রমণ করেছেন। তিনি লেখেন, না দেশীয় নয় ইউরোপীয় কেউ বর্তমান কর ব্যবস্থায় সতেজ হয়ে উঠতে পারবে বলে আমি মনে করতে পারি না। জমির মোট উৎপাদনের অর্ধেকটাই সরকার দাবি করে। এবং এ-হারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেকার, বলতে বিশ্রীভাবে অতিরঞ্জন, বর্তমানের পক্ষেও অনেক। এমন কি যখন ভারতীয়দের মিতব্যয়ী স্বভাব রয়েছে এবং যখন অকৃত্রিমভাবে ও সস্তা-পদ্ধতিতে চাষ-আবাস করে। যদিও এটাকেও বেশি বলতে হবে, কেন না জমি থেকে এমন কিছু আয় উন্নতি ঘটে না। যে জমি যেবার ভালো ফসল দেয়, সে বারেও অতীব দুর্দশাগ্রস্ত অভাবে রেখে দেয় মানুষকে। এবং যখন শস্য উৎপাদন সমান্যতমও কম হয়, সরকারকে এগিয়ে এসে কর-মকুব করতে হয় যা মোটের

ওপর মানুষকে স্ত্রীলোক শিশু-সহ রক্ষা করার মতো উপকরণ নয়। তাদেরকে রাস্তায় পড়ে মরতে হয়। বাংলা মুলুকে জমির উর্বরাশক্তির কারণেই দুর্ভিক্ষ ছিল অজানা। হিন্দুস্থানে (উত্তর ভারত), অপর পক্ষে, আধিকারিকদের মধ্যে একটা অনুভূতি লক্ষ্য করেছি। আমি নিজেও অবস্থার বিপাকে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, প্রদেশের কৃষক সাধারণ মোটের ওপর দুর্দশাগ্রস্ত, গরিবের চেয়েও গরিব, অধিকতর নিস্তেজ, দেশীয় রাজকুমারদের তুলনায়, এবং মাদ্রাজে সেখানে পার্থক্য আরও নগ্ন। আসলে কোনও দেশীয় রাজকুমাররা খাজনা চায় না, যেমন আমরা চাই এবং উন্নত লোকদের জন্য সর্বদা উন্নত ব্যবস্থা সৃষ্টি করে চলি। আমি কিছু লোকজনের সঙ্গে মিশেছি যারা এখানে বিশ্বাস করে না মানুষের জন্য ধার্য কর বেশি এবং বিশ্বাস করে না দেশ ক্রমশ শক্তি হারিয়ে ফেলছে। সমাহর্তাগণ অবশ্য এখনও সরকারিভাবে দোষ স্বীকার করতে চান না। বাস্তবিক সমাহর্তাগণ এখানে ওখানে, মানুষের নিকট কর কমানোর কথাই বলেন। কিন্তু উৎসাহে তিনি তা বাড়িয়েই দিয়েছেন।

কিন্তু সাধারণভাবে সব অনুজ্জ্বল ছবিই তাদের ওপর পড়েছে এবং তাঁরা মাদ্রাজ বা কলকাতার সচিবদের কাছ থেকে অনুসন্ধান করেছে, কার্যত তা এড়িয়ে গেছে। ব্যবসা শিল্প বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “ সুরাটের ব্যবসা কাচা ও তুলা সমেত যা বোটে করে বোম্বাই আসে, এখন গুরুত্ব হারিয়েছে। দেশের সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বাজার অপেক্ষা কম দামে ইংরেজরা বিক্রয় করে। ফলত একটা হতাশা বিরাজ করে দেশীয় ব্যবসাদারদের মনে। মন্দাদশা ঢাকতেও বিরাজ করে। এ সম্পর্কে উক্ত কর্তৃপক্ষ বলেন, “তার ব্যবসা যা ছিল তার ষাট ভাগ কমে গেছে। আর সেইসব সুন্দর-সুন্দর বাড়িগুলি—কারখানা ও চার্চ, ফরাসি, ওলন্দাজ বা পোর্তুগিজরা তৈরি করেছিল বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।”

তার অবস্থার উন্নতি বিধান করতে দেশীয় লোকেরা পার্লামেন্টকে জানাল, “ইংলন্ড থেকে বিদেশী দ্রব্যাদি ভারতে আমদানির সঙ্গে ইংরেজদের শিল্প উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং হাজার-হাজার ভারতীয় কিছুদিন আগেও তুলা উৎপাদন ও তুলাজাত দ্রব্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত এখন আমেরিকা ও ইংলন্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি আসার ফলে তারা অনাহারে রয়েছে।” কিন্তু তাদের আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেল এবং যারা ভারতবর্ষের হতভাগ্যদের শাসন করতে এদেশে এসেছিল তাদের কাছে ইংলন্ডের স্বার্থ সর্বদাই অগ্রাধিকার পেল।

যদিও বিশপ হেবার সঙ্গত কারণেই বলেছেন, কোম্পানির আধিকারিকরা বিপদময় চেহারা ও জনগণের দুঃখ দুর্দশা কাটিয়ে উঠেছেন, যারা স্বাধীনচেতা এ-বিষয়ে বেশ জোরের সঙ্গে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন।

১৭৬৬ সালের ৭ মে কোর্ট অব ডিরেকটরস্ লিখছেন,

"আমাদের শোচনীয় খারাপ বোধ হচ্ছে.....আমাদের কর্মচারিদের দুর্নীতি ও লোভ দেখে এবং বন্দোবস্তের মধ্যে আচরণের চিরন্তন বঞ্চনা দেখে আমি মনে করি বিশাল সৌভাগ্য যে স্বেচ্ছাচার দেখে এবং নির্যাতিত ব্যবহার থেকে লাভ করা গেছে তা কোনও কালে কোনও দেশে দেখা যায়নি।"

ক্লাইভ, যদিও নিজে ছিলেন একজন অপরাধী, এই নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৭৬৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জর্জ ডুডলিকে তিনি লিখছেন :

"যা বিস্মৃতির অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে সেই অতীত সম্পর্কে অনুচিন্তা করলে আবিষ্কার করা যাবে কিন্তু আলো মিলবে না, জাতির সামনে ঘৃণ্য ব্যাপার এবং ভাল পরিবারের সুনাম সুখ্যাতি তাতে নষ্ট হয়।"

স্যার টমাস মুনরো কোম্পানির অপশাসন সম্পর্কে এতদূর অমর্যাদাকর মনোভাব পোষণ করতেন যে, তিনি বলেন, "এটা বাঞ্ছনীয় যে, আমাদের এদেশ থেকে পুরোপুরি বহিষ্কার করা উচিত। সমস্ত জাতির মর্যাদা হানিকর অবস্থা সৃষ্টি করা থেকে সেটা বরং ভালো।"

১৮৩৮ সালে 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'তে মি. মার্টিন বলছেন, "গত ৩০ বছরে বার্ষিক ৩,০০০,০০০ পাউন্ড বার্ষিক ড্রেন-এ চলে যাচ্ছে ব্রিটিশ ভারতের ১২% (ভারতীয় হার) চক্রবৃদ্ধি হার ধরলে মোট দাঁড়ায় ৭২৩,৯০০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং..... এই খরচ অনবরতই হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে, ইংলন্ডের পক্ষেও, শীঘ্রই তাকে শক্তিহীন করে তুলবে। তা হলে ভারতের পক্ষে কী সাংঘাতিক ক্ষতিকর সেখানে একজন শ্রমিকের দৈনিক বেতন ২ পেন্স থেকে ৩ পেন্স! ভারতের একশত মিলিয়ন ব্রিটিশ প্রজা যদি ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়, তা হলে ব্রিটিশ রাজধানীর জন্য কী মূলধন, দক্ষতা বা শিল্প মিলবে। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস-এর মি. ফ্রেডরিক জন শোর অতি দুঃখের সঙ্গে বলেন,

"কিন্তু ভারতের সুখ-শান্তির সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তার যা সম্পদ ছিল তার বিরাট অংশ সে ড্রেনে ফেলেছে। অপশাসনের পাল্লায় পড়ে সে তার শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে। মুষ্টিমেয়ের জন্য অধিকাংশের শক্তি বলিপ্রদত্ত হয়েছে। ইংরেজ

সরকারের শাসনের পদ্ধতির যাঁতাকলে পড়ে দেশ ও জনগণের শান্তি ফুরিয়ে গেছে ক্রমশ...... জনগণের দারিদ্র্য পৌঁছেছে সীমাহীনতায়...... ইংরেজদের মৌল নীতি ছিল সমগ্র ভারতীয় জাতিকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হতাশাসুলভ মনোবৃত্তি সম্পন্ন করা। জাতির প্রকৃত উন্নতিই যদি লক্ষ্য হত, ভিন্নধর্মী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেত এবং তা হলে ভিন্ন রকমের ফল লাভ করা যেত।"

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। না, অন্যরকম কিছু করলেই অস্বাভাবিক হত। মিল বলছেন, "একটা জাতির সরকার হবে তাদের-ই নিজস্ব এবং সে সরকারের বাস্তবতা ও অর্থ আছে। কিন্তু একটা জাতির সরকার অন্য জাতির লোক দ্বারা গঠিত হলে তা টিকতে পারে না। একটা জাতি অন্যকে রাখতে পারে তার নিজের ব্যবহারের জন্য, একটা স্থান রাখে টাকা পয়সা তৈরির জন্য, ক্যাটল ফার্মও লোকের প্রয়োজনে আসে, তার নিজস্ব লোকজনের প্রয়োজন।"

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে রোমান প্রাদেশিক প্রশাসনের অবিকল নকল ছিল বলা যায় যতই স্থানীয় স্বাধীনতা ভোগ করুক না কেন। মনিসেন বলেন, "রোমান প্রাদেশিক গঠনতন্ত্র বস্তুত, কেবল সামরিক শক্তি রোমান শাসকের হাতে রেখেছেন, পক্ষান্তরে প্রশাসন ও এলাকাভুক্ত সমাজের হাতে ছিল, অথবা তার হাতে থাকার বাসনা ছিল।"

কিন্তু ব্রিটিশ সব কিছু গোপন করার পক্ষপাতী এবং ফেররো আমাদের একটা ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বলেছেন, "একটা বহুল প্রচারিত ভুল ধারণা রয়েছে যে, যা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, রোম তার প্রদেশকে শাসন করে খোলা মন নিয়ে, সাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে সরকারি সুবিবেচনার কথা ভেবে" সুতরাং যে কোনও আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে না চলি এ বিষয়ে যত্নবান থাকতে হবে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন যেহেতু একালের প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিকরা ভাবতেই পারেন যে, ১৭০০ বছরের নৈতিক মান ত অনেকাংশে উন্নত উক্ত প্রতিষ্ঠানকে তার প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।

ইস্ট ইন্ডিয়ার সামনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা যত ছোট এই আলোচনা হোক না কেন, একথা আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে যে, যারা মোঘল ও মারাঠাদের উৎসাহ করে নিজে অধিকার কায়েম করতে আগ্রহী ছিল তারা কোনওভাবেই অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না। তাছাড়া দেশীয়দের শাসনের অধীনে যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করত আধুনিক উন্নত সংস্কৃতির অধীনে তার চেয়ে উন্নত কিছু হয়নি।

শিল্পের সঙ্গেই ধ্বংস এসেছে, কৃষি বেশি মাত্রায় গুদাম জাত করা হয়ে গেছে। এবং বেশি মাত্রায় শুল্ক ধার্য হয়েছে, উৎপাদনের তুলনায়। উৎপাদন অতি নিম্ন মানের যে কর্ প্রদান করা যাচ্ছে না। দেশীয় সামর্থ্য নিয়েই ভারতীয় জনগণ কোম্পানির শাসন অতিক্রম করে রাজকীয় শাসনের দিকে এগিয়ে চলল।

□ □ □

অংশ ২

অস্পৃশ্য ও ব্রিটেনের যুদ্ধবিরতির আদেশ

ইংরেজ সরকার কর্তৃক দলিতদের প্রতি অবহেলার নিদর্শন হিসাবে এই ১২৩ পৃষ্ঠার পান্ডুলিপিটি রচিত যা দলিতদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আম্বেদকরের একটি স্মারকপত্র। মারাঠি জীবনীকার শ্রী সি. বি. খেরমোদের অভিমত অনুগামী—গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লন্ডনে অবস্থানের সময় ড: আম্বেদকর এই রচনা করেছিলেন। পান্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায় নি।

—সম্পাদক

অধ্যায় ৪

I

*আমেরিকা মহাদেশ থেকে ভারত নামে দেশটার দিকে সমুদ্রপথে পাড়ি জমানোর ইচ্ছেটি কলম্বাসের হঠাৎ ঝুঁকি নেবার বাসনা নয়, তাঁর এই দুঃসাহসের পেছনের শক্তি ছিল পতুর্গালের রাজা হেনরি, যাঁর রাজত্বকালের বিস্তৃতি ছিল ৪২ বছর (১৪১৮-১৪৬০)। তাঁর উদ্যোগে কলম্বাস তৎপর হয়েছিলেন ভারতযাত্রায় জলপথ উদ্‌ঘাটনের।

ইউরোপ থেকে ভারত-সরাসরি সমুদ্রপথের অন্বেষণের এমন কি প্রয়োজন পড়ল যাতে পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজদের তাদের বৃত্ত থেকে টেনে বার করে আনল। এটি মনে করার কোনও কারণ নেই যে, ভারত খোঁজের সমুদ্রপথের ঝুঁকি একমাত্র ইংরেজরা নিয়েছিল। চেষ্টা ছিল, পরিকল্পনা ছিল প্রত্যেকটি ইউরোপীয় জাতেরই। পোর্তুগিজ প্রথম এসেছিল কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্য সবাই অলস বসেছিল। ইংরেজরা আর ওলন্দাজরা আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় এমন পথের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলই।

শতাব্দী জুড়ে স্প্যানিয়ার্ড, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পোর্তুগিজ, ফরাসীদের মধ্যে ভারতে পৌঁছনোর জন্য উদ্যমের এই তীব্র প্রতিযোগিতার উৎস সন্ধানে গিয়ে আমরা যে কারণের মুখোমুখি হই সেই কারণটি হল ব্যগ্রতা। বিলাস এবং মসলা, ভারতের বহু প্রাচুর্যের মধ্যে এই দুটি তাদের মনে ধরেছিল। আর দুটি প্রাপ্তির জন্যই তারা ব্যগ্র হয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল।

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এ ঘটনা সত্যি যে শুকনো লঙ্কা, লবঙ্গ, ইত্যাদির লোভেই ইউরোপের এদেশে ধেয়ে আসা, অন্তত তথ্য সে কথাই বলে। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে মসলাপ্রেমের তথ্য অধ্যাপক চেইনির থেকে জানা যায় :

> "মধ্যযুগে খাবার মসলা অন্যতম মুখ্য বিলাস ছিল। সুরাপানের অনুষঙ্গে মসলার ব্যবহার ছিল অবধারিত। স্যার থোপার (বর্ণনাতে মসলা ব্যবহারের

---

*পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। প্রবন্ধটির শিরোনামও পাওয়া যায়নি। পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটিতে পাওয়া পাণ্ডুলিপি থেকে বর্তমান শিরোনাম রাখা হয়েছে।—সম্পাদক

উল্লেখ পাই—ফ্রয়সার্টে রাজ-অতিথিবর্গকে পরিবেশন করা হল মদ এবং মসলা—১২২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্সেইয়ে একটি বিবাহের বর্ণনায় পণের যে কথা লেখা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে পণ হিসেবে মসলা দেওয়ার চল ছিল। দেওয়া হয়েছিল জৈত্রী, এলাচ, আদা ইত্যাদি মসলা।

"জন বল একবার গরিব বড়লোকের ফারাক টানতে গিয়ে বলেছিলেন বড়লোকের আছে উত্তম রুটি, মদ এবং অবশ্যই মসলা আর গরিবের ভাঁড়ারে শুধু যব, গম বা ঐ জাতীয় তুচ্ছ জিনিস।" যখন বয়োবৃদ্ধ লাটিনারকে খুঁটিতে রজ্জুবন্ধনে বাঁধা হল তখন তিনি তাঁর বন্ধুদের স্মারক হিসাবে যে জিনিসটি দিয়েছিলেন সেটি হল জায়ফল।

"মসলার মধ্যে সবচেয়ে দামী ছিল, লঙ্কা আর গোলমরিচ। এমনকি অর্থের বদলে এই দিয়েও দেনাপাওনা মেটানোর চল ছিল। মসলার এত গুরুত্ব যখন তখন তার চাহিদা মেটানোর যোগানের যে ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে মিশরের সুলতান ৪২০,০০০ পাউন্ড লঙ্কা, গোলমরিচের যোগন দিয়েছিলেন। ভারতের অবদান ছিল ২০০,০০০ পাউন্ড। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে এক ভারতীয় রাজকুমারের ওপর পোর্তুগিজেরা জরিমানা আরোপ করে। জরিমানার মূল্য ছিল ২০০,০০০ পাউন্ড শুকনো লঙ্কা আর গোলমরিচ। মসলা আর মসলা। খোঁজ মেলে প্রেমে, সাধারণ ঘটনায় বাণিজ্যে সীমা শুল্কে এবং অবশ্যই রান্নার বইয়ে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তৎকালীন ইউরোপে মসলার এত প্রয়োজন কেন ছিল,—একটি উত্তর তো স্বাদ—জিভের স্বাদ। "মধ্যযুগীয় ইউরোপে খাবার ছিল একঘেয়ে খাদ্যে ভরা গুণে, ছিল না উৎকৃষ্ট রন্ধনে মুন্সীয়ানা নেই বললেই হয়। এসব ঘাটতি চাপা দিতেই দরকার ছিল প্রাচ্যের আবরণ—মসলার[1] তবে জিভের স্বাদ ছাড়াও মসলার আরও একটা প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন ছিল দারিদ্র্য উদ্ভুত। তৎকালীন ইউরোপে যন্ত্র তখনও তেমনভাবে এসে পড়েনি। কাজেই মানুষের চাহিদার আনুপাতিক উৎপাদন ছিল খুব কম। এই অবস্থায় উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা অপব্যয়ের সামিল ছিল। গরিব মানুষেরা অতএব বেঁচে যাওয়া খাবারদাবার পরে খাবার জন্য সংরক্ষিত করে রাখত। আর সংরক্ষণের জন্য খাবারে মসলা মেলাতে হত। কারণ সংরক্ষণের জন্য মসলা হচ্ছে সেরা ওষুধ।

আরেকটি প্রশ্নও এসে পড়ে প্রশ্নটি হল এই সমস্ত ইউরোপিয়ান দেশগুলি ভারতে পৌছানোর জন্য এরকম সরাসরি সমুদ্রপথের সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা ইউরোপিয়ান

১. অধ্যাপক চেইনি; 'ইউরোপীয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড অব্ আমেরিকান-হিস্ট্রি' ; পৃ: ১০

দেশগুলির কেপ অব্ গুড হোপ হয়ে সমুদ্রপথের সন্ধান পাবার আগেই স্থলপথ ছিল, একটি নয় তিনটি যার মধ্যে দিয়ে বিলাসসামগ্রী আর মসলা ইউরোপে পৌছত। এই স্থলপথও তিনভাগে ভাগ ছিল—উত্তর (Notharn) মধ্য এবং দক্ষিণ।

উত্তরে পথটির বিস্তার ছিল দূর প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত এই দুটি বাণিজ্যের মাঝখানে চীনের প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে গোবি মরুভূমিকে বুকে নিয়ে। এই পথেই পড়ত একগাদা প্রাচীন শহর—খোতান, ইয়ারকন্দ, কাশগর, সামারো এবং বোখারা, শেষমেশ কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে পৌছতে। এই পথে মিলন ঘটত হিমালয় এবং হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীর থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন পথের। এই পথের যাত্রা ছিল আশি থেকে একশ দিন ধরে মরু, পর্বত আর বৃক্ষহীন প্রান্তর বা স্তেপ পেরিয়ে। চীনের আরও উত্তরে একটি সমান্তরাল পথ বল্কাশ হ্রদের পাশ দিয়ে গিয়েছিল কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। গাড়ি চলাচলের পথ এখান দিয়ে দুভাগে গিয়েছিল। প্রথমটি দক্ষিশ-পশ্চিমমুখী হয়ে এশিয়া মাইনর এবং সিরিয়ার মধ্যে দিয়ে পৌছেছিল ভুমধ্যসাগর এবং কৃষ্ণ সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে। অন্যটি কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর তীর ধরে এগিয়ে একে অতিক্রম করে আস্ত্রাখানে পৌছেছিল। সেখান থেকে ভোলগার পাশ দিয়ে সাগরের তীরে ডন নদীর উৎসমুখ তানা অথবা ক্রিমিয়ার কাফায় পৌছল।

মধ্যবর্তী পথে মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ার মধ্য দিয়ে পৌছনো যায় লেভান্টে। ভারত থেকে রওনা দেওয়া জাহাজগুলো এশিয়ার তট ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঢুকে পড়ে পারস্য উপসাগরে তারপর তাদের পেটভর্তি মালের বাজার খুঁজে নেয় ইউফ্রেটাসের নিম্ন তীরবর্তী অঞ্চলে বা চালডিয়া। বাজারের বিস্তার উপসাগরের এপ্রান্তে ওরমুজের থেকে ওপ্রান্তে বাসোরা অবধি। উপসাগরের তীরে পৌছনোর পর স্থলপথে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে টাইগ্রিসের পথ ধরে বাগদাদে। সেখান থেকে খুর্দিস্তান হয়ে পারস্যর উত্তরস্থ রাজধানী তব্রিজে। সেখান থেকে আরও পশ্চিমমুখী পৌছনো যেত কৃষ্ণ সাগরের আর ভূমধ্যসাগরের তীরে লায়াসে আর একটি পথের ঠিকানা ছিল মরুর মধ্য দিয়ে সিরিয়ার এ্যালেপ্পো, অ্যান্টিওক, দামাস্কাস। সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী লাওডিসিয়া ত্রিপোলি, বেইরুট বা জাফায়। কখনও কখনও বাজারের সন্ধান মিলত আলেকজান্দ্রিয়ায় দক্ষিণের পথটি জলপথ। লোহিত সাগর ধরে ভারত এবং দূর প্রাচ্য থেকে আসা জিনিস পৌছত মিশরে সেখান থেকে নীলনদ হয়ে পৌছত ইউরোপে।

স্থলপথ ছিল না সরল, ছিল বিপদসঙ্কুল। কষ্টকর এই পথে পরিবহন ব্যয়বহুল আর নিরাপত্তাহীন। ডাকাতির ভয় ছিল অহরহ। সরকারের খাজনা ছিল প্রচুর।

স্থলপথের মধ্যে মধ্যবর্তী পথটি বড়সড় হলেও উত্তরে পথটি তেমন ছিল না। অত্যুষ্ণ মরুময় এই পথে উট ছিল পরিবহন ভরসা। তাতে স্বাভাবিকভাবেই কম মাল যেত। কাজেই মাঝের পথটিতে কাজ চলত বেশি। এই গুরুত্বপূর্ণ পথটিও যে সবসময় খোলা থাকত তা নয়। দু'দুবার পথটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৬৩২ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬৫১ অবধি এই পথ বন্ধ করে রেখেছিল সেরেসান আরবরা। ইসলাম প্রতিষ্ঠার উগ্রতায় তারা এই ভারত-সিরিয়া সংযোগকারী পথের পার্শ্ববর্তী দেশগুলি দখল করে ফেলেছিল। দ্বিতীয়বার এই পথ বন্ধ হয়ে যায় একাদশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ধর্মযুদ্ধের কারণে। দক্ষিণের পথটি, যেটি মূলত জলপথ, একইরকম নিরাপত্তার অসুখে আক্রান্ত। ভারত মহাসাগর এবং অন্যান্য সাগরের সমুদ্রঝড়ের শিকার হত প্রাচ্যের দুর্বল বাণিজ্যপোতগুলি। এই পথে ধ্বংস অন্য চেহারায়ও দেখা দিত। সেই চেহারার নাম জলদস্যু, ধ্বংসলীলায় এরা পাল্লা দিত সমুদ্রঝড়ের সঙ্গে। জলপথে বাণিজ্যের অসুবিধার আর এক উপরি কারণ এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে জুড়ে দেওয়া যায়। সেটি হল বন্দরশুল্ক। বড় বেশি ছিল সে শুল্ক। তবুও অধ্যাপক বলেছেন, "এত বাধা টপকে প্রাচ্য দ্রব্য পৌঁছত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ; তার পরিমাণও ছিল ভালই।" আর সেখান থেকে পৌঁছে যেত ইউরোপে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এতসব স্থলপথ থাকা সত্ত্বেও কি বা ছিল প্রয়োজন জলপথ সন্ধানের? উত্তর দেয় ইতিহাস, সে ইতিহাস এই অঞ্চলের সামাজিক বা রাজনৈতিক উৎরোলের। এর শুরু ১০৩৮ সালে পারস্যের ওপর তুর্কীদের স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়। ঠিক দুটি শতাব্দী বাদে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের উত্থান। ১২৫৮ সালে মোঙ্গলরা দখল করে বাগদাদ। ১৪০৩ সালে তিমুর দখল করে নেন সিরিয়া, ১৪৫৩ সালে তুর্কিদের দখলে আসে কনস্টান্টিনোপল এত উৎরোলে বন্ধ হয়ে যায় স্থলপথ। দক্ষিণের পথটি খোলা থাকলেও সেটি বন্ধ হয়ে যায় ১৫১৬ সালে যখন তুর্কীরা মিশরের ওপর তাদের অধিকার কায়েম করে।

দুটি কারণে ইউরোপ ভারতবর্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। এক মসলা। দুই স্থলপথের এত বাধার মুক্তি পথের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের তাগিদই তাদের জলপথ আবিষ্কার এবং সাফল্য।

ইউরোপীয়ানরা এল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা করতে। বাসনা ছিল ক্ষমতার, লাগল নিজেদের মধ্যে লড়াই। ইংরেজ, ডাচ, পোর্তুগিজ সবাই লড়তে লাগল নিজেদের মধ্যে এর মধ্যে ভারত আর পারস্য উপসাগরে প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল ইংরেজ

১. অধ্যাপক চেইনি, (পাণ্ডুলিপিতে পৃষ্ঠার উল্লেখ নেই।)

আর পর্তুগিজরা ভারতে এই লড়াইয়ে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে এসে দেখা গেল জয়ী ইংরেজরা। পারস্য উপসগারেও ইংরেজরা জয়ী। সাল ১৬২২, তখন থেকেই পারস্য উপসাগর ইংরেজদের কাছে অবাধ হয়ে গেল। অন্য দিকে ইংরেজ আর ডাচদের মধ্যে লড়াইয়ের মতে ছিল মালয় দ্বীপপুঞ্জ, এখানে ইংরেজদের কিন্তু হার হল। সেটি ছিল ১৮২৩ সাল। অ্যাম্বয়নায় বিপর্যয়ের পর পরাজিত ইংরেজরা পিছিয়ে গিয়ে মনোনিবেশ করল ভারতবর্ষের ওপর। মালয় দ্বীপপুঞ্জ রয়ে গেল ডাচদের ভোগের জন্য। ভারতবর্ষের ভোগ দখলের লড়াই কিন্তু ইংরেজদের জন্য লড়াই ব্যতিরেকে হয়নি। এখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা। এখানে দ্বন্দ্বের মাত্রাও অন্যরূপ নিল। বাণিজ্য ছেড়ে রাজনীতিতে ঢুকে পড়ল সে লড়াই, দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে ফরাসীরা আস্তানা গেড়েছিল। ১৭৪৪ সালে আনুষ্ঠানিক লড়াই শুরু হল। অনেক লড়াইয়ের শেষে সেটি হল ১৭৬৩ সালে ওয়াণ্ডিওয়াশে ইংরেজদের জয়। পূর্ব ভারতে একই লড়াই ইংরেজদের কপালে জয়তিলক পরিয়ে দেয়। সেটি হল ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ। বাংলার নবাবের পক্ষ নিয়ে নবাবের সাথে পরাস্ত হল। মুছে গেল ফরাসী শক্তি। নিরঙ্কুস ইংরেজ ভারত শাসনের দায়িত্ব নিল।

* * * * *

কিন্তু ভারত বিজয় ভারতবাসী কিভাবে নিল?

* * * * *

একদিক থেকে দেখতে গেলে ব্রিটিশদের ভারত বিজয় এক দুর্ঘটনা। নিয়তি নির্দিষ্ট দুর্ঘটনা। এই কারণেই লর্ড কার্জনের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত।

(উদ্ধৃতিটি মূল পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি—সম্পাদক)

ইংরেজ শাসন এক বৃহৎ প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়ায় ভারতবাসীর জন্য তার অবদান কি? এ ব্যাপারে অনেক পাতা খরচা করে অনেক বই লেখা হয়েছে। কাজেই নতুন করে কিই বলার আছে। এই বৃহৎ প্রশ্নটিকেই ছোট বৃত্তের মধ্যে এনে যদি জিগ্যেস করা যায় সমাজে অস্পৃশ্যদের জন্য ব্রিটিশরা কি করেছে? অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বা সমাজে অস্পৃশ্যদের উন্নতিবিধানের জন্য ব্রিটিশদের অবদান কি? এই অবদানের আলোচনার জন্য সমাজের সব ক্ষেত্রকে না ধরে তিনটি ক্ষেত্রকে আমি বেছে নিচ্ছি—জন-কৃত্যক, শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কার।

II

ব্রিটিশ সরকার দেশের জনসেবার চাকরিতে অস্পৃশ্যদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছিল কিনা? সৈন্যবাহিনীর কথাই ধরা যাক। অস্পশ্যদের ভাগ্য বোঝার আগে আমাদের জানতে হবে ব্রিটিশরা ভারত জয় করল কিভাবে? কিভাবে তারা সফল হল?

ভারত জয় এক অসাধারণ ঘটনা। দুটি কারণ এর পেছনে খুঁজে পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ইউরোপিয়ান দেশগুলির কাছে যে সমস্ত দেশগুলির অর্গল হঠাৎ করে খুলে যায় তাদের তিনটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ভাস্কো-ডা-গামা যেগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। এই দেশগুলিতে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিশাল, সংগঠিত প্রচুর জনসংখ্যাবাহী রাজত্ব। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে কলম্বাসের আবিষ্কৃত দেশগুলি যাদের জনসংখ্যা কম আর দেশের ধারণা বলতে যাদের অবস্থান ছিল প্রাথমিক অবস্থায়। এছাড়া ছিল তৃতীয় শ্রেণী। আবিষ্কারক এই শ্রেণী ছিল মনুষ্যবর্জিত ফাঁকা জমি। ভারতবর্ষের অবস্থান প্রথম শ্রেণীর মধ্যে, এই কারণে ভারতজয় এক অসাধারণ ঘটনা বলে চিহ্নিত।

অসাধারণত্বের পেছনে দ্বিতীয় কারণ ভারত বিজয়ের সময়কাল। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৮ সালের ভারত বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ নামে খ্যাত যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যবাহিনী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হয়েছিল। বাণিজ্য ছেড়ে ইংরেজের ভৌগোলিক বিজয়ের সেই শুরু। এই শুরুর শেষ ১৮১৮ সালের কোরেগাঁও যুদ্ধে যেখানে মারাঠা সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে ইউরোপের অবস্থা কেমন ছিল? ইংরেজ জনগণের অবস্থাই বা কেমন ছিল? এই সময়টি ছিল ইউরোপের হাঙ্গামার সময়কাল। নেপোলিয়ন তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাচ্ছেন। এরই মধ্যে ১৮১৫ সালে শুরু হয়েছিল ওয়াটারলুর যুদ্ধ। এইটি বা তাদের যুদ্ধগুলিতে ইংরেজরা দারুণভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। নেপোলিয়নকে রুখতে তারা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে নিয়ে তৈরি করেছিল এক মৈত্রীসংঘ। এই ভয়ানক লড়াইয়ে ইংরেজদের প্রয়োজন পড়েছিল প্রত্যেকটি পয়সার, প্রত্যেকটি মানুষের, প্রত্যেকটি জাহাজের, প্রত্যেকটি বন্দুকের। এই মরণপণ প্রয়োজনের মুখে দাঁড়িয়ে ইংলন্ডের পক্ষে সুদূর এক যুদ্ধক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কোনওরকম সাহায্য করা তো সম্ভব ছিলই না বরং কোম্পানির থেকেই সৈনিক অর্থ আর জাহাজ সাহায্য পাঠানো হয়েছিল। এই সাহায্যের পরিমাণ কতটা তার একটা হিসেব পাওয়া যায় ম্যাকফারসনের পরবর্তী সময়ে।

তাহলে এই সময়ে যখন ইংলন্ড মরণপণ এক লড়াইয়ে বৃত যখন সে তার দলের এক কোম্পানিকে কোনও সাহায্যই করতে পারছে না তখন সেই কোম্পানিই ভারতজয় করে ফেলল। এই অসাধারণ ঘটনা ঘটল কিভাবে? এর ব্যাখ্যা কি?

ম্যাকলে তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

(উদ্ধৃতি মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই)

ম্যাকলের ব্যাখ্যা কিন্তু সমস্ত ইংরেজের পছন্দসই। এমনকি এই ব্যাখ্যা বহুকাল যাবৎ ইংরেজ তো বটেই সমস্ত ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান জনগণের মনে ধরেছিল। এই ব্যাখ্যা ইংরেজ জনগণের নতুন প্রজন্মের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা হল। ম্যাকলের ব্যাখ্যা, বোঝা যায় এক সামাজ্যবাদী জনগণের নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবার অন্যরূপ।

কিন্তু ম্যাকলের ধারণা কি ঠিক? ইতিহাস কি বলে? অধ্যাপক সিলি (Seely) যিনি ম্যাকলের তুলনায় এই বিষয়টিকে অনেক বাস্তবসম্মত উপায়ে অনুধ্যান (Study) করেছিলেন, বলেন : আরকট হোক বা পলাশি বা বক্সার সব জায়গায় লড়াইয়ে যে কোম্পানি জিতেছিল, জয়ী কোম্পানির সেই সেনানীর কতজন ইংরেজ ছিল সেটি আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সম্ভবত পাঁচভাগের একভাগ বা তারও কম। তাহলে তদন্ত করে দেখলে দেখা যাবে জাত হিসেবে নিজেদের উৎকৃষ্ট ভাবার যে চিন্তা ইংরেজরা করে সেই ধারণা ভুলুণ্ঠিত হয়, তাহলে কোম্পানির বাহিনী জিতল কি করে? বিশেষ করে যখন শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা কখনও কখনও দশগুণের বেশি ছিল। কারণ ইউরোপীয়ান শৃঙ্খলা কোম্পানির সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল আর এই বাহিনীতে যে দেশীয় সেনারা ছিল তারাও এই ইউরোপিয়ান শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল। তবে চাকরির সুবাদে আমি বলব, তারা ফরাসীদের কাছ থেকে এই শৃঙ্খলা আয়ত্ত করেছিল। এই শৃঙ্খলাপরায়ণ দেশীয় সৈনিকরাই কোম্পানি ভারত বিজয়ের মূল কারিগর বা সংক্ষেপে আমরা বলেত পারি ভারতবাসীর পরাজয় ভারতবাসীর হাতেই হয়েছিল।"[১]

অধ্যাপক সিলির ব্যাখ্যা মোটামুটি ঠিক। কিন্তু ভাবনার আরও কিছু বাকী আছে। কোম্পানি মূলত ভারতীয়দের সাহায্যেই ভারত বিজয় সেরে ফেলেছিল এটা ঠিক। কিন্তু আমাদের সেই ভারতীয়রা কারা যারা বিদেশি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল? সেই প্রশ্ন অধ্যাপক সিলি কখনও তোলেননি। কিন্তু এই প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১. সিলি; 'এক্সপ্যানসন অব ইংলন্ড'; পৃ: ২০০-২০২

বিস্তর আলোচনা অনেক বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার সিদ্ধান্ত বিদেশি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল ভারতের অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী। পলাশিতে ক্লাইভের পাশে দাঁড়িয়ে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা ছিল অস্পৃশ্য দুসাদ। ঠিক একইভাবে কোরেগাঁওতে ইংরেজদের হয়ে লড়াই করেছিল অস্পৃশ্য মানবরা। অর্থাৎ প্রথম এবং শেষ লড়াই, দুটি লড়াইয়েই দেখা যাচ্ছে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিল অস্পৃশ্যরা এবং জিততে সাহায্য করেছিল। এই সত্যের স্বীকৃতি মারকুইস অব টুইড্‌ল্‌ডেলের নোটে, যে নোট উনি দিয়েছিলেন পিল কমিশনে। পিল কমিশন গঠিত হয়েছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির জন্য। তিনি বলেছিলেন :

(পাণ্ডুলিপিতে উদ্ধৃতিটি পাওয়া যায় নি—সম্পাদক)

অনেকেই অস্পৃশ্যদের এহেন আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু অস্পৃশ্যদের বেলায় এই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। ইতিহাস একথা বলে যে, নিজের দেশের মানুষের দমনের হাত থেকে রেহাই পেতে আগ্রাসী বিদেশি শত্রুর পক্ষ নেয় সেই দেশেরই মানুষের একটি অংশ। তাঁরা, যাঁরা অস্পৃশ্যদের দোষ দিচ্ছেন তাঁদের ইংরেজ শ্রমিকদের প্রচারিত ইস্তাহার পড়ে দেখা উচিত।

* * * (উদ্ধৃতাংশ পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নেই—সম্পাদক)

অস্পৃশ্যদের এই আচরণ কি আশ্চর্যের ব্যঞ্জনাবাহী? একথা বলা যেতে পারে ইংরেজের অধীনে কর্মরত শ্রমিকশ্রেণীও উৎপীড়নের স্বীকার। কিন্তু অস্পৃশ্যরা যে উৎপীড়নের মধ্যে বাস করত তার তুলনায় ঐ শ্রমিকদের অবস্থা কিছুই নয়।

(পাণ্ডুলিপির এই অংশটি ছেড়ে গেছে—সম্পাদক)

অস্পৃশ্যরা ব্রিটিশদের ভারত জয়েই শুধু সাহায্যই করেনি, তারা তাদের এদেশে ঘাঁটি গাড়তে সাহায্য করেছিল। উদাহরণ? ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। একটা চেষ্টা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন উৎপাটন করে ভারতবর্ষ তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার। এই চেষ্টা মূলত হয়েছিল বেঙ্গল আর্মির নেতৃত্বে। সফল হয়নি। কারণ বোম্বে আর্মি এবং মাদ্রাজ আর্মির ব্রিটিশ আনুগত্য। এখন যদি বোম্বে আর্মি এবং মাদ্রাজ আর্মির গঠনের দিকে নজর দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে দুই বাহিনীই অস্পৃশ্যদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। মাহাররা ছিল বোম্বে আর্মিতে সংখ্যাধিক্য। পারিয়ারা ছিল মাদ্রাজ আর্মিতে।

বেঙ্গল আর্মি বলা হত কারণ এই সৈন্যবাহিনী ছিল বাংলা সরকারের অধীন। ঘটনাচক্রে এই বাহিনীতে কোনও বাঙালি সৈন্য ছিল না বরং ছিল ভারতের আর্যাবর্তের মানুষজন।

তাহলে ব্রিটিশরা অস্পৃশ্যদের সৈন্যবাহিনীতে কেমন মর্যাদা দিত? মজার ব্যাপার এখানেই ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে অস্পৃশ্যদের নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। নতুন কোনও অস্পৃশ্য ব্যক্তি আর নিযুক্ত হল না। আর যে সমস্ত পূর্বনিযুক্ত অস্পৃশ্য ব্যক্তি রয়ে গেল বাহিনী থেকে তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে তাদের যেন দয়া করা হল। এই থেকে যাওয়ার দল ধীরে-ধীরে নিশ্চিহ্ন হল—অবসর বা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এইভাবে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে এসে দেখা গেল আর কোনও অস্পৃশ্যজাতের মানুষ সেনানী নেই। অস্পৃশ্যরা এইভাবে পেল অকৃতজ্ঞ প্রতিদান।

ব্রিটিশরা এমন বিশ্বাসহন্তার কাজ কেন করল? যদিও শোনা যায় এই কাজ কখনই ইচ্ছাকৃত ছিল না এবং সৈন্যবাহিনীর দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশ্নেই এই নিয়োগনিষেধ চালু হয়েছিল, তবুও ব্রিটিশ সরকার এর কোনও সঠিক কারণ বা ব্যাখ্যা দেয়নি। ১৮৯০ সালে চালু হওয়া এই নিয়োগের এই ধারা চালু করে শ্রেণীবৈষম্য। আগের শ্রেণী বাদ দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য যোগ্যতা ধরা হত বুদ্ধি এবং স্বাস্থ্য। কিন্তু এখন নতুন নিয়মে ঐ সমস্ত কিছু সরিয়ে ধরা হতে থাকল ব্যক্তির জাত। কোন জাতের মানুষ, সেটিই প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠল। এমনিভাবে ভারতবর্ষে সামরিক, আর অসামরিক জনগোষ্ঠী, কোম্পানির সৈন্যবাহিনী শুধু সামরিক জনগোষ্ঠীতেই ভরে গেল।

কেন এই পন্থা নেওয়া হল সেটি অবোধ্য। তবে এর পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি যে ছিল এটা বোঝা যায়। ভারতের সামগ্রিক জনসাধারণের ঐক্য বিনষ্ট করার চক্রান্ত বলে এটি ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তবুও ঐক্য নষ্টের জন্য নিয়োগ বন্ধের মতো ভয়ানক ব্যাপার যে করতেই হবে এমনটা না ভাবলেই ভাল হত। শিখ, ডোগরা, গুর্খা, রাজপুত বাহিনীর মতো অস্পৃশ্যদের গঠিত একটি আলাদা বাহিনী থাকতে পারত। অস্পৃশ্য মানেই যে অসামরিক জাতিভুক্ত, এমন তো নয়। বিশেষ করে তারা যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মেরুদণ্ডের মতো কাজ করেছে। মহাবিদ্রোহের সময়কালে সেই ১১১ মাহার বাহিনীর কথা ভুলে গেলে তো চলবে না। সেখানে সৈন্যবাহিনীতে অস্পৃশ্য মানুষদের নিয়োগ বন্ধের সংবাদ তাদের কাছে যথেষ্ট ক্ষোভ আর পীড়ার কারণ।

অস্পৃশ্যরা যখন মহাসমরে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করে দিয়েইছিল তখন নিশ্চয়ই তাদের অসামরিক জনগোষ্ঠীতে ফেলা যাবে না। তাহলে তাদের নিয়োগ বন্ধ হল কেন? আমার মতে অস্পৃশ্যতাই এর পেছনে প্রধান কারণ। ভারতে ব্রিটিশ ইতিহাসের প্রথম দিকে অস্পৃশ্যদের কোনও সমস্যা হয়নি। কারণ তখন বর্ণহিন্দুরা ব্রিটিশ

সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়নি। তারা তখনও বাইরেই ছিল। কারণ তাদের রুটি রোজগার তখনই ভারতীয় রাজারাই চালাত। কিন্তু মহাবিদ্রোহের পর অবস্থা পালটাল। ভারতীয় রাজাদের পরাজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের আয়ের উৎস শুকিয়ে যেতে থাকল। তারা যোগ দিতে শুরু করল ব্রিটিশ বাহিনীতে। সমস্যা দেখা দিল তখনই স্পৃশ্য আর অস্পৃশ্যর কাঁটাতার সমাজের অন্যান্য অংশের মতো ব্রিটিশ বাহিনীতে উঠতে শুরু করল, এসে গেল ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন, আর কে না জানে ন্যায়পরায়ণতা আর সমঝোতার প্রশ্নে ব্রিটিশ চিরকালই দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তাই হল। কৃতজ্ঞতাকে বলি দিয়ে অস্পৃশ্যদের বাহিনী থেকে বিদায় দেওয়া হল।

এই বিতাড়নের কারণ বা ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, বিতাড়নের ফলে অস্পৃশ্যদের সামাজিক নিরাপত্তা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। সামরিক বাহিনীর চাকরিই তখন অস্পৃশ্যদের কাছে একমাত্র চাকরি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সেনাবাহিনীতে অস্পৃশ্যদের সেবা যথেষ্ট প্রশংসনীয় ছিল যার ফলে তাদের জমাদার সুবেদার, সুবেদার মেজর প্রভৃতি পদে উন্নতি ঘটেছিল। যার ফলে সমাজে বর্ণহিন্দুদের চোখে তাদের আসনটি হয়ে উঠেছিল শ্রদ্ধার। ফলত সমাজে অস্পৃশ্যরা সম্মান প্রতিপত্তি, কখনও-কখনও প্রভুত্বের দাবিদার হয়ে উঠতে লাগল। এই ভাবেই অস্পৃশ্যরা বংশ পরম্পরায় সামরিক বাহিনীতে তাদের বৃত্তি চালিয়ে যেতে লাগল। ছেদ পড়ল ১৮৯০ সালে, যখন এই বাহিনীতে চাকরির পেশার ব্যাপারটি তাদের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল ঠিক যেমন হয়েছিল ১৯৩৫ সালে ইঙ্গ-ভারতীয়দের বেলায়। মুখের ওপর সামনাসামনি সাংঘাতিক ধাক্কা খেলে যা হয়, সামরিক বাহিনীতে চাকরির পথ রুদ্ধ হওয়ায় অস্পৃশ্যদের তাই হল। তাদের পতন খাড়া পাহাড় থেকে সমতলে পতনের সমার্থক হল, বা আরও বেশি পাতাল প্রবেশ। কারণ দেশীয় রাজাদের আমলে তাদের অবস্থান যা ছিল এখনকার অবস্থা তার থেকে খারাপ হল।

এ তো গেল সামরিক বাহিনীতে তাদের চাকরির কথা, অসামরিক পেশায় তাদের অবস্থান কি হল?

অসামরিক চাকরির দরজা অস্পৃশ্যদের বন্ধই ছিল। কারণ অসামরিক চাকরিরে জন্য দরকার ছিল উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষা কেন, অস্পৃশ্যরা বেশিরভাগই ছিল অশিক্ষিত। ইদানিংকালে কেউ-কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোলেও তাদের কোনওরকম সুবিধা দেওয়া ব্রিটিশদের না পছন্দ ছিল। অথচ এমন কথা বলা যাবে না ব্রিটিশরা কোনও জাতকেই সে সুবিধা দেয়নি। দিয়েছিল মুসলমানদের। ব্রিটিশরা এদেশ সম্পূর্ণ

---

১. জেনারেল উইলকক্স; "উইথ ইন্ডিয়ানস ইন ফ্রান্স" : দ্রষ্টব্য; (পাণ্ডুলিপিতে পৃষ্ঠার উল্লেখ নেই)।

গ্রাস করার পর শাসনভার নির্বাহের জন্য আই. সি. এস. (I.C.S.) নামে যে আমলা বাহিনী তৈরি হল তাতেও মুসলমানদের জায়গা ছিল। ছিল না অস্পৃশ্যদের-ফলত তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা।

দ্বিতীয় কারণ : শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যজাতের লোকজন অসামরিক চাকরিতে জায়গা পেল না। কারণ ব্রিটিশ সরকার এইসব সরকারি চাকরিতে পদ পূরণের দায়িত্ব দিয়েছিল প্রত্যেক দপ্তরের প্রধানের ওপর। আর প্রধানেরা সবাই বর্ণহিন্দু, তাদের মানসিক গঠনের কারণে স্বভাবতই অস্পৃশ্যরা কোনও ডাকই পেত না, সমস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চরিত্রের দুটি দিক প্রকাশ পেত। তারা ছিল একই সঙ্গে দারুণ উদার আবার দারুণ অনুদার। তাদের ঔদার্যে সরকারি চাকরির দরজা প্রথমে খুলে যেত তাদের নিজেদের পরিবার পরিজনদের জন্য। তাদের না পেলে আত্মীয়স্বজনদের জন্য, তাদের অভাবে ছবিতে আসত বন্ধুবান্ধবেরা, একান্তভাবে তাদের অভাব ঘটলে উচ্চজাতে হিন্দুরা তো ছিলই। বর্ধমান ব্যাসার্ধের এই বৃত্তে একটা না একটা কাজের লোক পাওয়া যেতই, একদম না পাওয়া গেলে তবেই অস্পৃশ্যদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত। বিবেচনার কার্পণ্যে অস্পৃশ্যদের ভাগ্যে লেখা হত সুযোগের দুর্ভিক্ষ।

শুধু দুটি কাজ অস্পৃশ্যদের জন্য তোলা থাকত, এক পুলিশের চাকরি, দুই ভৃত্যের। এর মধ্যে পুলিশের কাজে তাদের জন্য কতটা সুযোগ থাকত?

উত্তর হল, পুলিশের চাকরিও তাদের জন্য বন্ধ হল। ১৯২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর, যুক্তপ্রদেশের বিধান পরিষদে একটি প্রস্তাবনা রাখা হল। এই প্রস্তাবনায় সরকারের কাছে এক আবেদন পেশ হল। আবেদনে বলা হল যে, সমস্ত রকম সরকারি চাকরিতে বিশেষ করে পুলিশের চাকরিতে অস্পৃশ্যদের যাতে জায়গা হয় তার সংস্থান করতে। কিন্তু এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিনিধি তাঁর সরকারি বক্তব্যে জানালেন: "যদি মাননীয় সভ্যরা চান তো সরকারি কাজ সবার জন্যই উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এসব কাজের বিশেষ করে বাহিনীতে অপরাধপ্রবণ জাত বা চামার জাতীয় নিচু শ্রেণী থেকে লোক নেওয়া হবে এমন ব্যবস্থায় আমার আপত্তি আছে"।

১৯২৭ সালের ২৫ জুলাই পঞ্জাব বিধান পরিষদে লালা মোহন লালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এই প্রশ্ন।

লালা মোহন লাল: অর্থদফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য কি জানাবেন অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের কি আরক্ষা বাহিনীতে নেওয়া হচ্ছে? যদি না হয়ে থাকে তবে আরক্ষা বাহিনীর আরক্ষিক (Constable) পদে কি অনুন্নত শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হবে?

মাননীয় স্যার জিওফ্রে দ্য মন্টমোরেন্সি : অনুন্নত শ্রেণীর কোনও সদস্য আরক্ষা বাহিনীতে নেই। সরকার সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছে যেদিন অনুন্নত শ্রেণী সমাজের চোখে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পাবেন সেদিন বোধহয় সমাজের শেষের সেদিন। যাতে করে তারা বোধ বুদ্ধিবেত্তায় সমাজের অন্য অংশের সমদক্ষ হবে। এই দক্ষতার সাম্যই তাদের আরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগের পথ সুগম করবে।

বোম্বাই সরকার (Government of Bombay) কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি ১৯২৮ সালে এই প্রসঙ্গে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে।

(উদ্ধৃতিটি পাণ্ডুলিপিতে নেই)

দাসবৃত্তি বা ভৃত্যের চাকরিও অস্পৃশ্যদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। অস্পৃশ্যরা ভৃত্যের কাজ পাচ্ছে না এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ নাক কুঁচকালেও ঘটনা সত্যি, কারণ খোঁজাও খুব কষ্টসাধ্য নয়। কারণ অতি সাধারণ। অস্পৃশ্যতা এই একই কারণে আরক্ষা বাহিনীতেও অস্পৃশ্যদের চাকরি হল না। আরক্ষা বাহিনী ধরা যাক কাউকে গ্রেপ্তার করতে গেল এবং সেই ব্যক্তি যদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু হন আর তাকে গ্রেপ্তার করতে যাওয়া আরক্ষকটি যদি নীচশ্রেণীর হয় তবে অস্পৃশ্যতার সামাজিক বিধিভঙ্গের ভয়ঙ্কর পরিণতির কি হবে? এমনকি আরক্ষা বাহিনীর মধ্যেও যদি অস্পৃশ্যজাতের আরক্ষিক থাকে তবে তার উচ্চশ্রেণীজাত সহকর্মীর প্রতিক্রিয়া কি হবে? এমন বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আরক্ষা বাহিনীতে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এবার দাসবৃত্তির দিকে যদি তাকানো যায় তবে দেখা যাবে যে, অস্পৃশ্য নিয়োগে সমস্যা একই। কোনও সরকারি কর্মক্ষেত্রে ধরা যাক কোনও অস্পৃশ্যকে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করা হল। তখন তার সেবায় স্পর্শযোগ্য সামাজিক দূষণ ডেকে আনবে। আরও আছে। তখনকার প্রথানুযায়ী সেই ভৃত্যকে অফিসের যিনি প্রধান তাঁর বাড়ির কাজও করতে হবে। অর্থাৎ তথাকথিত সামাজিক দূষণ সেই প্রধানের বাড়িতেও চলে যাবে। এ কি করে সম্ভব। তাহলে হয় চাকর হিসেবে অস্পৃশ্যদের রাখা যাবে না, অথবা এই সমস্ত নিত্যকার পরিষেবা বাতিল করতে হবে। সামাজিক বিধানে প্রথমটিই মেনে নেওয়া হল। বোম্বাই কমিটির সুপারিশ অতএব প্রণিধানযোগ্য।

III

অস্পৃশ্যদের শিক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার কি করেছিলেন? এ ব্যাপারে আমি বোম্বে প্রেসিডেন্সিকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করতে পারি। ব্রিটিশ শাসনাধীন শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

I—১৮১৩ থেকে ১৮৪৫

১. বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা ধরা যেতে পারে ১৮১৫ সালে বোম্বাই শিক্ষা সমাজ। এই সমাজের কাজ শুধু ইউরোপিয়ান শিশুবিকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশীয় ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেওয়া হত। এই সোসাইটির যে স্কুলগুলি সুরাট আর থানায় ছিল সেই স্কুলগুলিতে যাতে দেশীয় ছেলেমেয়েরা যায় তার দিকে নজর দেওয়া হত। ১৮২০ সালে বোম্বেতে দেশীয় ছেলেমেয়েদের জন্য চারটে স্কুল খোলা হয়েছিল। সেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫০। ঐ বছরের আগস্ট মাসে আর একটি পদক্ষেপ নেওয়া হল। একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হল। এর কাজ ছিল মাতৃভাষায় স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা এবং সেই স্কুলের জন্য মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করা। এইভাবে কাজের ব্যাপ্তি সোসাইটির গঠনের ব্যঞ্জনা বাড়িয়ে তাকে কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করল। তখন ১৮২২ সাল। কর্পোরেশনের নাম হল বোম্বাই দেশজ বিদ্যালয় পুস্তক এবং বিদ্যালয় সমাজ। এই নামটিও ১৮২৭ সালে পাল্টে গেল, হল বোম্বে দেশজ শিক্ষা সমাজ। এর সভাপতি ছিলেন মাননীয় মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন। সহ-সভাপতি ছিলেন চারজন। বোম্বাইর প্রধান বিচারপতি এবং বোম্বাইর কার্যনির্বাহী পরিষদের তিনজন সদস্য। নির্বাহী সমিতি গঠিত হল বারোজন ইউরোপিয়ান এবং বারোজন ভারতবাসী নিয়ে। সচিব ছিলেন দুজন ক্যাপ্টেন জর্জ জার্ভিস আর. ই এবং শ্রীযুক্ত সদাশিব কাশীনাথ ছাত্রে। কমিটি তার কাজ চালানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে বছরে ৬০০ টাকা পেত। ১৮২৫ সালের প্রথমদিকে বোম্বে সরকার নিজের খরচেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে শুরু করলেন আর এই বিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দেওয়া হল সমাহর্তা বা কালেকটরের হাতে। এই দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপনার জন্য তৈরি হল শিক্ষাপর্ষদ। সেটা ১৮৪০ সাল, এই পর্ষদ গঠিত হয়েছিল ছয় জন সদস্যকে নিয়ে। এর মধ্যে তিন জন সরকার মনোনীত, বাকী তিনজন দেশীয় শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি। ১৮৫৫

সালে জনশিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ না করা অবধি এই পর্ষদ শিক্ষাদফতরের অধীনেই পরিচালিত হত।

২. ১৮৫৫ সালের ১ মার্চ এই পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার দিন দেখা গেল এর অধীনে ১৫টি ইংরাজি স্কুল ও কলেজ নথিভুক্ত ছিল যাদের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৮৫০. আর মাতৃভাষার স্কুল ছিল ২৫৬টি ছাত্রসংখ্যা যাদের ১৮৮৮৩। এই একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঃ

"১৮৫৫ সালের আগস্ট মাসে আমরা আহমেদনগরের কিছু অধিবাসীদের কাছ থেকে একটি আবেদনপত্র পেলাম। সেই আবেদনে সমাজের নীচজাতের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ আছে। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের একটি ঘর তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র উপস্থিতির হার ৩০ জন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা স্বভাবতই সমাজের উচ্চশ্রেণীর এবং তৎকালীন ধনীশ্রেণীর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। শূল আরও ছিল—মাঝারি মাইনেতে কোনও শিক্ষকও পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু আবেদনকারীদের উদ্যম আমাদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ছিল। অতএব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল। এই ছোট ঘটনাটি উল্লেখ করলাম নীচজাতের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান যে অন্তরায় থাকে তার উল্লেখে।"

৩. পর্ষদের এই প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার, ওটিই ছিল অস্পৃশ্যদের জন্য নির্ধারিত প্রথম বিদ্যালয়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে ১৮৫৫ সালের আগে তাহলে ব্রিটিশ সরকার অস্পৃশ্যদের জন্য শিক্ষার ব্যাপারে কি করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের ইতিহাসের পর্দা সরিয়ে অতীতে উঁকি দেবার একটু প্রয়োজন আছে। বোম্বাইতে তখন পেশোয়াদের রাজত্ব। এই রাজত্ব ঈশ্বরতন্ত্রের প্রতিভু। এই রাজত্বে মনুসূত্রানুযায়ী শূদ্র এবং অতিশূদ্রদের শিক্ষার বৃত্তের মধ্যে পা রাখার কোনও অধিকার ছিল না। তাদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হত না, তায় আবার শিক্ষা। পেশোয়া রাজত্ব ধীরে ধীরে অবদমিত এই মানুষজনের ঘৃণার বস্তু হয়ে উঠল। এই রাজত্বের পতনে স্বভাবত্বই অস্পৃশ্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারা ভেবেছিল তাদের ভারি বেদনার খানিকটা লাঘব হবে কারণ ব্রিটিশরা এমন এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল যে তন্ত্রে উচ্চ নীচ বর্ণ ভেদে মানুষের সম মূল্যায়ন হবে। তাদের এও আশা ছিল যে, যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তারা ভগীরথের ভূমিকা পালন করেছিল সেই ব্যবস্থা

থেকে তারা প্রতিদান পাবে। তাদের প্রত্যাশা বিশেষ যত্নের আশা নয় বরং মানুষ হিসেবে সমসর্থদার আশা। ব্রিটিশ দীর্ঘদিন এদেশীয়দের শিক্ষা এবং তার প্রসার সম্পর্কে নীরব ছিল। যদিও প্রশাসনের কোনও-কোনও উচ্চপদস্থ সহৃদয় ব্যক্তির মনে এমন বিষয় সম্পর্কিত ভাবনা ঠাঁই নিয়েছিল, নিয়মবদ্ধ রূপায়ণ ছিল না। ১৮১৩ সালে এ সম্পর্কে সর্বজনবিদিত একটি ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ জর্জের ৫৩নং সংবিধির ১৫৫নং অধ্যায়ের ৪৩নং ধারা অনুয সংসদে ঘোষণা করা হল, " ভারতবর্ষ থেকে যা আয় হবে তার মধ্যে এক লাখ সরিয়ে রাখা হবে যাতে সেই অর্থ ভারতবর্ষে শিক্ষা, সাহিত্য বিজ্ঞানচর্চার উন্নতিতে ব্যয় করা হয়।" তবে এই সংবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধনে খুব একটা কাজ করেনি। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন পরিচালকমণ্ডলী ভারতের বড়লাটকে এক চিঠিতে সংসদে আলোচিত ঐ ৪৩নং ধারা সম্বন্ধে তার মন্তব্য পেশ করে, এবং সংসদের আলোচনা যে সমস্ত হিন্দুদের মাথায় রেখে করা হয়েছিল তাদের মধ্যে সংস্কৃতভাষার প্রসারের স্বপক্ষে মত দান করে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার এই আলোচনায় নীচশ্রেণীর কোনও স্থান ছিল না, তাদের কথা ভাবাই হয়নি। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারও মনে করেছিল শিক্ষা শুধুই উচ্চশ্রেণীর জন্য। ১৮৫০-৫১ সালে পর্যদের একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছিল :—

"পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যদ কর্তৃক নেওয়া ব্যবস্থা পরিচালক আদালত কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত মাননীয় আদালতের নির্দেশক্রমেই শিক্ষা পর্যদ শিক্ষার একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রম আর্ল-অব্ অকল্যান্ড মেজর ক্যান্ডির মতো ব্যক্তির মতামতের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এদেশের বুদ্ধিমান মানুষদের মতামতের ওপর। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মহামান্য আদালতের মন্তব্যে যেখানে বলা আছে শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টাতে হবে।"

"পরিচ্ছেদ ৮ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে আদালতের অভিমত। একইভাবে মাননীয় আদালতের অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছা যদি সঠিকভাবে ভাষান্তর করা যায় তবে আমরা জানতে পারি সীমিত অর্থভান্ডার থেকে শিক্ষাখাতে কিছু অর্থ সংকুলানের বন্দোবস্ত করা হোক। মাদ্রাজকে ১৮৩০ সালে মাননীয় আদালতের নির্দেশ ছিল এইরকম—শিক্ষা একটি জনগোষ্ঠীর নৈতিক, বৌদ্ধিক উন্নতি ঘটায় কিন্তু সেই উন্নতির রেখা উর্ধ্বগামী হয় যদি সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাবশালী উচ্চশ্রেণীর

জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় যাদের হাতে শিক্ষাখাতে ব্যয় করার জন্য অবসর সময় আছে। জনগোষ্ঠীর সমগ্রর জন্য শিক্ষাদানের চিন্তা না করেও যদি এই নির্দিষ্ট অংশের জন্য চিন্তা করা হয় তবে ফল দ্রুত লাভ করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সুবিধা এই যে, এই রাজারাজড়ার আমলে প্রশাসনের অভ্যন্তরে এদের বাস ছিল।

"পরিচ্ছেদ ৯ গত দশ বছরের শিক্ষাবিন্যাসের মুখ্য ঘটনাবলীর দিকে ফিরে দেখা জরুরি—শেষ কটি পরিচ্ছদের শেষে যে বিতর্ক তোলা হয়েছে সে ব্যাপারে বলা যায় মুখ্য যে তার দিকে যদি পরিশ্রমী চোখ ফেরানো যায় তবে দেখা যাবে বিতর্ক অনর্থক। এই দশক এবং তার পরবর্তী দশকে যখন ১৮৫৩ সালে এই বিভাগের সমস্ত বিদ্যালয়গুলি একটি পর্ষদের অধীনে আনা হল তখন সঠিকভাবে পর্ষদের সদস্যরা বিশ্বাস রেখেছিলেন যে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী প্রজন্মকে আলো দেখানো যাবে।"

"পরিচ্ছেদ ১০—বোম্বে এবং বাংলায় স্বতস্ফূর্তভাবে সমরূপ ব্যবস্থার বিকল্পে—আমরা এখন আমাদের পর্যবেক্ষণে মুখ্য শিক্ষাব্যবস্থার যতটুকু ধরা পড়েছে ততটুকু খুঁটিয়ে বলার চেষ্টা করব, এই চেষ্টায় আমরা দেখতে পারি শিক্ষাব্যবস্থার যেটুকু ভুলত্রুটি ধরা পড়ছে সেটুকু ভারতীয় জলহাওয়ায় নিজস্ব নিয়মে শুধরে যাচ্ছে।"

"পরিচ্ছেদ ১১—বোম্বাইতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমাদের নজরে আসবে শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি পর্ষদের অধীনে আসার পরে বিদ্যালয় এবং ছাত্রসংখ্যার মাথাগুনতি হিসাব। এই হিসাবটি তুলনামূলক ১৮৪০ এবং ১৮৫০ সালের নিরীখে। দেখা যাচ্ছে যে প্রথমটির তুলনায় শেষেরটির হিসাব উন্নতির গতি। এই কবছরে ইংরেজি বিদ্যালয় বেড়েছে চারটি, মাতৃভাষায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ৮৩টি। ছাত্রসংখ্যা শতাংশের হিসাবে একশরও বেশি। সামগ্রিক ছাত্রসংখ্যা নিম্নরূপ

ইংরাজিতে অধ্যয়নরত —১৬৯৯

মাতৃভাষায় অধ্যয়নরত —১০৭৩০

সংস্কৃতে অধ্যয়নরত —২৮৩

মোট সংখ্যা ১২,৭১২, বিদ্যালয় সংখ্যা ১৮৫

"পরিচ্ছেদ ১২—বিষয় একই—অত্যন্ত দক্ষ কর্মীবাহিনী কর্তৃক সংখ্যাগণনায় বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে জনগণের সামগ্রিক আয়তন গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটিতে। এই গণনায় প্রুশিয়ান জনগণনার তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে আমরা আরও তথ্য পাই যে এই জনসংখ্যার মধ্যে সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের পুরুশ শিশুসংখ্যা ৯০০,০০০। কিন্তু এই প্রেসিডেন্সিতে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র উনসত্তরের একজনের বেলায় (প্রতিবেদন ১৮৪২-৪৩ সালে পৃষ্ঠা ২৬)

"পরিচ্ছেদ ১৩—বিষয় একই—এ বিষয়ে আরও স্বীকার করা হয়েছে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠনের বিদ্যালয়গুলির যোগ্যতা যথেষ্ট কম। শ্রীযুক্ত উইলগ্‌বির প্রতিবেদনে এই যোগ্যতার ঘাটতির দিকেই আঙুল তুলে দেখানো হয়েছে। পর্ষদের পক্ষ এই ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়ার সাথে-সাথে এই ত্রুটি মেরামতির জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নেওয়া হল। উইলগ্‌বির মতে, "উন্নতমানের শিক্ষক যারা একটা মাতৃভাষার মাধ্যমের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের যোগ্য দক্ষ তত্ত্বাবধান এবং অবশ্যই মাতৃভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট বই।" এইসব ত্রুটি মুক্ত করতে যে অর্থের সংস্থান প্রয়োজন সেই অর্থের সংস্থান সরকার বাহাদুরের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

"পরিচ্ছেদ ১৪—আমজনতাকে শিক্ষিত করার প্রয়াস দুসাধ্য :—পর্ষদ যদিও আমজনতার শিক্ষাদানের মহতী প্রচেষ্টার থেকে সরে আসেনি তবুও এই প্রচেষ্টায় মূল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থ। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য ১৭৫টি বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রসংখ্যা ১০৭৩০ জন সেখানে অর্থের অভাবে কাজ হয়েছে খুবই সীমীত। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ৯০০০০০ ছেলের জন্য শিক্ষাও থমকে যায় অর্থাভাবে।

"পরিচ্ছেদ ১৫—এই সীমিত সঙ্গতির মধ্যে কাজের অগ্রগমনের সম্বন্ধে পরিচালকমন্ডলীর মতামত—পরিচালক মন্ডলীর মতামত শেষ পরিচ্ছদে খুব পরিষ্কার। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে মন্ডলীর পরামর্শ ছোট মাপে ছোট আয়তন মাথায় রেখে শিক্ষার অগ্রগতি। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজ সরকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ্য (পরিচ্ছদ-৭)। এ ব্যাপারে একটি আনুষঙ্গিক প্রতিবেদনও উল্লেখ্যযোগ্য—"এদেশের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইউরোপিয়ান বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের স্বাদ-গন্ধ পৌঁছে দেওয়াই আমাদের বাসনা। এ ব্যাপারে আমরা খুবই উদ্‌গ্রীব কারণ এই শ্রেণীই ভারতবর্ষের রয়ে যাওয়া জনতার মননকে চালিত করবে।

পরিচ্ছেদ ১৬—ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণীর সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান—মোটামুটিভাবে এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে উচ্চশ্রেণীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা চালিত হবে। এই উচ্চশ্রেণী বলতে কাদের বোঝানো হবে? ইউরোপিয়ান পরিমাপে ইউরোপ বা ইংলন্ডে উচ্চশ্রেণী

বলতে যা বোঝায় এখানে সেই মানদন্ড ব্যবহার করা যায় না। বিশেষ করে অর্থের মানদণ্ড, যে মানদণ্ডে ইউরোপিয়ান, জাতিসমূহ শ্রেণীবিভাজন হত, সেই মানদন্ড ভারতবর্ষে কার্যকর হত না। কারণ ইউরোপে ভিক্ষুক শ্রেণী অপাংক্তেয়। এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে সেই ভিক্ষুকেরই দেবতাজ্ঞানে কদর। কারণ এটা ভেবেই নেওয়া ভিক্ষাবৃত্তি তিনি নিয়েছেন জীবনে বৈরাগ্যকে বরণ করার পর। আর বৈরাগ্য সাধক এদেশে দেবতুল্য।

পরিচ্ছেদ ১৭—ভারতের উঁচু জাত—ভারতে উঁচু জাত কারা? যারা প্রভাবশালী। কারা প্রভাবশালী?

প্রথম—জমিদার, জায়গিরদার। যারা সামন্ততন্ত্রের প্রতিভু। প্রতিপত্তিশালী সেনাপতিবৃন্দ।

দ্বিতীয়—বিত্তমান বণিকশ্রেণী, বাণিজ্যে যাদের বসতি লক্ষ্মী।

তৃতীয়—উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে।

চতুর্থ—অবশ্য ব্রাহ্মণেরা এর সঙ্গে মাঝে মাঝে পংক্তি পাতত বোম্বাইয়ে প্রভুও শেনভিরা আর কায়স্থরা (বাংলার)। এদের কদরের কারণ এদের মধ্যে থেকে লেখক উঠে আসত।

পরিচ্ছেদ ১৮—সবচেয়ে প্রভাবশালী জাত ব্রাহ্মণ উপরি উল্লিখিত এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণরাই ছিল সবচেয়ে প্রতিশক্তিশালী, সবচেয়ে সংখ্যাধিক। জমিদার আর জায়গীরদাদের সেদিন আর ছিল না। পুরানো ঘিয়ের গন্ধের মত্রে তাদের থেকে গিয়েছিল শুধুই আড়ম্বর অর অমিতব্যয়। ক্ষয়িষ্ণু এই শ্রেণীর না ছিল পুরনো ঘরানা, না ছিল নতুনকে গ্রহণ করার মানসিকতা। বণিকশ্রেণীর পূজ্য লক্ষ্মী, সরস্বতীর আরাধনা তাদের জানা ছিল না। এই ঘটনা সব দেশেই সত্যি। খোদ ইংলন্ডে ও সত্যি ছিল। ভারতে আরও বেশি-বেশি সত্যি ছিল। বণিকশ্রেণীর ছেলেরা শিক্ষা শেষের বহু পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাদের পারিবারিক বাণিজ্যে মনোনিবেশ করত। বাকী থাকে রাজকর্মচারীরা। ওদেশ এদেশ সব দেশেই তাদের পরিচয় সরকারি কাজে থাকাকালীন যত না রাজকর্মচারীরা তার থেকেও বেশি রাজ দালালের জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নঞর্থক।

"পরিচ্ছেদ ১৯—ওপরে বিশ্লেষণ একটু দীর্ঘ হলেও অপরিহার্য—আমরা পরে তা বুঝতে পারব। সরকার অতএব ব্রাহ্মণ বা ওই ধরনের উঁচু জাতের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে—সচেষ্ট হল কিন্তু ব্রাহ্মণ বা এই উঁচু জাতের মানুষজন বেশিরভাগ সময়

দেখা যেত খুব দরিদ্র। তবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ব্রাহ্মণ শব্দ আর ভিক্ষুক শব্দটি ছিল সমার্থক।

"পরিচ্ছেদ ২০—ধনিক শ্রেণী, ঠিক এই মুহূর্তে উচ্চশিক্ষা সমর্থন করবে না—২৪ আগস্ট ১৮৫০ তারিখের চিঠিতে মহামান্য শাসনস্বামী আমাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। দায়িত্বটি হচ্ছে এদের বণিকশ্রেণীকে উচ্চশিক্ষার অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল এ কাজ সহজ। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল বণিকশ্রেণী উদাসীন, আর বাকী যারা আছে সেই দরিদ্রদের শিক্ষাব্যবস্থার কাছাকাছি পৌঁছনোর বাধা হচ্ছে বিস্তর। তবে হ্যাঁ, ব্যতিক্রম এখানেও আছে। বণিকশ্রেণীর মধ্যে কিছু অংশ উচ্চশিক্ষা পিয়াসী, এবং সেই সংখ্যা বাংলায় বেশি। বোম্বেতে কম। আমাদের মনে হয় এই শ্রেণীর ব্যাপ্তি ঘটবে। এই শ্রেণী শিক্ষায় কলা এবং বিজ্ঞানে আকাশসীমার দিকে তাদের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে দিতে পারবে যদি ইউরোপিয়ান শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গে দিবে আর নিবে তত্ত্বে তাল রাখা হবে।

পরিচ্ছেদ ২১—নীচ জাতের জন্য শিক্ষার প্রশ্ন—আমাদের যা নজরগোচর হয়েছে তার নিরিখে বলা যায় যে উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র ছাত্রদের জন্য যারা শিখতে আগ্রহী তাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু এখানে আরও একটা কথা মাথায় রাখতে হবে দরিদ্রদের জন্য উন্মুক্ত রাখলে সেখানে তো নীচজাতের ছেলেরাও তো আসতে পারে। তখন? তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই কারা করবে?

পরিচ্ছেদ ২২—হিন্দুসমাজের সংস্কার—এ ব্যাপারে তো কোনও সন্দেহ নেই যে বোম্বেতে হিন্দুদের একাংশ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হলে তাদের উচ্চাশা বাড়বে। তারা তখন চাইবে এদেশি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি চাকরিগুলির যেমন বিচারপতি বা জুরি বা মহারানির শান্তি আয়োগে পদাধিকারী হতে এবং তারা হবেও। তখন শ্রেণীগত বা শ্রেণী অভ্যন্তরীণ বৈষম্য দেখা দিতে পারে। বহু উদারপন্থী মানুষ কিন্তু মনে করেন ব্রিটিশ সরকার সমাজের চালক সংস্কারের সঙ্গে আপোষ করে বা ঐ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ঔদার্য নেই।

"পরিচ্ছেদ ২৩—মাননীয় মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিলস্টোনের বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ—এখানে ঔদার্যশ্রেষ্ঠ এবং সিংহহৃদয় প্রশাসক শ্রীযুক্ত এলফিন্স্টোনের মূল্যবান মতামত তুলে দেওয়া হল। তিনি বললেন, "ধর্মপ্রচারকদের কাছে নীচ জাতের মানুষজন-ই সেরা ছাত্র বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু আমাদের ঐ ধরনের মানুষজনের কাছে শিক্ষার আলো নিয়ে পৌঁছনোর ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এরা সমাজে সবথেকে ঘৃণিত জীব। এদের কাছে যদি

আমরা আমাদের শিক্ষার শিকড় পৌঁছে দেবার ব্যাপারে যত্নবান হই তবে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সাথে আমরা ঘৃণার বস্তু হয়ে যাব। কারণ উঁচু জাতের মানুষেরা যারা মনে করবে শিক্ষার আলো তাদেরই হকের পাওনা ছিল তারা আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে। সংখ্যাধিক্যের ঘৃণা অর্জন করে, তাদের সমর্থনের পরোয়া না করে যে শাসনব্যবস্থা সেই শাসনব্যবস্থা শুধু নির্ভর করবে সৈনাবাহিনীর ওপর। সৈন্যবাহিনীর ওপর একপেশে নির্ভরতা আমাদের শাসনব্যবস্থার বিস্তারে কখনই সাহায্যদায়ী হবে না।"

৫. এই কারণে ১৮৫৫ সালের বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে নীচ জাতের জন্য কোনও বিদ্যালয় না খোলার কারণই ছিল ব্রিটিশ সরকার তাদের শিক্ষার দরজাটি উঁচু জাতের দরিদ্র বা প্রধানত ব্রাহ্মণদের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভবে খোলা রেখেছিল। এই উদ্দেশ্যে সঠিক না বেঠিক সেই প্রশ্ন আলাদা, আমরা শুধু ঘটনার দিকে তাকাব যেখানে আমরা দেখতে পাব অস্পৃশ্য বা অনুন্নত শ্রেণীকে শিক্ষার আশীর্বাদলাভে জোর করে বঞ্চিত করা হল।

III—১৮৫৪ থেকে ১৮৮২

৬. ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই প্রেরিত প্রতিবেদনে পরিচালক মন্ডলীর যা বক্তব্য তা নিচে দেওয়া হল :—

"আমাদের মনোযোগ এখন থেকে একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবে। লক্ষ্যটি কি? লক্ষ্যটি হল এদেশের জনগণ এপর্যন্ত যা নিজের চেষ্টায় এখনও অর্জন করতে পারেনি সেই শিক্ষা, জীবনের প্রতিটি পরিমিতি জ্যামিতির জন্য শিক্ষা। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য সরকার বাহাদুর যাতে প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার খোলা রাখে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে।"

এই প্রতিবেদনটি সঠিকভাবে বলতে গেলে এদেশে জনশিক্ষার ভিৎ হিসেবে গণ্য হয়। ১৮৮২ সালে প্রথম এই উদ্যোগের ফলাফল তথ্যমূলক বিচার হয়। হান্টার কমিশন এই বিচারের দায়িত্বে ছিল। বিচারে যে তথ্য ২৮ বছরে উঠে আসে সেটি নীচে দেওয়া হল।

প্রাথমিক শিক্ষা

১৮৮১-৮২		
	বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রসংখ্যা	মোট শতাংশ
খ্রিস্টান	১,৫২১	৪৯
ব্রাহ্মণ	৬৩,০৭১	২০.১৭
অন্যান্য হিন্দু	২,০২,৩৪৫	৬৪.৬৯
মুসলমান	৩৯,২৩১	১২.৫৪
পার্শি	৩,৫১৭	১.১২
আদিম জাতি এবং পাহাড়ি উপজাতি	২,৭১৩	০.৮৭
নীচ জাতের হিন্দু	২,৮৬২	০.৮৭
ইহুদি এবং অন্যান্য	৩৭৩	০.১২

মাধ্যমিক শিক্ষা
১৮৮১-৮২

		মাধ্যমিক বিদ্যালয়		উচ্চ বিদ্যালয়	
		শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হিসাব	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হিসাব
খ্রিস্টান		১,৪২৯	১২.০৬	১১১	২.২৬
ব্রাহ্মণ		৩,৬৩৯	৩০.৭০	১,৯৭৮	৪০.২৯
অন্যান্য হিন্দু	চাষী	৬২৪	৫.২৬	১৪০	২.৮৫
	নীচু জাত	১৭	০.১৪	—	—
	অন্য জাত	৩,৮২৩	৩২.২৫	১,৫৭৩	৩২.০৪
মুসলমান		৬৮৭	৫.৮০	১০০	২.০৪
পার্শি		১,৫২৬	১২.৮৭	৯৬৫	১৯.৬৬
আদিম জাতি এবং পাহাড়ি উপজাতি		৬	০.০৫	—	—
ইহুদিসহ অন্যান্যরা		১০৩	০.৮৭	৯২	০.৮৬

প্রাক্-স্নাতক (?) (Collegiate) শিক্ষা
১৮৮১-৮২

		শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হিসাব
খ্রিস্টান		১৪	৩
ব্রাহ্মণ		২৪১	৫০
অন্য হিন্দুসকল	চাষী	৫	১
	নীচ জাত	০	০
	অন্যান্য জাত	১০৩	২১.৩
মুসলমান		৭	১.৫

প্রাক্-স্নাতক (?) (Collegiate) শিক্ষা
১৮৮১-৮২

	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হিসাব
পার্শি	১০৮	২১.৫
আদিম জাত এবং পাহাড়ি উপজাতি	০	০
ইহুদিসহ অন্যেরা	২	০.৪

৭. এই যে চিত্র পাওয়া গেল তাতে কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে যে, জনশিক্ষা যদিও অন্যতম প্রণেয় কর্মসূচি তবুও জনগণের অধিকাংশই শিক্ষার লক্ষ্মণগণ্ডীর বাইরে থেকে যাচ্ছে। নীচ জাত আর আদিম জাতদের মধ্যে তো শিক্ষার বিস্তার ঘটেই না। অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের পূর্ববর্তী সময়ের ইতরবিশেষ ফারাক কিছু ঘটেনি, এমনকি ১৮৮১-৮২ সালেও শেষোক্ত শ্রেণীগুলি থেকে উচ্চ বা মহাবিদ্যালয়ে কোথাও শিক্ষার্থী এই প্রেসিডেন্সিতে আসেনি। এমন অবস্থার কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ শিক্ষায় উঁচু নীচু জাতের ভেদাভেদের কারণ জানতে এই প্রেসিডেন্সির পরিচালক সরকারের শিক্ষানীতির ইতিহাস ঘাঁটা প্রয়োজন।

৮. ১৯৫৪ সালের পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদনে কবুল করা হল যে, জনশিক্ষার দায়িত্ব সরকারের, কিন্তু এই স্বীকৃতির জন্য সময় লাগল ৪০ বছর। কিন্তু তবু কিছু দুর্মর তাত্ত্বিক থেকেই যায় যারা এই স্বীকৃতিতে সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের ক্ষোভ উষ্মাপ্রকাশ পায়। বিশেষ করে জনগণশিক্ষায় নীচ জাত সকল যদি মননের উন্নতি টের পায় তবে তা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে হবে ভয়ানক—এই ছিল আশঙ্কা। এই আশঙ্কায় নিয়ন্ত্রণ পর্যদের সভাপতি লর্ড এলেনবরো চিঠি লিখে বসেন পরিচালকমন্ডলীর সভাপতির কাছে। ১৮৫৮ সালে ২৮ এপ্রিল তারিখের এই চিঠিতে তিনি কতগুলি চেতাবনী বা সাবধানবাণী দিতে দ্বিধা করেননি :—

"ভদ্রমহোদয়গণ, ১৮৫৪ সালে পরিচালক মন্ডলীর নির্দেশক্রমে চালিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত বহু চিঠি আমার কাছে এসেছে এবং আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শিক্ষা নিয়ে যা আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি এবং আমার মনে হয় আগামীতে যত দিন যাবে যত বাস্তবের মুখোমুখি আমরা হব তত বেশি অভিযোগের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে।

* * * * *

"পরিচ্ছেদ ১১ :—আমার বিশ্বাস, নীচ জাত বলে যাদের পরিচিতি নেই তাদের পিতমাতাদের প্রলুব্ধ করতে পারিনি যাতে করে এইসব পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠায়। আমাদের যদি আমাদের লক্ষ্যে সফল হতে হয় তবে যেন আমরা শ্রমিকশ্রেণীর মনন কর্ষণের দিকে মনোযোগী হই।

"পরিচ্ছেদ ১২ :—আমাদের মনসিজ বাসনা সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে কিনা সন্দেহ আছে কারণ আমাদের ধারণামতো নীচ জাতের মানুষেরা উচ্চাশা পূরণে সক্ষম হবে না।

"পরিচ্ছেদ ১৩ :— আমরা শিক্ষার মাধ্যমে যা দিতে চাইছি তা করে আমজনতার সামগ্রিক অবয়ব ব্যতিরেকে কিছু দরিদ্র অতৃপ্ত আত্মা তৈরি হবে।

"পরিচ্ছেদ ১৪ :—শিক্ষা এবং সভ্যতার গতি সাধারণত নিম্নগামী অর্থাৎ উঁচু জাতের মানুষের থেকে তা নীচ জাতের মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে, উল্টোটি হয় না। যদি হয় তবে ভূকম্পাদির ন্যায় আন্দোলন সমাজে অনুভূত হয় যে কম্পনের প্রথম আঘাত আসে বিদেশিদেরই ওপর।

"পরিচ্ছেদ ১৫ :—শিক্ষার বিস্তারে উঁচু জাতের দিকেই মগ্ন হওয়া উচিৎ।

পরিচ্ছেদ ১৬ :—আমাদের মগ্নমুখিনতা দু তরফে করার পরিকল্পনা যাক। এক মহাবিদ্যালয় স্থাপন যেখানে শুধু উঁচু জাতের মানুষের প্রবেশাধিকার থাকবে, দুই সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন আয়োগের (Commissions) পুনর্গঠন যেখানে শুধু ইচ্ছুক উঁচু জাতের মানুষের স্থান গ্রাহ্য হবে।"

৯. ইউরোপিয়ান আধিকারিকের ভারতীয় নীচ জাতের মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা সংশোধিত হয় ১৮৫৯ সালে যখন ভারত সচিব তাঁর প্রতিবেদন জনশিক্ষার গুরুত্বে সরকারের দায়িত্বের উল্লেখ করলেন।

১০. জনশিক্ষায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির দায়িত্বের স্বীকৃতি সরকারের পক্ষ থেকে শুধু কথার কথাই থেকে গেল। কারণ যদিও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তবুও সেগুলিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভর্তির ব্যাপারে কোনও সমাধান পাওয়া গেল না। এই সমস্যা নজরে এল ১৮৫৬ সালে। কিন্তু তার সমাধানে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুকূলে ছিল না। ১৮৫৬-৫৭ সালে দেওয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জনশিক্ষা অধিকর্তার প্রতিবেদনের সারাংশই তার প্রমাণ।

"পরিচ্ছেদ ১৭৭ :—নীচ জাত এবং জংলি উপজাতিদের বিদ্যালয়—এদেশে এরকম কোনও সরকার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় নেই বা এমন কোনও বিদ্যালয়ের অনুমতি সর্বোচ্চ সরকার বাহাদুরও দেননি, সরকারি সাধারণ বিদ্যালয়গুলিই সাধারণভাবে প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত। আমার ১৮৫৫-৫৬ সালের ভিত্তিতে রচিত প্রতিবেদনের নিরিখে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করেন :— "সরকারের কাছে এ পর্যন্ত একটিই অভিযোগ জমা পড়েছে। মাহার সম্প্রদায়ের একজন ছাত্রের তরফে করা সেই অভিযোগে জানা যাচ্ছে যে, সে ধারওয়ার সরকারি বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার তার জন্য রুদ্ধ হয়েছে যদিও সে বিদ্যালয়ের দেয় অর্থ দিয়েই ভর্তি হতে রাজী ছিল। অভিযোগটি জমা পড়ে ১৮৫৬ সালের জুন মাসে।

"এই অভিযোগের নিরিখে সরকার এক বৃহৎ বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হল। গণশিক্ষা দেবার প্রয়োজনেই সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তর তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেই জনগণশিক্ষার কাজে গিয়ে দেখা গেল জনগণের একাংশের প্রবল বিরোধিতা। ধাক্কা গেল দৃঢ় বিশ্বাস। তবুও স্থির হল, এবং এই ব্যাপারে * প্রস্তাবও নেওয়া হল যে মাহার ছাত্রটির অভিযোগ যদিও দৃষ্টি আকর্ষণী তবুও যে বিদ্যালয়ে শুধু বর্ণহিন্দু ছাত্ররাই শিক্ষা নিচ্ছে সেই বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্য জাতের ছেলেটিকে ঢুকিয়ে দিলে সামাজিক সাম্যের বদলে সামাজিক ব্যবস্থায় সামাজিক অস্থিরতাই ডেকে আনা হবে এবং গণশিক্ষার মাত্রাই নষ্ট হয়ে যাবে।"

বোম্বাইয়ের সরকারের এই ক্রিয়াকলাপ ভারত সরকারের নজরে আসে। ১৮৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ১১১ নম্বর চিঠিতেই তার প্রমাণ :—

"সপার্ষদ বড়লাট মনে করেন যে বোম্বাই সরকার সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে ; কিন্তু একইসঙ্গে আমার (অর্থাৎ ভারতসচিবের) মনে হয় ঐ ছেলেটিকে বঞ্চিত না

---

* ১৮৫৬ সালের ২১ জুলাই সরকারি প্রস্তাবের মূল বক্তব্য :—

১। প্রশ্নটি একটি খুব বড় বাস্তব সমস্যা।

২। কোনও সন্দেহ নেই যে, মাহার ছাত্রটির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। সরকার মনে করে যে সামাজিক সংস্কারের জন্য তার শিক্ষার দরজায় গিয়েও ফিরে আসতে হল, তার অবিলম্বে বিনাশ প্রয়োজন।

৩। কিন্তু সরকার মনে করে বহু যুগ ধরে লালিত একটি সংস্কার ঝটিতি একজন দুজনের জন্য ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। হলে শিক্ষার বিস্তারে নৈরাজ্য চলে আসবে। এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই এ ব্যাপারে সংযম দেখানো হচ্ছে।

করে তার শিক্ষার ব্যবস্থা বাংলা প্রেসিডেন্সির কোনও সরকারি বিদ্যালয়ে করা যেতে পারে''*

এই পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভারত সরকারকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হবে যে বোম্বে সরকার জাতপাত মেনে শিক্ষার বিভাজন করে নি। কিন্তু সামাজিক ভেদাভেদ এই সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গায়ে যাতে কোনও কালিমার ছাপ না পড়ে এবং ফলত গণ শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়ে সেদিকে নজর রাখাটাও জরুরি। আর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, বাংলায় সরকারি বিদ্যালয় পরিচালনার থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হবে। তথ্য সংগ্রহে দেখা যাচ্ছে বাংলায় সরকার ভারত সরকারের গৃহীত আদর্শের বাইরে গিয়ে স্ব-প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা জেলা শিক্ষা পরিচালন সমিতির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ সরকারি বিদ্যালয়ে নীচ জাতের ছেলেরা ভর্তি হবে কিনা সেটি ঠিক করবে জেলা শিক্ষা পরিচালন সমিতি। এর ফলে দেখা যাচ্ছে সরকার আমজনতার শিক্ষার জন্য যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছে সেই প্রদীপের পালে অস্পৃশ্যদের ঠাঁই হচ্ছে না।

১২. এই পরিস্থিতি ১৮৫৪ সালের পাঠানো প্রতিবেদনে যা ভাবা হয়েছিল সেই ভাবনাসুরি শিক্ষাব্যবস্থা অস্পৃশ্য ছাড়া বাকী সবাইয়ের জন্য লাগু হল। যদিও ১৮৫৪ সালে নীচ জাতের জন্য শিক্ষার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল তবুও সেটি শুধু কথার কথাই হয়ে রইল। বাস্তবে সামাজিক চাপে নিষেধাজ্ঞা থেকেই গেল।

নীচ বা অস্পৃশ্য জাতের শিক্ষার ভার রয়ে গেল একমাত্র খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের হাতে। 'একা কুম্ভ' হয়ে তারা নীচ জাতের মধ্যেই তাদের সেরা ছাত্রসম্ভার খুঁজে পেল। কিন্তু সরকার যেহেতু ঘোষণা করেছিল ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে অতএব এইসমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ সরকারের পক্ষ থেকে হল না। যদিও ১৮৫৪ সালের প্রতিবেদনে কিন্তু বরাদ্দের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

পরিচালকমণ্ডলী তাদের ৫৮ নম্বর প্রতিবেদনে এই বিষয়ে যে আদেশ দিয়েছেন তার বয়ান নিম্নরূপ. :—

"সরকারি বিদ্যালয়গুলি জাতপাত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই উন্মুক্ত থাকবে। এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত লাগু রাখাটাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদনে যদি কিছু ছাত্র বাদ পড়ে তবে সেটুকু গ্রাহ্য হবে। আর যারা এই প্রাথমিক কর্তব্য প্রয়োগে বাধা দেবে তারা আলাদা বিদ্যালয় স্থাপনে অর্থব্যয় করতে পারেন।"

১৩. আমজনতার শিক্ষাব্যবস্থায় অতএব সৃষ্টি হল এক অচলবস্থা। এই অচলাবস্থা কাটাতে সরকারের তরফে দুটি ব্যবস্থা নেওয়া হল। (১) নীচ জাতের ছেলেদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনা এবং (২) সহায়ক অনুদান আইনের খানিকটা শৈথিল্য ঘটিয়ে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকের উৎসাহদান। এই দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনুন্নত শ্রেণী শিক্ষাদীক্ষার মোটেই এগোতে পারত না। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের বয়ানে এই তথ্যেই সত্যের স্বীকৃতি আসে।

III—১৮৮২ থেকে ১৯২৩

১৪. বোম্বে প্রেসিডেন্সির শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে ১৮৮২ সালের মতো ১৯২৩ সালও আরও একটি বিখ্যাত ঘটনার সাক্ষী। ১৯২৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রাদেশিক সরকারের হাত থেকে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সমিতিসমূহের হাতে ন্যস্ত হয়। কজেই সেইসময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা একনজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে।—

*জনরাশির শ্রেণীবিন্যাস	জনসংখ্যার নিরিখে বিন্যাস	শিক্ষার নিরিখে বিন্যাস		
		প্রাথমিক	মাধ্যমিক	প্রাক-স্নাতক
উচ্চতর হিন্দু	৪র্থ	১ম	১ম	১ম
মধ্যবর্তী হিন্দু	১ম	৩য়	৩য়	৩য়
পশ্চাৎপদ হিন্দু	২য়	৪র্থ	৪র্থ	৪র্থ
মুসলমান	৩য়	২য়	২য়	২য়

১৫. এই তালিকাই বলে দিচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির বৈষম্য। "মধ্যবর্তী হিন্দুরা" জনসংখ্যার বিচারে প্রথম হলেও স্নাতক মাধ্যমিক বা প্রাথমিক শিক্ষার বিচারে সব ক্ষেত্রেই তাদের স্থান তৃতীয়। অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা জনসংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও শিক্ষার সর্বস্তরে তাদের স্থান চতুর্থ বা শেষে। মুসলমানেরা জনসংখ্যায় তৃতীয় স্থানে, স্নাতক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক সব জায়গায় তাদের স্থান দ্বিতীয় আর

* বোম্বাই সরকারের শিক্ষা দফতর জনসংখ্যার শ্রেণীবিভাজন এইরকম বিভাগীয়করণ করেছিল। এই বিভাজনে ব্রাহ্মণ বা ঐ জাতের মানুষজনকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল "উচ্চতর হিন্দু" মারাঠা এবং ঐ জাতীয় দলকে বলা হল "মধ্যবর্তী হিন্দু"। বাকী থাকল অনুন্নত শ্রেণীর-পাহাড়ি উপজাত এবং অপরাধপ্রবণ উপজাত। একসঙ্গে তারা হল 'পশ্চাদ্‌পদ হিন্দু'। এই তিন শ্রেণীর সঙ্গে যোগ করা হল আরও একটি শ্রেণী। তারা হল এই প্রেসিডেন্সির এবং সিন্ধুর মুসলমানরা। এদেরকেই ফেলা হল চতুর্থ শ্রেণীতে।

"উচ্চতর হিন্দুরা জনসংখ্যায় চতুর্থ স্থানে থাকলেও বাকি সব ক্ষেত্রেই তাদের স্থান এক নম্বরে। এই সামগ্রিক বিচারে আমরা বলতেই পারি ১৮৮২ সালের তুলনায় অবস্থার উন্নতি ঘটেনি।

১৬. বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জনশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার ১৯২৩-২৪ সালের ভিত্তিতে দেওয়া ওপরের তালিকা থেকেই স্পষ্ট শিক্ষাবিকাশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য। এখন আমাদের জানতে হবে এই বৈষম্যের মাত্রা। নাহলে চিত্র স্পষ্ট হবে না। নিচের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

তালিকা

জনরাশির শ্রেণীবিন্যাস	প্রাথমিক শিক্ষা ছাত্রসংখ্যা প্রতি হাজার	মাধ্যমিক শিক্ষা ছাত্রসংখ্যা প্রতি লক্ষে	স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা ছাত্র সংখ্যা প্রতি ২ লক্ষে
উচ্চতর হিন্দু	১১৯	৩,০০০	১,০০০
মুসলমান	৯২	৫০০	৫২
মধ্যবর্তী হিন্দু	৩৮	১৪০	২৪
পশ্চাদপদ হিন্দু	১৮	১৪	শূন্য (বা খুব বেশি হলে একজন)

১৭. ওপরের তালিকাই বলে দিচ্ছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরে শিক্ষায় একটি জনগোষ্ঠীর থেকে আর একটি জনগোষ্ঠী কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে রয়েছে, কি অসীম বৈষম্য রয়ে গেছে শিক্ষায়। পরিসংখ্যানটি তর্কাতীতভাবে দুটি জিনিস ব্যক্ত করছে। (১) এই প্রেসিডেন্সিতে অনুন্নত শ্রেণীর পড়াশোনার মান শোচনীয় সংখ্যার বিচারে তারা সমগ্র জনরাশির মধ্যে এক নম্বর বা দুই নম্বর জায়গা দখল করে আছে কিন্তু শিক্ষায় তাদের স্থান শুধু সর্বশেষ নয়, নগণ্যও বটে। (২) প্রেসিডেন্সির মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে পদক্ষেপ বৃহৎ। মাত্র ৩০ বছরের ব্যপ্তিতে তারা শুধু মধ্যবর্তী বা পশ্চাৎপদ হিন্দুদের থেকে এগিয়েই যায়নি, উচ্চতর হিন্দুদের কাছাকাছি চলে গেছে।

১৮. এর কারণ কি? কারণ খুঁজতে গিয়ে সেই উত্তর মেলে সরকারের সৃষ্ট

বৈষম্য। এই বৈষম্যের রূপ পাওয়া যায় শিক্ষার ওপর পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনের সারাংশ পাঠে যেখানে মুসলমানদের শিক্ষা নিয়েও আলোকপাত করা আছে।

"মুসলমানদের পড়াশোনার ব্যাপারে পরিচালন অধিকর্তার মতামত যে "প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য মুসলমানদের শিক্ষার মান বাড়েনি যদিও বাড়া উচিত ছিল ...... মুসলমানরা যে জনশিক্ষায় জনগণের অন্য অংশের থেকে এগিয়ে আছে এ সত্য স্বীকৃত। তাদের শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য তিনি লিখলেন :—

"প্রথম পদক্ষেপে ও প্রত্যেক জেলায় একজন করে উপ পরিদর্শক বা সহ উপ পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। কয়রা, সোলাপুর এবং হায়দ্রাবাদে একজন করে স্নাতক উপ-পরিদর্শক। চতুর্থ একজনকে আমরা পেতে চলেছি রাজস্ব বিভাগে। এইভাবে জেলার জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত শাসন ব্যবস্থা হবে না এমন একটি জেলাও থাকবে না। এছাড়াও বোম্বাই, করাচি এবং কাথিয়াওয়াড় মুসলিম প্রদেশ জুনাগড়ে মুসলমানদের উচ্চ বিদ্যালয় খোলার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যেখানে বিদ্যাশিক্ষার খরচ নামমাত্র, নিম্ন বিদ্যালয় খোলা হয়েছে মুসলমানদেরই একটি শাখা আন্‌জুমান গোষ্ঠীর জন্য। তাদের জন্য শিক্ষার বিশেষ মান বজায় রাখা ছাড়াও প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক পর্ষদের এক তৃতীয়াংশ বৃত্তিও তাদের সুবিধার্থে বরাদ্দ হয়েছে। একদা বরোদার দেওয়ান খান বাহাদুর কাজি সাহাবুদ্দিন তাদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। সিন্ধে কলা মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত বিদ্যার্থীদের জন্য দেশীয় রাজ্য খয়েরপুরের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলমানেরা খরচের ব্যাপারে একটা সুবিধা পায়। হাতে কলমে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানেরা যাতে বেশি সংখ্যায় আসে সেইজন্য তাদের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি হিন্দুদের তুলনায় সহজতর করা হয়েছে। বোম্বাইতে মুসলমানদের শিক্ষায় আকর্ষণের জন্য যুক্ত বিদ্যালয় কমিটি একজন মুসলমানদের উপ পরিদর্শক নিয়োগ করেছে।

১৯. এরই সঙ্গে তুলনা করা যাক অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনের (১৯০২-১৯০৭) :

"৯৫৯ বোম্বাই—বোম্বাইয়ের মধ্য বিভাগে নীচজাতের শিশুরা নিখরচায় বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, সঙ্গে উপহার হিসেবে পাচ্ছে বই, স্লেট ইত্যাদি .....কাথিয়াওয়াড়ে অনুন্নত শ্রেণীর মাত্র তিনটি শিশু শিক্ষালাভ করছে। দক্ষিণ বিভাগে ৭২টি বিশেষ বিদ্যালয়ে আবশ্যকীয় গুণের অভাব আছে এমন শিক্ষকের অধীনে তাদের শিক্ষা চলছে।

২০. ব্যবহারিক এই বৈষম্যের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে হান্টার কমিশনের সুপারিশে। হান্টার কমিশন মুসলমানদের প্রতি কেমন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ছিল সেটির স্বরূপ পাওয়া যায় এই কমিশনেরই অনুন্নত শ্রেণীর জন্য করা সুপারিশের তুলনায়। মুসলমানদের কমিশন সতেরোটি সুপারিশ করেছে যার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রনিধানযোগ্য।

(১) মুসলমানদের শিক্ষাদান স্থানীয় পৌর প্রাদেশিক সমস্ত দিক থেকে বৈধ্য দায় হিসেবেই স্বীকৃত হোক (৭) শিক্ষার মধ্যে সেরা শিক্ষা উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হোক। (৮) ধাপে ধাপে মুসলমানদের জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক। এই বৃত্তি শুরু করা যেতে পারে (ক) প্রাথমিক স্তরে, টেনে নেওয়া যেতে পারে মধ্যম স্তর অবধি, (খ) মধ্যম স্তরে সেখান থেকে উচ্চ স্তর অবধি, (গ) প্রবেশিক (Matriculation) পরীক্ষায় ফলের ভিত্তিতে মহাবিদ্যালয় অবধি।

(৯) বিদ্যালয়গুলি জনগণের অর্থে পুষ্ট হলেও মুসলমানদের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যয়নিরপেক্ষ হবে।

(১০) সরকারি ব্যবস্থাপনায় মুসমানদের জন্য উৎসর্গীকৃত কিছু অর্থ প্রদেয় হবে।

(১১) যেখানে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের শিক্ষা চালু আছে সেখানেও ইংরাজি শেখানোর সরকারি তরফে অনুদান চালু হওয়া দরকার।

(১২) যেখানে প্রয়োজন সেখানে মুসলমান শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি চালু হবে।

(১৬) মুসলমানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজে এবার থেকে মুসলমানদেরই বেশি বেশি নিয়োগ করা হবে।

(১৭) মুসলমানদের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেকার তুলনায় স্থানীয় সরকারকে মুসলমানদের দিকেই বেশি নজর দিতে বলা হবে।

২১. এই সমস্ত সুপারিশের শব্দনিচয় অনুন্নত শ্রেণীর জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণীর বৃত্তির নেই কোনও ব্যবস্থা নেই তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও বিশেষ পরিদর্শকের। তাহলে জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে গেল শুধু লিখিত দুটি নীতিতে—(১) সরকারি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের দরজা জাতবর্ণধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য খোলা থাকবে এবং এই নীতি পালিত হবে প্রতিটি স্থানীয় প্রাদেশিক বা পৌর এলাকায়, (২) নীচ জাতের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় বা

বিশেষ শ্রেণীর বন্দোবস্ত শুধু চালু থাকবে তাই নয়, এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হবে। বলা হল "মুসলমানদের জন্য কমিশনের সুপারিশ শুধু মুসলমানদের স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় তা নয়, এর আরও বেশি করে প্রয়োজন অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থে।" এমন কি এমন যে হান্টার কমিশন যার সভাপতির মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য সহানুভূতি ছিল, সেই কমিশনও স্বীকার করে কেবল উচ্চশিক্ষা ছাড়া অন্যান্য স্তরে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার ছবিটা একটু অতিরঞ্জিত করেই দেখানো হয়েছে, এতৎসত্ত্বেও অনুন্নত শ্রেণীর ঐ দুটির নীতির স্বীকৃতি কমিশনের সুপারিশে দেখা যাচ্ছে আছে যদিও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ প্রায় শূন্যগামী। এই নীতিগুলির পুনর্স্বীকৃতি অপ্রয়োজনীয়। কারণ দেখা যাচ্ছে কমিশনের অনুবিধির বলবৎকরণ বাস্তবে প্রায় শূন্য। একইভাবে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আলাদা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা খাতা কলমের বাইরে এল না। কাজেই এখানেও প্রয়োগিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ। আলাদা বিদ্যালয় খোলার খরচও সরকারের কাছে বাহুল্য বলে মনে হল যদিও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন সেখানেই করা হবে ঠিক হল যেখানে অনুন্নত শ্রেণীর লোকজনের সংখ্যা বেশি কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখা গেল যে, গ্রামে-গঞ্জে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের বসবাস কোথাও ঘন নয়। তারা আছে, কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

২২. মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে হান্টার কমিশন যখন এতটাই উদার ছিল, তখন অনুন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে তার ঔদার্যের ঘাটতি কেন হল সেটি বোঝা গেল না। বিশেষ করে অনুন্নত শ্রেণী শিক্ষায় সম্পদে সামাজিক মর্যাদায় মুসলমানদের তুলনায় অনেক পিছিয়েই ছিল আর হান্টার কমিশন সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে যখন পেছনের সারিতেই রেখে দিল তখন তারা সেখানেই রয়ে গেল আর সরকারও তাদেরকে আর সামনে আনার কোনও চেষ্টা করল না, এ ব্যাপারে ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের ১৯২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির প্রস্তাবের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে। ভারত সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল শিক্ষাখাতে প্রাদেশিক রাজ্যগুলিকে জাতীয় রাজস্ব থেকে যখন যেমন টাকা পাওয়া যাবে তখন তেমন সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি। এই প্রস্তাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে এদেশে "নিবেশিত লোকগোষ্ঠীর এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে। কিন্তু গোটা প্রস্তাবটিতে অনুন্নত শ্রেণীর কোনও স্থান ছিল না। তাদের জন্য একটি শব্দও খরচা হয়নি। বোম্বে সরকার ঝটিতি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯১৩

সালেই মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারের স্বার্থে একজন মুসলমান ব্যক্তি নিয়োগ করে একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই সরকারের এই ব্যবহারে যে কোনও ব্যক্তি মনে করতে পারে যে এটি, এই উপেক্ষা, অপরাধের পর্যায়ে পড়ে বিশেষ করে সর্বশক্তিমান মহানুভব রাজ রাজেশ্বর ভারত সম্রাট।

মহামান্য সম্রাট যখন শিক্ষাবিস্তারের ঘোষণা করেছেন এবং সেই মোতাবেক ১৯১৩ সালের পরস্পর শিক্ষাখাতে মোটা অনুদান দেওয়া শুর হল। ঐ সালে ৬ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জবাবি ভাষণে ভারত সম্রাট বললেন :—

> "এই ভূভাগে বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক এই আমার বাসনা। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই আগামী দিনে পুরুষকারের নির্ভরশীল কাজের এবং রাজশক্তির প্রতি অনুগত নাগরিক তৈরি করবে যারা শিল্প বা কৃষি বা অন্য পেশায় দক্ষতার সঙ্গে কর্মে লিপ্ত থাকবে। আমি আশা করি তারা সুন্দর স্বাস্থ্য, সজীব পরিবেশ এবং সচেতন চিন্তা নিয়ে জীবন নির্বাহ করবে আর এই করার জন্যই দরকার শিক্ষা। অতএব ভারতবর্ষে শিক্ষার সংস্থান আমার হৃদয় বাসনা পূর্ণ করবে।"

IV

ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সামাজিক সংস্কারের রূপটি কিরকম?

রাজা স্যার টি. মাধবরাও নামের এক উজ্জ্বল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের ভাষ্যে এর রূপ :—

"একজন যত বেশি বাঁচবে, তত বেশি দেখবে, তত বেশি ভাববে আর তত বেশি বুঝবে এই ভূগোলকে হিন্দু নামের জাতি গোষ্ঠী যত না রাষ্ট্রনৈতিক তার থেকে অনেক বেশি নিজ সৃষ্ট পরিত্যাজ্য অথচ স্বেচ্ছাহূত এবং স্বেচ্ছাদৃত সমস্যা নিয়ে জর্জরিত।"

বিচারের তুলনা ব্যতিরেকেই বলা যায় হিন্দু সমাজ সবচেয়ে বেশি ব্যধিগ্রস্ত।

মহাদেও গোবিন্দ রানাডে নামে আর একজন শ্রদ্ধেয় সমাজ সংস্কারকও হিন্দু সমাজের আর একটি দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন :—

> "আমাদের সামাজের মতো প্রথা আর প্রভুত্বের দাস এক সমাজের সংস্কার করতে গেলে তার বাঞ্ছনীয়তা বা প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশ বাহুল্য

মাত্র। এই সমাজের মানুষজন মনে করে সামাজিক প্রথাগুলি অত্যন্ত অনিষ্টকর। তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে কিছু কিছু সামাজিক প্রথা অত্যন্ত- ক্ষতিকারক কিন্তু এই অনিষ্টর ব্যপ্তি সাময়িক বলে তারা মনে করে, একই সঙ্গে তাদের মতে গোঁড়া সমাজ তাদের জীবন হারায়।"

অন্যভাবে বলতে সমাজের অনিষ্ট ধর্মপ্রসূত। একজন হিন্দু নারী বা পুরুষের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম ধর্মানুষঙ্গিক সে ধর্মের জাতক, সে খাদ্য গ্রহণ করে ধর্মের নামে, সে স্নান করে ধার্মিকের স্নান, তার পানীয় গ্রহণে থাকে ধর্মের নির্দেশে তার পোশাক পরিধানেও থাকে ধর্মের আচার, ধর্মের আহুতিতে তার বিবাহ জীবন এবং মৃত্যু। ধর্মের এই বাড়াবাড়ি ধর্মনিরপেক্ষ চোখে দোষের হলেও হিন্দুর কাছে এটিই আবশ্যিক। তাকে যদি পাপের কথা বলা হয় তবে সে বলবে আমি পাপ করি তবে সে পাপে ধর্মের সায় আছে।

সমাজ সবসময়েই রক্ষণশীল। ধাক্কা না দিলে এটি পাল্টায় না আর তাও খুব ধীরে। পাল্টানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া মানেই লড়াইয়ের শুরু। এই লড়াই পুরনো আর নতুনের মধ্যে, যেখানে নতুন মুছে যাবে তার বিপদ সবসময়ই যদি না যথেষ্ট সমর্থন তার পেছনে থাকে। একটি সংস্কার সমাজে কায়েম করার একটি নিশ্চিত উপায় হল আইনের নির্ভরতা। আইনের প্রণয়ন ছাড়া শয়তান শাষিত/দুষ্ট ক্ষতের সমাজের সংস্কার অসম্ভব বিশেষ করে সেই সমাজের যেখানে ধর্মের শাসন কঠোর।

ব্রিটিশ সরকারের আমলে সমাজ সংস্কারের জন্য মোট কটি আইন প্রণয়ন হয়েছে? সংখ্যাটি কিন্তু হতাশাদায়ক। ১৫০ বছরের শাসনে মাত্র ছটি সমাজের ক্ষতি আইন শাসনে এসেছে। থমকে যাওয়ার মতো চিত্র।

সামাজিক সংস্কারের প্রথম আইনটি প্রণীত হয় ১৭৯৫ সালে একবিংশ বঙ্গ প্রবিধানে (Bengal Regulation XXI of 1795) এই প্রবিধান অনুযায়ী বেনারসের বাহ্মণদের কূরহা করা অর্থাৎ আত্মীয়া বা নারীশিশু জখম বা খতম করা হল। প্রণীত আইনের ভাষা ছিল এইরকম :—

প্রস্তাবনা

১. ব্রাহ্মণদের প্রতি হিন্দুসমাজের অতিপ্রাকৃত শ্রদ্ধা খুব ভাল করে নজর করলে বোঝা যাবে যে শ্রদ্ধা মৃত্যুভয় থেকে উৎসারিত অর্থাৎ শ্রদ্ধার অভাব মৃত্যু ডেকে

আনবে, সেই শ্রদ্ধা সাধারণ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। বারানসী প্রদেশের কতগুলি কুপ্রথা বিশেষ করে কুন্তিত/কুন্টিট এবং বুধো পরগণায় চালু কূর প্রথা এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, পেতে পেতে অভ্যস্ত সমাজের ব্রাহ্মণশ্রেণী তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে এই প্রথার আশ্রয় নেয় গ্রামের কোনও এক জায়গায় এক লক্ষ্মণরেখা টানে। তার মধ্যে অধিষ্ঠান করে কোনও এক ব্রাহ্মণ তার প্রাপ্যের দাবি জানায় হাতে নেয় ছোরা বা লোকদেখানো বিষের পাত্র। গ্রামবাসীরা তার প্রাপ্য না দিলে ব্রহ্মহত্যায় অভিযুক্ত হবে। এই পদ্ধতির আর একটু ওপরের মাত্রা হল এই কূরের মধ্যে ঐ বাহ্মণ চিতা সাজায়। এই চিতা নকল নয়, আসল। এবং একজন গ্রামীণ মহিলাকে ঐ চিতায় তোলে। প্রাপ্য না পাওয়া ব্রাহ্মণের জন্য ঐ মহিলার আত্মাহুতি হয়। অনেক সময় ইচ্ছুক মহিলা পাওয়া যায়। এইসব মহিলারা ইচ্ছামৃত্যু কেন মেনে নেয়? কারণ পরের জন্মে যেন তারা এ জন্মের অত্যাচারীর অত্যাচারী হতে পারে এই তাদের বাসনা। সমাজে ব্রাহ্মণদের লোভ এতই তীব্র হয়ে দেখা যেত যে, এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন সরকারি আধিকারিকেরা এই কূর বন্ধ করতে অগ্রসর হয়েছে তখন বাহ্মণরা এমন কি তাদের নিজ ঘরের মেয়েদের বর্ম হিসাবে ব্যবহার করেছে, দরকার পড়লে সেই আধিকারিকদের সেই মেয়েটিকে মেরেও ফেলেছে, নিজের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, আঘাতে আহত করেছে নিজেকে।

ব্রাহ্মণদের লোভ মেটাবার আর প্রথা চালু ছিল। সেটি হল ধরণা এখানেও উদ্দেশ্য একই লোভের আগুন নেভানো। পদ্ধতি অন্য, একটি ব্রাহ্মণ কোনও একটি বাড়ি বেছে নিয়ে সেই বাড়ির দরজায় ধর্ণায় বসত। অভিনয়টা ছিল আমরণ অনশনের। অবস্থানের সময়টুকু বাড়িতে প্রবেশ এবং বাড়ি থেকে নিষ্কাষণ অসম্ভব ছিল। দরজায় তথাকথিত অভুক্ত বাহ্মণ অতএব সমাজের ভয়ে গৃহস্বামীও অভুক্ত থাকতেন। এইসব ব্রাহ্মণেরা নিজেদের খতম করার অভিনয় করত। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে কেউই মরত না বড়জোর নিজেকে আহত করত মাত্র। এছাড়া জুয়ানপুর জেলার সীমান্তে রাজকুমার উপজাতিদের মধ্যে চালু ছিল আর এক জঘণ্য প্রথা—নারীশিশু নিধন, এই প্রথাসমূহ দূর করতে প্রণয়ন হয় এই আইনের।

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কূর রচনা বা তাদের শিশু বা নারীদের অঙ্গহানি বা ঐ জাতীয় আঘাত।

II. নগরের ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা আদালতের বিচারক কোনও একজন বাহ্মণ বা একাধিক বাহ্মণ সম্বন্ধে এমন কোনও অভিযোগ পান যে অভিযোগে জানা যায়

যে ঐ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণসকলের দ্বারা কোথাও কূর রচিত হচ্ছে বা তাদের শিশু বা মহিলারা অঙ্গহানি জাতীয় কোনও আঘাতে আহত হচ্ছে তবে নাগরিক ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা জজ ঐ এক বা একাধিক ব্রাহ্মণের নামে সমন জারি করতে পারেন। সমন হবে হয় পার্শী ভাষায় এবং লিপিতে বা সংস্কৃত ভাষায় নাগরি লিপিতে। এই সমনে থাকবে সরকারি মোহর। এই সমন যাবে অভিযুক্তের আত্মীয়স্বজনের মারফৎ। যদি আত্মীয়স্বজন না মেলে তবে পেয়াদা মারফৎ এই সমন ধরাতে হবে। পেয়াদাটি একই ধর্মের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সমনে অভিযুক্তদের প্রতি নির্দেশ থাকবে যে কূর রচনা বন্ধ করতে হবে এবং কূর রচনায় যাদের বলি করা হচ্ছে তাদেরকে বলি করা যাবে না। একই সঙ্গে অভিযুক্তদের আশ্বাস দেওয়া হবে যে তাদের কথাও শোনা হবে। প্রয়োজনে তারা আদালতে তাদের বক্তব্য উকিলের মাধ্যমে জানাতে পারে। কিন্তু অভিযুক্ত বা তার স্বজনেরা যদি সমনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তবে উপরিউক্ত আধিকারিকেরা অভিযুক্তের নামে নিজ-নিজ দপ্তর মোহর (Office Seal) সহ পরওয়ানা জারি করবেন, এবং এই পরওয়ানা নিয়ে যাবে মুসলমান পেয়াদা। পরওয়ানা যাদের নামে জারি করা হল সেইসমস্ত বিচার চলাকালীন জামিনে মুক্ত থাকবে না জেলে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন ১৭৯৩ সালের নবম প্রবিধানের ৫নং বিভাগ (Section 5, Regulation IX 1793) অনুযায়ী আদালত নিজে।

উল্লিখিত অপরাধের জন্য বিচার পদ্ধতি এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি।

III. নির্দিষ্ট আদালত যদি কোনও ব্যক্তিকে কূর রচনা বা নারী বা শিশুকে হত্যা করা বা হত্যার নিমিত্ত চেষ্টা করায় প্রত্যক্ষ অপরাধী সাব্যস্ত করে তবে তার ক্ষেত্রে শাস্তি ধার্য করবে অভিযুক্তের এক বছরের আয়ের সমপরিমাণ অর্থ। আর সহযোগী অপরাধীর ক্ষেত্রে শাস্তি তার বাৎসরিক আয়ের এক চতুর্থাংশ জরিমানা বাবদ। আর এই অর্থ অভিযুক্তরা মেটাবে হাজত বাস করতে করতে।

নিজামুৎ আদালতের হাতে শাস্তি মকুবের ক্ষমতা

IV. সমস্ত রায় তা সে শাস্তি হোক বা না হোক চালু হয়ে যাবে যদিও দশদিনের মধ্যে রায়ের বয়ান নিজামের আদালতে (Nizamut Adawlut) চলে যাবে যে আদালত এই আদালত কৃত শাস্তি কমিয়ে দিতে পারে বা নতুন শাস্তি আরোপ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী জারি পা্রোয়ানা এড়াতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ফেরার।

V. এসব ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২ ধারায় বলা আছে যে সব ব্রাহ্মণ ফেরার হয়েছে অর্থাৎ যাদেরকে পরোয়ানা ধরানো গেল না তাদের জমি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আদালত সংশ্লিষ্ট সমাহর্তাকে নির্দেশ দিতে পারে। এমন কি ঐ বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি অভিযোগকারীকে দিয়েও দিতে পারে।

অসম্পূর্ণ

□ □ □

অংশ-৩

I

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্তর্নিহিত নীতি

ডাইসির মতে তিনটি নীতির জন্য ব্রিটিশ সংবিধান অন্যান্য দেশের সংবিধান থেকে পৃথক। এই নীতিগুলি হল ঃ—

(১) সংসদে আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রাধান্য,

(২) আইনের শাসনের অস্তিত্ব,

(৩) প্রচলিত প্রথার ওপর সংবিধানের নির্ভরতা।

ঐই নীতিগুলির জন্য ব্রিটিশ সংবিধানে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এসেছে একথা জোর দিয়ে বলার ব্যাপারে দুটি ন্যায্য মন্তব্য করা যেতে পারে। এক অর্থে অন্যান্য সংবিধানে এগুলি পাওয়া যায় না। ডাইসী যখন এগুলি লিখেছিলেন তখন এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যতটা সঠিক বলে বলা যেত, এখন যাই হোক না কেন এগুলির কয়েকটিকে আর ততটা সঠিক বলা যায় না। যেমন পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রাধান্য ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ওয়েস্টমিনস্টার আইন পাশ হবার পর অনেকটা সংশোধিত ও সীমিত হয়েছে। দ্বিতীয় যে মন্তব্যটি অতি অবশ্য করা উচিত সেটি হল — এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে নিয়মের রাজত্ব এবং প্রথার ওপর সংবিধানের নির্ভরতা শুধুমাত্র ব্রিটিশ সংবিধানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রথাগুলি হল সব সংবিধানের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এক অর্থে আইনের রাজত্ব, সেটা যেভাবেই হোক না কেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বলবৎ আছে। সংবিধানের নীতিগুলিই এমনভাবে এবং এমন বিস্তৃতভাবে ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির রূপ নিয়েছে যেটা অন্যান্য সংবিধানে ভাবা যায় না, সেই অর্থে ব্রিটিশ সংবিধান অন্যান্য সংবিধানের থেকে স্বতন্ত্র।

(১) সংসদের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রাধান্য

ব্রিটিশ সংবিধানের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রথম শ্রেণীর বিদেশি ভাষ্যকারদের মধ্যে একজন হলেন হনটেস্কুই। তিনি ব্রিটিশ সংবিধানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, যে সময়ে তিনি লিখেছিলেন সে সময়ে ব্রিটিশ সংবিধানে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যেটি ফরাসী দেশের সংবিধানে নেই। তিনি দেখতে পান যে, ব্রিটিশ সংবিধানে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ নামে তিনটি অঙ্গ আছে। গঠনগত এবং কর্মগত দিক দিয়ে এই অঙ্গগুলি স্বতন্ত্র এবং একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তারা প্রত্যেকে তার নিজের কার্যাবলীর দ্বারা সীমিত এবং অন্যের এক্তিয়ারে কারোর হস্তক্ষেপ অনুমোদন অযোগ্য। তাঁর লেখার সময় যেসব স্বাধীনতা ইংরেজ নাগরিকরা ভোগ করত অথচ তাঁর নিজ দেশবাসীরা ভোগ করত না সেগুলি বিচার করে তিনি ব্রিটিশ সংবিধানের ওপর এই বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিলেন। ব্রিটিশ সংবিধানের নীতিগুলির গুণ দেখে তাঁর এতই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে তিনি এটিকে রাজনৈতিক সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি বলে গণ্য করার জন্য উপস্থাপন করেছিলেন এবং স্বদেশবাসীকে তাদের সংবিধানে এগুলি গ্রহণ করতে সুপারিশ করেছিলেন। হন্টেস্কুই ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন করার এই যে মতবাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সব সংবিধান রচিত হয়েছে। রাজনীতির এক ছাত্রের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য বিভিন্ন দেশ কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ এটা নিশ্চিত যে, হন্টেস্কুই ব্রিটিশ সংবিধানকে ভুল বুঝেছিলেন। ব্রিটিশ সংবিধানে অতি অবশ্যই ক্ষমতার বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করা হয়নি। মহামান্য রাজা একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন বিভাগের একটি অংশ, বিচার বিভাগের প্রধান এবং দেশের শাসন বিভাগের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। মন্ত্রীগণ, যাঁরা রাজার নামে দেশের সরকার পরিচালনা করেন, তাঁরাও পার্লামেন্টের সদস্য। সুতরাং শাসন বিভাগ ও আইন প্রণয়ন বিভাগের কোনও বিচ্ছিন্ন নয়। লর্ড চ্যান্সেলর বিচার বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। তিনি মন্ত্রীসভারও একজন সদস্য। সুতরাং শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগও বিচ্ছিন্ন নয়। ব্রিটিশ সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে শুধু যে কোনও বিচ্ছিন্নতা নেই তাই নয়, তাদের কর্তৃক সংবিধানের দ্বারা সীমিত—এই কথারও কোনও

ভিত্তি নেই। বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা ও তাদের কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়ে থাকে শুধুমাত্র এই কারণে যে, আমেরিকান সংবিধানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের কাজগুলি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ সংবিধানে আইন অনুযায়ী একটিই চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী, এবং সেটি হল পার্লামেন্ট। শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, পার্লামেন্টের কার্যাবলীও সীমাবদ্ধ। এটার একটাই অর্থ যে, পার্লামেন্ট কোন কোন বিভাগের ওপর সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট উপায়ে কিছু কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগের সীমাবদ্ধতার পরোক্ষ ফল স্বরূপ কোনও সীমাবদ্ধতা গড়ে ওঠেনা। অপর পক্ষে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব থেকেই এইসব সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি। এই সব সীমাবদ্ধতা বাড়ানো বা কমানোর জন্য পার্লামেন্ট তার হাতে কর্তৃত্ব রেখে দেয়।

আইন প্রণয়নে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত প্রাধান্য কথার অর্থ

আইন প্রণয়নে সংসদের চূড়ান্ত প্রাধান্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করতে হলে পার্লামেন্টে যে দুটি অংশ অতি অবশ্য থাকতে হবে তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রথমটি হল, ব্রিটিশ সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করার বা আইনকে বাতিল করার অধিকার আছে। ইংলন্ডের আইনে এটা স্বীকৃত যে, কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে পার্লামেন্টের পাশ করা আইন অগ্রাহ্য বা বাতিল করার অধিকার নেই, একথা স্মরণ করা বাহুল্য যে, পার্লামেন্ট ও আইনকে কঠোরভাবে আইনের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এটা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সংসদ বলতে একত্রে মহামান্য রাজা, লর্ড্‌সসভা এবং (সাধারণদের প্রতিনিধিদের কমসসভা) বোঝায় এবং তাদের কেউই সতন্ত্র ভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না, তারা একত্রে পার্লামেন্টের অধীন থেকে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে আইন কথাটি কঠোরভাবে আইন বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে বুঝতে হবে। যেসব বিধি আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা যায়, সেগুলিই হল আইন। আইন প্রণয়নে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত প্রাধান্য ধারণা বলতে কি বোঝায় বলার পরই আমরা প্রশ্ন করতে পারি পার্লামেন্টের যে এ আইন প্রণয়নের "চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে তার প্রমাণ কি?

যে সব আইনজ্ঞগণ ব্রিটিশ সংবিধান লিখেছেন, তাঁরা সবাই আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রাধান্য নীতি স্বীকার করেছেন। সংসদের ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার সম্বন্ধে

বলার সময় স্যার এডওয়ার্ড কোক একমত হয়েছেন যে, এটা এতই সীমাতিক্রান্ত এবং সার্বভৌম যে এটা কোনও কারণগুচ্ছের মধ্যে বা ব্যক্তিগুচ্ছের মধ্যে কোনও মতেই সীমাবদ্ধ করা যায় না।

(চার নম্বর বিষয়টি ছত্রিশ নম্বর পাতায় আছে)*

বিখ্যাত ভাষ্যের গ্রন্থকার ব্ল্যাকস্টোন একমত যে, "ধর্ম সংক্রান্ত বা পার্থিব, সামরিক, অসামরিক, সামুদ্রিক বা অপরাধী সংক্রান্ত সম্ভবপর সবরকম বিষয়ে আইন রচনা করতে, দৃঢ় করতে, পরিবর্ধিত করতে, নিয়ন্ত্রণ করতে, প্রত্যাহার করতে, পুনঃস্থাপন করতে, এবং ব্যাখ্যা করতে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য এবং সার্বভৌম এক কর্তৃত্ব আছে। যে অবাধ সার্বভৌম ক্ষমতা সব সরকারেরই কোনও না কোনও ভাবে অতি অবশ্য থাকা উচিত। রাষ্ট্রগুলির সংবিধান সেই ক্ষমতা এখানেই ন্যস্ত করেছে।" আইনের সাধারণ গতিপথে উদ্ভূত সবরকম ঝামেলা এবং নালিশ, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রতিকারগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়গুলি এই অসাধারণ ট্রাইবুন্যালের আওতায় রয়েছে। অষ্টম হেনরি এবং তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্বের সময় সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাও, যেমন অষ্টম হেনরী ও তৃতীয় উইলিয়ামের বেলায় হয়েছিল, পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দেশের প্রচলিত ধর্মও পার্লামেন্ট বদলাতে পারে, যেমন অষ্টম হেনরী ও তাঁর তিন সন্তানের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। আসল কথা হল, "যা পার্লামেন্ট করতে পারে তা পৃথিবীর আর কোনও কর্তৃপক্ষ করতে পারে না।"

ফরাসী আইনজ্ঞ ডেলোমি, কোক এবং ব্ল্যাকস্টোনের সঙ্গে একমত। তিনি মন্তব্য করেছেন, "পুরুষকে নারী এবং নারীকে পুরুষ করা ছাড়া পার্লামেন্ট আর সব কিছুই পারে।"

সংসদের এই চূড়ান্ত প্রাধান্য যেটা সব আইনজ্ঞই স্বীকার করেছেন সেটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাস থেকে পাওয়া অনেক নজির থেকে প্রমাণিত। কিন্তু নীচের বক্তব্যই এব্যাপারে যথেষ্ট।

(১) পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব এবং ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন—

স্কটল্যান্ড এবং আয়ার্ল্যান্ড নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন আইনগুলির প্রকৃতি অনেকটা বাচ্চাদের মধ্যে করা সন্ধি বা চুক্তির মতো। এগুলিতে এমন কিছু ধারা আছে যেগুলিকে তখন মৌলিক এবং ইউনিয়নের অপরিহার্য শর্ত বলে ধরা হত এবং

* "মূল লেখা অনুযায়ী ছাপানো হল, ছত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি।"- সম্পাদক—

মনে করা হত যেএগুলি গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্ট কর্তৃক উচ্ছেদযোগ্য নয়। স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ইউনিয়ন আইনের বিধান হল স্কট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অধ্যাপক স্বীকার করবেন, কবুল করবেন এবং সম্মতি দেবেন যে, অপরাধ স্বীকারের বিশ্বাসই তাদের পেশার বিশ্বাস। এটাই স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ইউনিয়ন চুক্তির মূল শর্ত বলে ধরা হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের স্কটল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এই বিশেষ ধারাটি বাতিল করে স্কচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ অধ্যাপকদের অপরাধ স্বীকার করার শর্ত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। আয়র্ল্যান্ডের সঙ্গে ইউনিয়ন আইনে শর্ত আছে।" বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী ইংলন্ড এবং আয়র্ল্যান্ডের চার্চগুলি একত্রিত হয়ে একটি প্রোটেস্ট্যান্ট এপিস্কোপাল চার্চ হবে এবং তার নাম হবে ইংল্যান্ড এবং আয়র্ল্যান্ডের মিলিত চার্চ। তাছাড়া ইংলন্ডের চার্চের জন্য এখন যেমন আইন আছে, মিলিত চার্চের মতবাদ, পূজা অর্চনা, নিয়ম শৃঙ্খলা এবং পরিচালনা ঠিক সেরকম থাকবে এবং চিরকালের জন্য কার্যকরী থাকবে। তাছাড়া ইংল্যান্ড এবং আয়র্ল্যান্ডের চার্চ হিসাবে উক্ত মিলিত চার্চে গণ্য হবে এবং তার সংরক্ষণ ও ধারাবাহিকতাকে ইউনিয়নের অপরিহার্য এবং মৌলিক অংশ বলে গণ্য করতে হবে।" আইনের এই ধারা থেকে এটা নিশ্চিত যে, পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রাধান্য সীমিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আইরিশ আইন পাশ করে পার্লামেন্ট আয়র্ল্যান্ডের চার্চ বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন কিন্তু পার্লামেন্টের এইসব আইন প্রণয়নের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না।

২. সেপ্টেনিয়াল (সপ্তবর্ষীয়) আইন, ১৭০৭ হল সংসদের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রাধান্যের আর এক উদাহরণ। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের আইনে পার্লামেন্টের মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত সীমিত ছিল। ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থাতে মহামান্য রাজা ও মন্ত্রিসভা উভয়েরই দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে রাষ্ট্র এবং মন্ত্রিসভা উভয়ের পক্ষে এই নতুন নির্বাচন ভয়ঙ্কর হবে। তাই সে সময়ের মন্ত্রিসভা সংসদকে বুঝিয়ে আইন পাশ করে সংসদের মেয়াদ তিন বছর থেকে বাড়িয়ে সাত বছর করেছিল। সাধারণদের সভা নির্বাচকদের প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বাস ভঙ্গের দোষে দুষ্ট বলে সমালোচিত হয়েছিল। এমনকি তাদের সমগোত্রীয়রাও এই প্রতিকারের সামিল হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, আইন তাদের নির্বাচিত সংসদের সদস্যরা যারা তাদের কর্তব্য পালনে অপারগ হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিকার নেওয়ার সুযোগ নেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এইসব রাজনৈতিক

সমালোচনার মুহূর্তে আইনগত গূঢ়ার্থ একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল। এই আইন যথাযথ কিনা এক প্রশ্ন, আর পার্লামেন্ট তার নিজের জীবনী অর্থাৎ মেয়াদ বাড়াতে পারে কিনা সেটা আর এক প্রশ্ন। এটা চিহ্নিত করা দরকার আইনটিকে যে ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এটিকে কখনও দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে না। প্রকৃত পক্ষে বিনা বিচারে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, সেপ্টেনিয়াল আইনটি সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে পড়ে।

সেপ্টেনিয়াল আইনের আর একটি বৈশিষ্ট্য নোট করা দরকার। কারণ এটি সংসদের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রাধান্য কতটা সেটা বোঝাতে সাহায্য করে। সংসদ সংসদের আয়ু বাড়াতে পারত এবং সম্ভবত কোনও প্রশ্ন উঠত না যদি ঐ আইন ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টের আয়ুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত। কিন্তু সেপ্টেনিয়াল আইন শুধুমাত্র ভবিষ্যতের সব সংসদগুলির আয়ু বাড়ায়নি যে পার্লামেন্ট এই আইন পাশ করছে সেই সংসদ তার নিজের আয়ু বাড়িয়ে নিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা বিনা অধিকারে, বল প্রয়োগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার একটা ঘটনা। যে সংসদ এই আইন পাশ করেছিল আইন তাকে এটা পাশ করার ক্ষমতা দেয়নি এবং একটা অভিপ্রেতও ছিল না। তবুও জোর করে ক্ষমতা নেওয়ার এই আইনও একটি আইনসঙ্গত কাজ। সংসদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রাধান্য থাকার অধিকারের নজির দেখাতে সেপ্টেনিয়াল আইন পর্যন্ত পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। গত যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) সময় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে চলতে থাকা সংসদ নিজেদের ভেঙে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের আয়ু বাড়িয়ে নিয়েছিল, তখনও আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রাধান্যের ক্ষমতা অনুরূপ ভাবে সংসদ প্রয়োগ করেছিল।

ক্ষতি বা শাস্তি অব্যাহতি সংক্রান্ত আইনগুলি অবিরত ঘটছে এবং এগুলি পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রাধান্যের কথা রূঢ়ভাবে মনে করিয়ে দেয়। ক্ষতি বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি সংক্রান্ত আইন হল এমন এক সংবিধি যেটা একক ব্যক্তিদের ওপর চাপানো শাস্তি থেকে তাদের মুক্তি এনে দেয়। এটাই সংসদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রাধান্যের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ, কারণ এখানে অবৈধ বিষয়ের মধ্যে বৈধতা ঢোকাচ্ছে, বেআইনি বিষয়কে আইন সম্মত করছে।

ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ

অধিকাংশ আইনসভা সাধারণভাবে জনসাধারণের অধিকার বিষয়ে নিয়ম-কানুন রচনার মধ্যে তাদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখে। ব্যক্তিগত অধিকার এবং পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংসদের হস্তক্ষেপ করার আগে তাকে হয় খুবই সতর্ক না হয় খুবই অলঙ্ঘনীয় এই ভেবে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সংসদ কখনও তার আইন প্রণয়নের এই অধিকারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেনি। ক্লারেন্স এবং ক্লোসেস্টারের ডিউকের জীবদ্দশায় সংসদ আইন পাশ করে ঘোষণা করেছিল যে, তাঁদের স্ত্রী এবং কন্যারা তাঁদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যাবে। বাকিংহামের ডিউকের ক্ষেত্রে তিনি শিশু ছিলেন, কিন্তু সংসদ একটি আইন পাশ করে ঘোষণা করেছিল যে, আইন সংক্রান্ত সব কাজে তিনি সাবালক বলে গণ্য হবেন। স্যার রবার্ট প্লেফিন্সটোন মারা গেলেও তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহীর অভিযোগে অভিযুক্ত করে একটি আইন পাশ করেছিল। উইন্‌চেস্টারের মার্কুইসের ব্যাপারটা হল এমন এক নজির, যেখানে একটি বৈধ সন্তানকে অবৈধ সন্তান বলে ঘোষণা করেছিল। এর বিপরীত উদাহরণও আছে। যেখানে বিয়ের আগে জন্মগ্রহণ করা অবৈধ সন্তানকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এটা হয়েছিল সংসদের আইন পাশ করে। ল্যাঙ্কেস্টারের ডিউক জন গ্যান্টের ঔরসে ক্যাথেরিন সুইকোর্ডের গর্ভে জাত সন্তানদের জন্য এটা করা হয়েছিল। ডিউককে বিয়ে করার আগে জনের দেওয়া ক্যাথেরিনের হেনরি, জন, থোমাস এবং একটি কন্যা নিয়ে চারটি অবৈধ সন্তান ছিল। মহামান্য রাজা সনদের আকারে পার্লামেন্টে আইন করে এই সন্তানদের বৈধ করেন। এই উদাহরণগুলি সংসদে আইনের মাধ্যমে শুধুমাত্র একক ব্যক্তির বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সংসদ যে সাধারণ আইনের গতিপথও বদলে দিতে পারে এগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

□ □ □

(২) সংসদ বলতে কি বুঝায়?

১. আজকাল অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে সংসদ বলতে বুঝায় কমন্‌স সভা। এর মধ্যে লর্ডস সভাকে ধরাই হয় না, এমনকি রাজাকেও অতি অবশ্যই এর মধ্যে ধরা হয় না। এই জনপ্রিয় ধারণার একটা বড় কারণ হল ইংলিশ সংবিধান কার্যকরী করতে কমন্‌স সভা সবচেয়ে প্রাধান্যমূলক উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এরকম একটা ধারণাকে যতই যুক্তিযুক্ত বলা হোক না কেন আইনের দৃষ্টিতে এই ধারণাটি ভ্রান্ত। আইনত সংসদ যে তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত সেগুলি হল রাজা, লর্ডস সভা এবং কমন্‌স সভা। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা মিলিতভাবে রাজা, লর্ডস সভা এবং কমন্‌স সভার উপরে ন্যস্ত। এই ক্ষমতা সংসদে অবস্থিত রাজার ওপর ন্যস্ত। অর্থাৎ রাজা অন্য দুই সভার সম্মতি নিয়েই এই কাজ করবেন।

বিধি অনুসারে প্রতিটি আইনকে রাষ্ট্রের আইন হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য রাজার পূর্ব সম্মতি অতি অবশ্য প্রয়োজন। সংসদে সংবিধানে রাজা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝা যায় যদি আমরা মনে রাখি যে, সংসদের দুটি সভা তাদের কাজকর্ম কেবলমাত্র তখনই করতে পারবে যখন রাজা ঐ দুই সভা ডাকবেন। এই দুই সভা নিজেদের চেষ্টায় এবং ক্ষমতায় বসতে পারবে না। এবং কোনও কাজ করতে পারবে না। রাজা কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন সেটা স্পষ্ট হবে যদি এটা আমররা স্মরণ করি যে, পার্লামেন্টের সভাগুলি আহবান করার, তাদের স্থগিদ রাখার বা সংসদকে ভেঙে দেবার অধিকার রাজার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং রাজা এই ক্ষমতা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনও সময়ে প্রয়োগ করতে পারেন। অপর পক্ষে এটা সাধারণ সত্য যে, সংসদের দুই সভার সম্মতি না নিয়ে যুক্ত রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন করার কোনও সহজাত ক্ষমতা রাজার নেই। রাজার প্রতিটি কাজকে আইনের রূপ দিতে হলে কমন্‌স সভা ও লর্ডস সভার সম্মতি অতি অবশ্যই নিতে হবে। অবশ্য আইনে স্পষ্ট করে এর কোনও বিপরীত ধারা থাকলে সেটা অন্য কথা।

২. আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা সংসদে অবস্থিত রাজার ওপর ন্যস্ত এবং রাজা লর্ডস সভা ও কমনসসভার মিলিত সম্মতি ছাড়া কোনও আইন প্রণয়ন করা যায় না বলে যে প্রতিজ্ঞাটি করা হয়েছে সেটি দুটি অপরিহার্য শর্ত সাপেক্ষ।

(১) রাজার ভেটো দেবার ক্ষমতা :— যদিও বিধি অনুসারে প্রস্তাবগুলি আইনের রূপ নেওয়ার আগে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজার সম্মতি প্রয়োজন তবুও তাঁর সম্মতি না দেওয়ার অর্থাৎ তাঁর ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা অপব্যবহারের ফলে অবাধ ক্ষমতার রূপ নিয়েছে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা জারির এই অধিকার খারিজ হয়ে যায় যেদিন থেকে রাণী অ্যান ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের স্কচমিলিসিয়া বিলে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করেন। রাজার এই ভেটো দানের ক্ষমতার হ্রাসকে কিন্তু একটি আইনগত ক্ষমতা হ্রাস বলা যায় না। আইন অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারির সবরকম নিঃশর্ত ক্ষমতা তাঁর আছে। এরকম নিরত হবার কারণ হল একটি—সম্মেলন ডেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, দুটি সভা একমত হলে তাতে রাজার অসম্মত হওয়া উচিত নয়। এই বিধির অপব্যাবহারের অর্থ এই নয় যে, এটিকে এমন ভাবে সমাহিত করা হয়েছে যে এটিকে আর পুনঃপ্রবর্তিত করা যাবে না। ধরা যাক কমনসসভায় একটি বিল পাস হবার পর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করল এবং নতুন মন্ত্রিসভার বাধা সত্ত্বেও লর্ডসসভা এই বিল পাস করার জন্য জিদ ধরল এক্ষেত্রে যদিও উভয় সভা আইন প্রণয়নে সম্মতি দিয়েছে তবুও রাজকীয় সম্মতি ঠেকিয়ে রাখা উচিত নয় — এই দাবি করাটা অসঙ্গত হবে।

(২) লর্ডস সভার ভেটো দানের ক্ষমতা ঃ— এক সময় লর্ডসসভা আইন প্রণয়নের একটি সমন্বিত ও সহ-সমান শাখা হিসাবে কাজ করত। তখন পার্লামেন্টের দ্বারা পাস করা আইনের রূপ নিতে হলে প্রতিটি প্রচেষ্টার জন্য যেমন কমনসসভার সম্মতির প্রয়োজন হত তেমনি লর্ডস সভার সম্মতিও দরকার হত। এটা আইনের কথা হলেও বাস্তবে আর্থিক বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কমন্সসভা নিজেদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আছে বলে ও অন্যান্য আইন প্রণয়ন ব্যাপারে প্রস্তাবগুলিকে বাতিল করার উচ্চতর কর্তৃত্ব তাদের আছে বলে দাবি করত।

১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে কমন্সসভা নিচের প্রস্তাবটি পাশ করেছিল :— "রাজাকে জনসাধারণ যতরকম সমর্থন দিয়েছে তার মধ্যে রাজস্বের হার সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে লর্ডসসভার পরিবর্তন বা সংশোধন করা উচিত নয়" ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কমন্সসভা নিচের মতো আর একটি প্রস্তাব নিয়েছিল : "সরবরাহ মঞ্জুর সংক্রান্ত বিলগুলি কমনসসভা থেকে অবশ্যই প্রথমে উত্থাপন করতে হবে এবং এটা কমন্সসভার সন্দেহতীত এবং স্বতন্ত্র অধিকার। এই সব বিল মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিলগুলির যে সব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, ধরন, সীমা এবং শর্ত

দেওয়া দরকার সেগুলি নির্ধারণ করতে বা তাদের সীমা বেঁধে দিতে কমন্সসভার একটা সন্দেহাতীত এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধিকার থাকবে এবং লর্ডসসভার এগুলি অবশ্যই পরিবর্তন বা সংশোধন করা উচিত নয়।"

আর্থিক নয় এমন সব সাধারণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কমনসসভা দাবি করেছিল যে, লর্ডস সভা কমন্সসভার সঙ্গে একমত নাও হতে পারে, কিন্তু এই দুই সভার মধ্যে বিসংবাদ সৃষ্টি হলে একটা পর্যায়ে লর্ডসসভার উচিত হল সভাগুলির মতামত নিয়ন্ত্রণ করা, আরেকটি পর্যায়ে উচিত হল দাবি সম্পর্কিত মতামতগুলি নিয়ন্ত্রণ করা। যদি, এ পর্যন্ত কখনও লর্ডসসভা এই সব প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি, তবুও কার্যত তাঁরা এগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। বস্তুত এগুলি কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া এবং প্রচলিত প্রথার রূপ নিয়েছে, এগুলি কিন্তু আইনের রূপ নেয়নি। আইনত লর্ডস সভা ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। অর্থাৎ রাজস্বজনিত বা রাজস্বজনিত নয় এমন সব পদক্ষেপে লর্ডস সভা সম্মতি দিতে অস্বীকার করতে পারে। এটাকে অবশ্য আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হ্রাসের একটা বিষয় বলা যায় না। এটাকে ক্ষমতা প্রয়োগ সম্বন্ধে বিরত থাকার বিষয় বলা যেতে পারে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রথার বিরুদ্ধতা করে লর্ডস সভা মিস্টার লয়েড জর্জের পেশ করা বাজেটের আর্থিক প্রস্তাবগুলিকে সম্মতি দিতে অস্বীকার করার অধিকার প্রয়োগের জন্য জিদ ধরেছিল। ফলে লর্ডসসভা ও কমন্সসভার মধ্যে বিসংবাদ দেখা দিয়েছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সংসদ আইন পাশের মাধ্যমে এই বিবাদের মীমাংসা হয়েছিল। ব্রিটিশ সংবিধান ব্যাপারে এই আইনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই আইন লর্ডসভার ভেটো দানের অধিকারের কিছু অংশ খুবই প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সংসদ আইন কেবলমাত্র সরকারি বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য নয়। বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে লর্ডস সভায় ভেটো দানের ক্ষমতা অক্ষত অবস্থায় আছে। সরকারি বিলের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হলেও তার সমস্ত ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। যেসব সরকারি বিলে পার্লামেন্টের স্থায়িত্ব বা আয়ুকে প্রভাবিত করে সেসবের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। সংসদ আইন অনুযায়ী একমাত্র কমন্সসভার হাতে এ ধরনের বিলের ওপর ভেটো দানের ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। যেসব সরকারি বিলের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য সেখানেও লর্ডস সভায় ভেটো দান ক্ষমতার ওপর এর প্রভাব সর্বত্র এক নয়। এখানে তারতম্য হয়ে থাকে। সংসদ আইনে সরকারি বিলকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) সরকারি বিল যেগুলি অর্থ

সংক্রান্ত, এবং (২) সরকারি বিল যেগুলি অর্থ সংক্রান্ত নয়। সেই সরকারি বিলকে অর্থ সংক্রান্ত বিল বলা যাবে যেগুলিতে কমন্সসভার অধ্যক্ষের মতে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত সব বা যে কোনও বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলি হল : কর আরোপণ, বাতিল করণ, ছাড়, বা সেসব বিষয়ে বিধি রচনা, ঋণ শোধের জন্য বা অপরাপর আর্থিক উদ্দেশ্যে জাতীয় ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য সৃষ্ট তহবিলের ব্যবহার বা পার্লামেন্টের দেওয়া অর্থ বা এই অর্থ নাকচ করা বা তাতে পরিবর্তন আনা, বা সরকারি অর্থের সরবরাহ করা, অধিকার করা, গ্রহণ করা, জিম্মা রাখা, প্রেরণ করা বা তার হিসাবগুলি নিরীক্ষা করা, ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা বা সেজন্য জামিনদার হওয়া বা সেগুলি শোধ করা বা এই সব বিষয়ের সব বা যে কোনও একটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে।

এই আইনে বলা হয়েছে যে, অধিবেশন শেষ হওয়ার অন্তত এক মাস আগে যদি একটি অর্থ সংক্রান্ত বিল কমন্সসভার মাধ্যমে পাশ হবার পর লর্ডসসভায় পাঠানো হয় এবং এই সভার কাছে পাঠানোর এক মাসের মধ্যে সংশোধন ছাড়াই লর্ডসভা যদি ঐ বিল পাশ না করে তাহলে কমন্সসভা বিপরীত কোনও নির্দেশ না দিলে লর্ডস সভা ঐ বিলে সম্মতি না দেওয়া সত্বেও ঐ বিল মহামান্য রাজার কাছে পেশ করা হবে এবং তাঁর সম্মতি ও স্বাক্ষর পাওয়ার পর ঐ বিল সংসদের আইনে পরিণত হবে।

অন্যান্য সরকারি বিল সম্পর্কে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের পার্লামেন্ট আইনের বিধি হল কোনও বিল কমন্সসভায় পর পর তিনটি অধিবেশনে পাশ হলে, (সেই অধিবেশনগুলি একই সংসদের না হলেও) এবং লর্ডস সভায় অধিবেশন শেষ হওয়ার অন্তত একমাস আগে পাঠানো হলে এবং লর্ডস সভার প্রতিটি অধিবেশনে সেগুলি অগ্রাহ্য হলেও এই লর্ডস সভা সেটিকে বাতিল করার পর এবং ইতিমধ্যে কমন্সসভা যদি বিপরীত কিছু নির্দেশ না দিয়ে থাকে, তাহলে লর্ডসসভা সম্মতি না দেওয়া সত্বেও সেই বিলটি মহামান্য রাজার কাছে তাঁর সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হবে এবং তাতে তাঁর স্বাক্ষর হওয়ার পর সেই পার্লামেন্টের পাশ করা আইন বলে গন্য হবে। অবশ্য এই বিধি কার্যকর হতে হলে যে তারিখে কমন্সসভার অধিবেশনে প্রথমবার এই বিল উত্থাপিত হয়েছিল এবং যে তারিখে তাদের সভার অধিবেশনে এই বিল তৃতীয় বারে পাশ করার তারিখের মধ্যে অন্তত দুবছর অতিবাহিত হতে হবে।

এগুলিই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সংসদ আইনের মূল বিষয়। এই আইন আর্থিক বিল বাদে অন্যান্য সরকারি বিলের ওপর ভেটো ক্ষমতার চরিত্র বদলে দিয়ে

এই ভেটো দান ক্ষমতাকে শুধুমাত্র বিলম্বিত করার একটি উপায়ে পরিণত করেছে। এর ফল হল কমনসসভায় পাশ হওয়া বিলকে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য ঝুলিয়ে রাখা মাত্র। পূর্বে পার্লামেন্টের সহ-সমান অংশিদার হিসাবে আইন প্রণয়নকে আটকে দেওয়ার যে ক্ষমতা আগে লর্ডস সভার ছিল এই আইনের মাধ্যমে সে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া হয়।

মহামান্য রাজা ও লর্ডদের এই সব প্রথাগত ও আইনগত কর্তৃত্বের হ্রাস সাপেক্ষে সংসদ যে মহামান্য রাজা, লর্ড ও কমনস প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই প্রতিজ্ঞা ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এই আইন পাশ হওয়ার আগের মত্রে একই রাখা হয়েছে।

(৩) রাজপদ

(১) রাজপদের ওপর মহামান্য রাজার অধিকার ঃ দ্বিতীয় জেমসের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার আগে এটা নিশ্চিত ছিল না যে, রাজা জন্মগত কারণে, না নির্বাচিত হওয়ার অধিকারে, সিংহাসন দাবি করত। কিন্তু তারপর থেকে এটা নিশ্চিত সিংহাসনের ওপর অধিকারের দাবিটা পার্লামেন্ট বদলাতে পারে এই অর্থে-সিংহাসনের ওপর অধিকার একটা পার্লামেন্টারি অধিকার হিসাবে গণ্য। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে পাশ হওয়া স্থিরকরণ আইনের বিধি অনুযায়ী সিংহাসনের (ওপর) দাবি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইন অনুযায়ী উইলিয়ম এবং মেরি এবং তাঁদের রক্তজাত বংশধরদের ওপর সিংহাসনের অধিকার বর্তায়। এই অধিকার পেতে হলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়। এক সিংহাসনে পরম্পরা ক্রমে আগত ব্যক্তিকে অবশ্যই পুরুষ বা নারী উত্তরাধিকারী হতে হবে, দুই, এই উত্তরাধিকারীকে অতি অবশ্য প্রটেস্টান্ট খ্রিস্ট ধর্মীয় হতে হবে।

(২) সিংহাসন অধিকারীর ক্ষমতা ও কর্তব্য : রাজার অধিকারগুলি পদমর্যাদা জনিত বা আইনগত হতে পারে। পার্লামেন্টে পাশ হওয়া আইনের জন্য যেসব অধিকার জন্মেছে সেগুলিকে আইনগত অধিকার বলে। যেসব প্রথাগত বা সাধারণ আইনগুলি রাজা প্রয়োগ করে আসছেন এবং যেগুলি আইন করে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়নি সেগুলি হল পদমর্যাদা জনিত অধিকার। আইনগত অধিকারগুলি বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয়, কারণ সেগুলির সঠিক সংজ্ঞা বা সেগুলির বর্ণনা সংশ্লিষ্ট আইন থেকে জানা যাবে। কিন্তু পদমর্যাদা জনিত অধিকারগুলি সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ পদমর্যাদা জনিত অধিকারের মূল কথা হল এগুলি আইনের মাধ্যমে তৈরি হয় না। পদমর্যাদা জনিত অধিকারগুলি আইন নিরপেক্ষ এবং প্রথার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। যখনই এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করা হবে তখনই অন্যান্য প্রথাগত অধিকারের পরিধি ও প্রকৃতি যেমন 'কোর্ট অব ল' অনুসন্ধান করে থাকে তেমনি এগুলিরও পরিধি ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করবে। মহামান্য রাজার পদমর্যাদা জনিত অধিকারগুলি নীচের শিরোনামে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) পদমর্যাদাজনিত ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার

(১) রাজা কোনও ভুল করতে পারেন না—সমস্ত কাজ-ই রাজার নামে করা হয় বলে, তাঁর এই বিশেষ অধিকারের জন্য তিনি তাঁর কোনও কাজের জন্য দায়ী থাকেন না। তাঁর সব রাজকীয় কাজের জন্য তাঁর মন্ত্রিবর্গ দায়ী থাকেন। তাই রাজার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না বা তাঁকে তাঁর শাসন বিভাগীয় কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। চুক্তিভঙ্গের জন্য বা অন্য যেকোনও অন্যায়ের জন্য কোনও প্রজা ক্ষুণ্ণ হলে সে রাজার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে না। অবশ্য এই বিশেষ নিয়মের সুরকে নরম করার জন্য 'সঠিক পদ্ধতির জন্য আবেদন' নামের এক বিশেষ বিধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনও বিক্ষুব্ধ প্রজা মহামান্য রাজার কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে পারে। এটা শুধুমাত্র একটি আর্জি হলেও রাজার আইন বিষয়ক অফিসার অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল যদি এই আবেদনকে বিচারযোগ্য বলে আদেশ দেন, কেবলমাত্র তখনি বিচারালয় এ আবেদন নিয়ে এগুতে পারে। এমনকি এমন কিছু নিয়ম আছে যেগুলি বেসরকারি পক্ষের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হলেও রাজার কাছে বাধ্যতামূলক নয়। যেমন, একটা নিয়ম হল রাজা তাঁর ভবিষ্যতের কোনও শাসন বিভাগীয় কার্যকলাপকে আগে থেকে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন না। ফলে রাজা যে কোনও সময় রাজ কর্মচারীকে তাঁর সঙ্গে যত সময়ের জন্য কাজ করার চুক্তি করা হোক না কেন, বরখাস্ত করতে পারেন। এর কারণ হল আগে থেকে কর্মচারীর সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছিল সেই চুক্তি পালিত হলে রাজার ভবিষ্যতের প্রশাসনিক কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই একজন কর্মচারীকে ভুল করে ছাঁটাই করা হলেও সে তার অধিকার রক্ষার জন্য আবেদনের মাধ্যমেও রাজার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করতে পারে না।

(২) রাজার কখনো মৃত্যু হয় না: রাজার ওপর অমরত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক বিশেষ ব্যক্তি যিনি মুকুট ধারণ করেছেন— অর্থাৎ ঐ পদে আসীন আছেন তাঁর মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু রাজা (অর্থাৎ ঐ পদ) বেঁচে থাকে। শাসন করছেন এমন এক রাজার মৃত্যু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাজ্যশাসন ও পরবর্তী রাজ্যশাসনের মধ্যে কোনওরকম মধ্যবর্তী কাল বা বিরাম না দিয়ে ঐ রাজার উত্তরাধিকারীর ওপর ঐ রাজত্ব ন্যস্ত হয়। এটাই আইন এবং "রাজা মৃত, রাজা দীর্ঘজীবী হোক"— এই জনপ্রিয় প্রবচনটি আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজার ওপর রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হবার জন্য রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান আবশ্যিক নয়। রাজ্যাভিষেক না হলেও একজন রাজা রাজকার্য চালাতে পারেন যদি তিনি পূর্ববর্তী রাজার

ঠিক পরবর্তী' উত্তরাধিকারী হন। কে রাজা সেটা ব্যাপকভাবে পৃথিবীর কাছে এবং বিশেষ করে প্রজাদের কাছে সরকারি উপায়ে ঘোষণা করা ছাড়া রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের আর কোনও ফল নেই।

(৩) সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে রাজার মকদ্দমা রুজু করার বা অভিযোগ করার ক্ষমতা হানি হয় না: অন্য ভাষায় বলতে গেলে (সময়) সীমাবদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন বেসরকারি ব্যক্তিদের ওপর যেমন প্রযোজ্য, রাজার ক্ষেত্রে তেমন প্রযোজ্য নয়। বেসরকারি ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধকরণ আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই মামলা দায়ের করতে হবে। রাজা এই সময়সীমা থেকে মুক্ত। এখন মামলা করার এই বিশেষ অধিকারটিকে অতি অবশ্য শর্তাধীন করা দরকার। সীমাবদ্ধ করণের এই আইন এখন রাজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে এই সময়সীমা বাড়িয়ে ষাট বছর করা হয়েছে, অবশ্য ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে রাজার আগের ক্ষমতা অক্ষত রাখা হয়েছে।

(৪) রাজার এবং প্রজার অধিকারের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে প্রজার অধিকারের স্থলে রাজার অধিকারই গ্রাহ্য হবে।

(৫) আইনে স্পষ্ট বলা না থাকলে রাজা ঐ আইন মানতে বাধ্য নন।

(খ) পদমর্যাদা জনিত রাজনৈতিক বিশেষ অধিকার

এই অধিকারগুলি স্বাভাবিক ভাবে দুটি শ্রেণীতে পড়ে দেশের সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি একটি শ্রেণীতে পড়ে, আর অপর শ্রেণীতে পড়ে যেগুলি বৈদেশিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত রাজার বিশেষ রাজনৈতিক অধিকারগুলি তিন ধরনের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। সেগুলি হল প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত। ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী মহামান্য রাজার ওপর প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত। প্রশাসনের চূড়ান্ত প্রধান হওয়াটা তাঁর এক বিশেষ অধিকার। এই চূড়ান্ত প্রধান হিসাবে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও স্থায়ী অফিসার নিয়োগ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে। এটা তাঁরই বিশেষ ক্ষমতা যার বলে তিনি এইসব মন্ত্রী ও অফিসারদের বরখাস্ত করতে পারেন। তিনি নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং জনপালন কৃত্যকের প্রধানদের বরখাস্ত করতে পারেন। রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত প্রতিটি কর্মচারী, তিনি যেভাবে নিযুক্ত হোক না কেন তিনি মহামান্য রাজার কর্মচারী। বিচার বিভাগ সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলা যায় যে, রাজা এক সময় বিচার সভায় বসে ন্যায় বিচার করতেন,

কিন্তু মহামান্য রাজা এখন সেই বিশেষ অধিকার হারিয়েছেন। একদা তিনি যে কোনও সময় বিচার সভা ডাকতে পারতেন এবং তাঁর ইচ্ছামত এই সভার হাতে যে কোনও বিষয়ে ও যে কোনও ব্যাপারে বিচার করার ক্ষমতা ন্যস্ত করতেন। বিচার বিভাগ সম্পর্কে রাজার বিশেষ ক্ষমতা কত ব্যাপক ছিল সেটা প্রথম চার্লসের নিয়োগ করা স্টার চেম্বার ও কোর্ট অব্ হাই কমিশন, নিয়োগ থেকে বোঝা যায়। বর্তমানে মহামান্য রাজা তাঁর বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা অর্থাৎ পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া শুধুমাত্র কমন ল প্রয়োগ করার জন্য কোর্ট তৈরি করতে পারেন। বাস্তবে এই অবশিষ্ট বিশেষ অধিকারটুকুও তিনি প্রয়োগ করতে পারেন না। কারণ এজন্য যে অর্থ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা দরকার সেটা তিনি পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া করতে পারেন না। বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আর মাত্র চারটি বিশেষ ক্ষমতা তাঁর আছে-১ তিনি প্রিভি কাউনসিলে আবেদন করার প্রস্তাব মঞ্জুর করতে পারেন। ২. তিন বিচারকদের নিয়োগ করতে পারেন। ৩. তিনি অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারেন। ৪. অপরাধীদের বিরুদ্ধে যে বিচার চলছে তিনি তাতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে বা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রোটে প্রাসুতে যোগ দেবার মাধ্যমে সেটা তিনি বন্ধ করতে পারেন।

এক সময় রাজার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতার পরিধি খুবই ব্যাপক ছিল। সে সময় তিনি দাবি করতেন পার্লামেন্টকে বাদ দিয়েই আইন প্রণয়ন করার, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইনকে স্থগিত রাখার এবং সেগুলি সাধারণভাবে বাতিল করার বিশেষ অধিকার তাঁর আছে, এ সমস্তই বর্তমানে বদলে গেছে। পার্লামেন্টের পাশ করা আইনকে মুলতুবি রাখার বা বাতিল করার তাঁর এই বিশেষ অধিকার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছে। রাজকীয় উপনিবেশগুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারও তিনি হারিয়েছেন। মহামান্য রাজার হাতে আইন প্রণয়নের শুধুমাত্র একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেটি হল (১) সংসদের অধিবেশন আহ্বান করার অধিকার (২) সংসদের অধিবেশন কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখার অধিকার এবং (৩) সংসদ ভেঙে দেওয়ার অধিকার।

পররাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাঁর যেসব বিশেষ অধিকার আছে সেগুলি আলোচনা করার আগে দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনের সঙ্গে জড়িত আরও দুধরনের বিশেষ অধিকার রাজার আছে। এদুটি হল ঃ গির্জা সংক্রান্ত এবং রেভিনিউ সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার।

গির্জা সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার ঃ আইনের বিধান অনুযায়ী মহামান্য রাজা হলেন ইংল্যান্ডের চার্চের সর্বোচ্চ প্রধান। চার্চের প্রধান হিসাবে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমতো আচ বিশপ, বিশপ এবং চার্চের সম্মানিত অন্যান্য কিছু পদাধিকারীদের নিয়োগ করেন। রাজা তাঁর এই বিশেষ অধিকার বলে দুই সভাকে সমবেত হবার জন্য ডাকতে, কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখতে, বা তাঁদের কাজ বন্ধ করতে পারেন। তাঁর এই বিশেষ অধিকার বলে রাজা গির্জা সংক্রান্ত বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভি. কাউন্সিলে অ্যাপিল করার অনুমতি দিতে পারেন।

রাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার ঃ ব্রিটিশ সরকারের রেভিনিউকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১. সাধারণ রেভিনিউ ২. বিশেষ রেভিনিউ। সাধারণ রেভিনিউকে বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত রেভিনিউ বলা হয় কারণ নীচের উৎসগুলি থেকে সেগুলিকে সংগ্রহ করা হয়। ১. বিশপের জিম্মায় থাকা আযাজকীয় বিষয় থেকে অর্জিত আয়, যেমন যদিও বিশপ শাসিত মুক্ত সমুদ্র থেকে অর্জিত লাভ তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তবুও ঐ উৎস থেকে পাওয়া লাভ ঐ রেভিনিউয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২. অ্যানেটস এবং টেনথ্স্-এর ওপর বিশেষ অধিকার। অ্যানেটস্ বলতে সমুদ্র থেকে পাওয়া প্রথম বছরের লাভ যেটা আগে পোপকে দেওয়া হত সেটা বোঝায় এবং টেনথস্ বলতে বোঝায় চার্চের আয়েরএক দশমাংশ যেটা আগে পোপকে দেওয়া হত। এগুলি বর্তমানে রাণী এ্যানির দান ভান্ডারের গভর্নরকে দেওয়া হয়। ৩. মহামান্য রাজার ভূমি থেকে পাওয়া লাভ। ৪. রাজকীয় মৎস্য ক্ষেত্র, লুক্কায়িত মালিকহীন ধনসম্পদ, বেওয়ারিশ সম্পত্তি, রাজকীয় খনি এবং উত্তরাধিকারহীন ও বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি।

১৭১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববর্ণিত বিষয়গুলি নিয়ে গঠিত রাজার সাধারণ রেভিনিউ বিশেষ অধিকারর বলে সংগৃহীত হবার পর রাজাকে দেওয়া হত। ঐ সালে রাজ পরিবারের খরচার তালিকা আইন পাশ হয়। এই আইনে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে এই বন্দোবস্ত করা হয় যে রাজা তাঁর বিশেষ অধিকার বলে প্রাপ্ত সমস্ত রাজস্ব রাষ্ট্রের অনুকূলে সমর্পণ করবেন এবং তার পর থেকে ঐ অর্থ জাতীয় রাজস্বের সম্মিলিত তহবিলে জমা পড়বে। বিনিময়ে সংসদ রাষ্ট্রের ঐ সম্মিলিত তহবিল থেকে রাজ পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য একটা নির্দিষ্ট বার্ষিক অর্থ মঞ্জুর করেছিল। রাজ পরিবারের খরচার এই তালিকাকে সিভিল লিস্ট বলা হয়। এই তালিকাটি একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। এটি ক্ষমতায়

আসীন রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে এক সাময়িক চুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট রাজার জীবদ্দশা পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। নতুন রাজা রাজ্যভার নিলে তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তি হয় এবং তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত ঐ চুক্তি বলবৎ থাকে। কোনও চুক্তি করা না হলে সাধারণ রেভিনিউ সম্বন্ধে রাজার বিশেষ অধিকার পুনরুজ্জীবিত হবে। রাজ পরিবারের খরচের তালিকার মাধ্যমে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেটা কোনওভাবেই রাজার এই অধিকারকে আইন বলে বাতিল করতে পারবে না। রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারকে কোনওভাবেই এই আইন প্রভাবিত করে না।

(গ) দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে রাজার বিশেষ অধিকার

অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করার এবং অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রদূত পাঠানোর অধিকার এবং ক্ষমতা আছে। এটা তাঁর বিশেষ অধিকার। এই অধিকারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাষ্ট্রদূতেরা মহামান্য রাজার দ্বারা স্বীকৃত বলে তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। এভাবে তাঁরা একটা অনাক্রম্য সুবিধে পেয়ে থাকেন কোন কোন বিষয়ে তারা এই সুবিধে পান সেগুলি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে এটাই বলা যথেষ্ট যে, এই সুবিধাগুলি নির্ভর করছে তাঁরা রাজ স্বীকৃত পেয়েছেন কিনা, এবং এই স্বীকৃতি দেওয়াটা রাজার এক বিশেষ অধিকার।

যখন-ই রাজা উপযুক্ত মনে করবেন তখনই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন বা শান্তি স্থাপন করতে পারেন। এটা তাঁর বিশেষ অধিকার।

যে কোনও দেশের সঙ্গে রাজা চুক্তি বা সন্ধি করতে পারেন। এগুলি রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক চুক্তি হতে পারে। এটাও তাঁর বিশেষ অধিকার। তাঁর এই অধিকারের একমাত্র সীমাবদ্ধতা হল যে, তিনি এমন কিছু চুক্তি করতে পারবেন না যার ফলে আইন তাঁর প্রজাদের যেসব অধিকার দিয়েছে যেগুলি কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

রাজার বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন জাগে। সে সব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করে বা সেগুলিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রথম প্রশ্ন হল ঃ সংসদের কর্তৃত্বের সঙ্গে রাজার বিশেষ অধিকারের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটা কি রকমের? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল : রাজা যদি তাঁর বিশেষ অধিকার বা আইনানুগ অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম না হন তাহলে কি হবে?

প্রথম প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হলে এটা ওটা বা অন্যান্য কাজ করার জন্য রাজার বিশেষ অধিকার বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা

থাকা দরকার। রাজা তাঁর বিশেষ অধিকার বলে কাজ করছেন, এবং সেজন্য তাঁকে সংসদের অনুমোদন নিতে হয় না— এই কথাগুলির অর্থ জানা দরকার। তাঁর কর্তৃত্ব তাঁর সহজাত বা জন্মগত এবং সেটা সংসদের ওপর নির্ভর করে না। অবশ্য এই কর্তৃত্ব তাঁর সহজাত এবং সংসদ নিরপেক্ষ — এই কথার অর্থ এই নয় যে, সেটা সংসদের নিয়ন্ত্রণযোগ্য সংশোধনযোগ্য এবং বাতিলযোগ্য। সুতরাং সঠিক অবস্থা হল যে পর্যন্ত না পার্লামেন্ট আইন করে রাজার ঐ বিশেষ ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করছে সে পর্যন্ত রাজা ঐ বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে। এক সময়ে যেটা রাজার বিশেষ ক্ষমতা ছিল সেটা যদি পরে সংসদের পাশ করা আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আর তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না, যে আইনের বলে তাঁর ঐ ক্ষমতা বাতিল হয়েছে তাঁকে সেই আইনের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে মন্তব্য হল, যে পর্যন্ত না পার্লামেন্ট রাজার বিশেষ ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করছে সে পর্যন্ত তাঁর ঐ বিশেষ ক্ষমতা হল তাঁর অন্য হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষ এক স্বাধীন ক্ষমতার উৎস।

রাজা যখন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা এবং অন্যান্য আইনানুগ অধিকার প্রয়োগ করতে অক্ষম হন তখন কি অবস্থার উদ্ভব হয় সেটা দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানকে অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না, কারণ রাজকীয় পদাধিকারের সঙ্গে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য জড়িয়ে আছে যেগুলি সম্পন্ন করতে রাজা অপারগ। আনুসঙ্গিক চারটি ঘটনা প্রসঙ্গে রাজার এই অপারগতা দেখা যেতে পারে। ১. রাজা তাঁর রাজ্যে উপস্থিত থাকতে পারেন, ২. রাজা নাবালক হতে পারেন, ৩. রাজা বিকৃত মস্তিষ্ক হতে পারেন; ৪. নৈতিক দিক থেকে রাজা অক্ষম হতে পারেন।

রাজ্যে ভৌগোলিক সীমানায় রাজার অনুপস্থিতির জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয় না। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দূরত্ব অনেক কমে গেছে এবং দ্রুত তথ্য প্রেরণে খুবই সুবিধা হয়েছে। তাই দূরে থেকেও রাজা বিলম্ব না করে খুবই দ্রুততার সঙ্গে তাঁর রাজকীয় কর্তৃত্ব সম্পাদন করতে পারেন। তাছাড়া আরও একটা সম্ভাবনা হল তিনি যখন বাইরে থাকেন তখন অন্য কারোর উপর তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর করে যেতে পারেন।

আইন বিষয়ে খুব কম রাজাই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আইন অনুযায়ী রাজা কখনই শিশু নয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক না হলেও তিনি রাজকার্য পরিচালনা

করতে সক্ষম। তাই একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক আইনানুযায়ী তাঁর সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারেন। যদি দেখা যায় যে, শাসন করছেন এমন এক রাজার উত্তরাধিকারী হিসাবে এক শিশুকে তিনি রেখে মারা যাবেন বলে মনে করা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সব সময় সতর্কতা হিসেবে আইন অনুযায়ী একজন অন্তর্বর্তী কালের জন্য ঐ শিশুর প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য সম্পাদন করবে এমন এক প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকে। এটা কিন্তু আইনের কোনও শর্ত পূরণ করার জন্য করা হয় না, এটা বিচক্ষণতার জন্য করা হয়।

রাজার মস্তিষ্ক বিকৃতি খুবই জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। রাজার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে প্রতিনিধির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন না। একজন অন্তর্বর্তী কালীন প্রতিনিধি নিয়োগ করে সংসদে আইন পাশ করতে পারে না কারণ কারণ

ব্রিটিশ সিংহাসনে আসীন অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এমন দুটি ঘটনা ঘটেছিল। এই দুই জন হলেন রাজা ষষ্ঠ হেনরি (১৪৫৪) এবং রাজা তৃতীয় জর্জ (১৭৮৮)। সে সময় যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তা ছিল খুবই কলাকৌশলহীন। কিন্তু সেটা অবশ্যই সংবিধানের বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ সাংবিধানিক নিয়ম হল যে তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট এ বিষয়ে তাঁদের সবাইয়েরই সম্মতির প্রয়োজন ছিল।

রাজনৈতিক অক্ষমতা হল আর একটি জটিল বিষয়। জনগণ রাজাকে পছন্দ করছে না এটা অনুমান করে রাজা কি পদত্যাগ করতে পারেন? যদি তিনি পদত্যাগ করতে না চান তাহলে কি তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা যেতে পারে? রাজার বিকৃত মানসিকতা নৈতিক অক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের কোনও বিহিত নেই। দায়িত্বশীল সরকার সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্ট হওয়ার জন্য সম্ভবত ব্রিটিশ সংবিধানে নৈতিক অক্ষমতার প্রশ্ন জেগে ওঠেনি।

মহামান্য রাজার মৃত্যুর প্রভাব

১. সংসদের ওপর রাজার মৃত্যুর প্রভাব ঃ—

প্রারম্ভিক স্তরে নিয়ম ছিল যে, রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসদ আপনা আপনিই ভেঙে যায়। সংবিধান এবং সেই সংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্ব গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ অবস্থার ফলস্বরূপ, সেই অবস্থাটি হল আগে সংসদের সদস্যদের রাজার পরামর্শদাতা বলে গণ্য করা হত। রাজা ঐসব পরামর্শদাতাদের আহ্বান

করতেন। এই আহ্বানের ফলে যারা রাজার কাছে সম্মিলিত হতেন তাঁদের সঙ্গে রাজার যে বন্ধন এবং সম্পর্ক গড়ে উঠে ছিল তাঁদের উভয়ের মধ্যেকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। রাজার মৃত্যুতে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হত। তাই রাজা মৃত্যুর আগে যাদের সংসদের সদস্য বা তাঁর পরামর্শদাতা বলে গণ্য করতেন তাঁদেরকে আর নতুন রাজার পরামর্শদাতা বলে মনে করা যায় না। নতুন রাজার নতুন পরামর্শদাতাদের আহ্বান করার অধিকার আছে। কেবলমাত্র পুরাতন পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েই তিনি নতুন পরামর্শ দাতাদের আহ্বান করতে পারবেন, এজন্য নতুন রাজা নতুন সংসদে ডাকার একটা সুযোগ পান। তৃতীয় উইলিয়াম এই নিয়ম প্রথমে সংশোধিত করেন।*

অধ্যায় পনেরো (পৃ.) ৭-৮। সেখানে বলা আছে যে রাজার মৃত্যুর পর বিদ্যমান পার্লামেন্ট ছয় মাসের জন্য কাজ করতে পারবে। অবশ্য তার আগেই পরবর্তী রাজা ঐ পার্লামেন্ট ভেঙে দিলে অন্য কথা। পরে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে. (৩০, ৩১ ভিক্টোরিয়া, অধ্যায় দুই, ১০২), এই এই নিয়ম সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করা হয় এবং সংসদের আয়ুকে রাজার মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করার ব্যবস্থা করা হয়।

২. পদাধিকারিদের স্থায়িত্বের ওপর রাজার মৃত্যুর প্রভাব

প্রারম্ভিক স্তরে নিয়ম ছিল যে রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক পদাধিকারীদের পদত্যাগ করতে হবে। সেই কারণে যে কারণে, রাজার মৃত্যুতে পার্লামেন্ট ভেঙে যায়। আইনের ফলে এই তত্ত্ব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের সিংহাসন আইনে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যেসব বিধি আছে সেই অনুযায়ী এইসব পদাধিকারীদের কাজের মেয়াদ রাজার মৃত্যুর পর ছয় মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়।* বছরে পাশ হওয়া অন্য একটি আইনে ঐ মেয়াদ আবার বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের সিংহাসন অবলোপন আইনে এই মেয়াদের বিষয়কে রাজার মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করার ব্যবস্থা করা হয়।

* পাণ্ডুলিপিতে এই জায়গা ছাড়া আছে,—

(৪) লর্ডসসভা
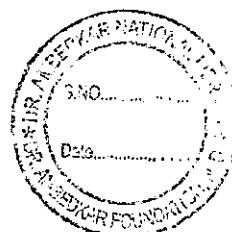
তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজসভা গঠিত। ১. ইংল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের সম্ভ্রান্ত বংশজাত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি, ২. খেতাবধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি, ৩. পদাধিকার বলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি।

রাজসভার গঠন বুঝতে হলে প্রথমে অবশ্যই যে প্রশ্নের উত্তর দরকার সেটি হল : কোন স্বত্বের বলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা রাজসভায় বসতে পারেন?

ইংলন্ডের পীয়ার (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) গোষ্ঠী এবং যুক্তরাজ্য

ইংলন্ড ও যুক্তরাজ্যের পীয়ারদের স্বত্বটা উদ্ভূত হয় মহামান্য রাজা প্রতিটি পীয়ারকে (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে) পার্লামেন্টে (এসে) যোগদান করার জন্য যে পরোয়ানা পাঠান তার থেকে এবং মহামান্য রাজার দেওয়া পেটেন্ট পত্র থেকে ইংরেজ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা গড়ে ওঠে। তাই যে সব ব্যক্তি রাজার পেটেন্ট পত্র পেয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। একটাই মাত্র প্রশ্ন জাগে যে, মহামান্য রাজা সারা জীবনের জন্য একজনকে পদমর্যাদা দিতে পারেন কিনা। এক সময় এটা বিতর্কিত ছিল, আর বিতর্কটা হল—রাজার কাছ থেকে কেবলমাত্র জীবনব্যাপী সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা পেলেই কোনও ব্যক্তির রাজসভায় বসার অধিকার জন্মে কিনা। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েনেসডেল সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা সংক্রান্ত ঘটনায় এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়। সে সময় দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১. বংশগত ভাবে বা কেবলমাত্র একজনের জীবনব্যাপী সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা সৃষ্টি করার অধিকার রাজার আছে। ২. কিন্তু, শুধুমাত্র জীবনব্যাপী সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি রাজসভায় বসতে পারবেন না, আর রাজা তাঁকে ঐ সভায় বসার জন্য পরওয়ানা পাঠাতে পারবেন না। কারণ দেখাতে হয়েছিল যে, আইনে না হলেও প্রচলিত প্রথা হল বংশগত বৈশিষ্ট্যই সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদার অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং কাউকে সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা দেওয়ার অধিকার রাজার থাকলেও প্রচলিত রীতিকে বাতিল করার কোনও অধিকার তাঁর নেই। যেসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পেটেন্ট পত্রের দ্বারা সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা সৃষ্টি হয়নি তাঁদের কি কি অধিকার আছে? তাঁদের অধিকারও তাঁদেরকে মহামান্য রাজার ডেকে পাঠানোর পরোয়ানা পত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

অবশ্য এইসব খেতাবধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ডেকে পাঠানোর পরওয়ানা পত্র নিয়ে দুটি প্রশ্ন বহুদিন ধরে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিটি পীয়ারকে কি

ডেকে পাঠানোর পরওয়ানা দাবি করতে পারেন? রাজা কি ইচ্ছামত পীয়ারদের আহ্বান পরওয়ানা পাঠাতে পারেন বা নাও পাঠাতে পারেন? পীয়ারদের তরফে যুক্তি দেখানো হয়েছিল শুধুমাত্র ব্যারন হওয়ার মাধ্যমে যাঁরা সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা পেয়েছেন কেবল মাত্র তাঁরাই রাজসভায় যোগদানের আহবান পাওয়ার অধিকারী, আর কোনও পীয়ারদের এই আহবান পাওয়ার অধিকার নেই এবং এই শ্রেণীর বহির্ভুক্ত পীয়ারদের মহামান্য রাজা আহবান করতে পারবে না। অন্যদিকে রাজার তরফে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, ব্যারন হওয়ার মাধ্যমে যাঁরা পীয়ার হয়েছেন রাজসভায় যোগদানের আহবান কেবল তাদের বিশেষ সুবিধা হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাছাড়া পীয়ারদের আহবান করার যে অধিকার রাজার আছে সেটাও সীমিত নয়। অবশেষে দুটি নিয়ম তৈরি করে এই বিতর্কের সমাধান করা হয়েছিল। যেসব পীয়ারদের পেটেন্ট পত্র নেই এই দুটি নিয়মের সাহায্যে তাদের আহবান পরওয়ানা পাওয়ার অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

১. ব্যারন হওয়ার অধিকারকে রাজার কাছ থেকে আহবান পত্র পাওয়ার দাবির ভিত্তি বলে গণ্য করা যাবে না।

২. রাজসভায় যোগ দেওয়ার পরওয়ানা পত্র পেয়ে সেই অনুযায়ী ঐ সভায় যোগ দিয়েছিলেন এমন কোনও ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে রাজসভায় যোগদান করার জন্য পরওয়ানা পত্র পাঠাতে রাজা বাধ্য। অন্য কথায় একটি ব্যক্তি যিনি রাজার কাছ থেকে রাজসভায় যোগদানের পরওয়ানা পেয়েছিলেন বলে প্রমাণ করতে পারেন তাঁর উত্তরাধিকারী যাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যতই দূরের হোক না কেন বা তাঁদের ঐ সম্পর্কের মধ্যে যতই ছেদ থাকুক না কেন বংশগত অধিকারের জন্য তিনি রাজার কাছ থেকে অনুরূপ আহবানের পরওয়ানা দাবি করতে পারেন। অতএব ইংরেজ সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদাটি হল বংশগত এবং সব ইংরেজ বংশগত সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদাধারী তাদের বংশ মর্যাদার অধিকারী রাজার কাছ থেকে আহবান জনিত পরওয়ানা অধিকার আছে এবং তাঁরা রাজ সভার সদস্য হবেন।

৩. এই অধিকারটি বংশগত হলেও এটি দুটি নিয়মের অধীন

(ক) জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভের বিধি, এবং

(খ) পুরুষ উত্তরাধিকারীর বিধি।

পীয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ

দুই শ্রেণীর পীয়ার প্রতিনিধি আছে স্কটল্যান্ডের পীয়ার প্রতিনিধি এবং আয়ার ল্যান্ডের পীয়ার প্রতিনিধি। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যে একত্রে ইউনিয়ন হওয়ার যে চুক্তি হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেই স্কটল্যান্ডের পীয়ার প্রতিনিধিদের অধিকার গড়ে উঠেছে। এই চুক্তি বলেই এই দুই রাজ্য যুক্ত হয়ে এক সার্বজনীন রাজার অধীনে এক এজমালি রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠে ছিল। এবং এই সার্বজনীন রাজ্যকে বলা হল গ্রেট ব্রিটেনের যুক্ত রাজ্য। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ইউনিয়ন গড়ার আগে স্কটল্যান্ডের নিজস্ব পীয়ার গোষ্ঠী ছিল। এরা বংশগত অধিকার নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিতেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আয়ারল্যান্ড রাজ্য যুক্ত হয়ে ইউনিয়ন সৃষ্টি হয়। স্কটল্যান্ডের মতোই আয়ারল্যান্ডেও তার নিজস্ব পীয়ার গোষ্ঠী ছিল যাঁরা বংশগত অধিকার নিয়ে ভূতপূর্ব আইরিশ পার্লামেন্টে যোগদান করতেন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড এই দুই রাজ্যের ইউনিয়ন গড়ার পৃথক পৃথক চুক্তি হওয়ার ফলে একটা সমস্যা দেখা দিল যে, পুরাতন স্কচ এবং আইরিশ পীয়ারদের মধ্যে কতজন প্রতিনিধিকে নতুন গ্রেট ব্রিটেন পার্লামেন্টে স্থান দেওয়া হবে। ইংরেজ পীয়ারগণ দাবি করেছিলেন যে, তাঁদের প্রত্যেককে নতুন পার্লামেন্টে বসতে দিতে হবে। স্কচ এবং আইরিশ পীয়ারগণও তাঁদের নিজ নিজ শ্রেণীর প্রত্যেকের জন্য অনুরূপ দাবি করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত একটা বন্দোবস্তে পৌঁছানো হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১. নতুন পার্লামেন্টে ইংরেজ পীয়ারদের প্রত্যেকে বসবেন, ২. স্কচ পীয়ারগণ তাঁদের মধ্য থেকে ষোলো জনকে নির্বাচিত করে নতুন পার্লামেন্টে তাঁদের প্রতিনিধি করে পাঠাবেন, ৩. আইরিশ পীয়ারগণ তাঁদের আটাশজন প্রতিলিধি পাঠাতে অনুমতি পেয়েছিলেন। স্কচ পীয়াররা কেবল মাত্র পার্লামেন্টের একটি মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। পার্লামেন্ট ভেঙে গেলে স্কচ পীয়ারেরা নির্বাচন করে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠান। অপরপক্ষে আইরিশ পীয়ারেরা তাঁদের প্রতিনিধিদের সারা জীবনের জন্য প্রতিনিধি করে পাঠাতেন। ফলে পার্লামেন্ট ভেঙে গেলেও আইরিশ পীয়ারদের মধ্যে নতুন কোনও আইরিশ পীয়ার প্রতিনিধির মৃত্যু হলে বা অন্য কোনও কারণে অযোগ্য বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে কোনও শূন্যতার সৃষ্টি হলে নতুন নির্বাচনের প্রয়োজন হত।

ইউনিয়ন গড়ে ওঠার আগে থেকে থাকা এই তিনটি প্রাচীন রাষ্ট্রের পীয়ার

গোষ্ঠী ছাড়াও একরকম চতুর্থ শ্রেণীর পীয়ার গোষ্ঠী ছিল। তাঁদের যুক্ত রাজ্যের পীয়ার বলা হত। এবং তাঁদের রাজসভায় বসার অধিকার ছিল। এই বিশেষ সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদা রাজা দিতে পারতেন। এমনকি তিনি স্কচ এবং আইরিশ বংশগত পীয়ারদেরও এই মর্যাদা দিতে পারতেন। আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ইউনিয়ন গড়ার চুক্তিতে এরকম ব্যবস্থা না থাকলেও এই সব পীয়ার গণ রাজসভায় বসার অধিকারী হন।

পদাধিকার বলে সৃষ্ট পীয়ারগোষ্ঠী

পদাধিকার বলে পীয়ার মর্যাদা সম্পন্ন যেসব ব্যক্তি রাজসভায় বসতে পারেন তাঁদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১. আধ্যাত্মিক পীয়ার অর্থাৎ আর্চ বিশপ ও বিশপগণ এবং ২. শিষ্টাচার জনিত কারণে খেতাবধারী পীয়ার গোষ্ঠী। আইন অনুসারে চার্চের ছাব্বিশজন পদাধিকারী রাজসভায় বসার অধিকারী। তাদের মধ্যে ক্যান্টোরবারি এবং ইয়র্কের আর্চ বিশপ এবং লন্ডন, ডারহাম ও উইন্‌চেষ্টারের বিশপ রাজসভায় বসার অধিকারী বাকি একুশজন আধ্যাত্মিক পীয়ারদের মধ্যে চাকুরিতে সিনিয়রিটি অনুযায়ী একুশজন ডাও সেসন এলাকাভুক্ত বিশপ রাজসভায় বসার অধিকারী। তাই যখন এই একুশজন বিশপের মধ্যে কেউ মারা যান বা পদত্যাগ করেন, তখন ঐ রাজসভায় ঐ আসনে তাঁর উত্তরাধিকারী সিনিয়র কর্মচারীকে আসন না দিয়ে এলাকাভুক্ত বিশপদের মধ্য থেকে তাঁর ঠিক পরবর্তী সিনিয়র বিশপকে ঐ আসন দেওয়া হয়।

শিষ্টাচার জনিত কারণে খেতাবধারি পীয়ারগোষ্ঠী

রাজসভা ব্যবস্থাপক সভা হওয়া ছাড়াও এটি একটি কোর্ট বা বিচারালয় (Court of Judicature.) ও বটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ইংলন্ড, আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের রাজকীয় বিচারালয় থেকে আসা আপীল বিচার করা সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বিচারালয়। এভাবে বিচার বিভাগীয় কাজকে লর্ডসসভার কাজ বলে গণ্য করার দরুণ বিচার ব্যবস্থার ধারক হিসাবে পার্লামেন্টের কাছে আসা অ্যাপীল বিচার করার সময় পীয়ারদের ঐ আলোচনায় অংশ নিতে কোনও কিছুই বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। লর্ডসসভা প্রধানত অবিশেষজ্ঞ পীয়ারদের নিয়ে গড়া সংস্থা যারা আইনের সূক্ষ্ম জটিলতার সম্বন্ধে সুপরিচিত নয়। তাছাড়া তাদের আইনী শিক্ষাও নেই। এমন এক সংস্থাকে সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হলে বিচারের স্বার্থ ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক রাজসভার কাছ থেকে এই এক্তিয়ারটি সম্পূর্ণ নিয়ে নেওয়াও সম্পূর্ণ

সম্ভব নয়। মধ্যপন্থা হিসেবে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আপিলের এক্তিয়ার সংক্রান্ত আইন পাশ করা হয়। আপীলের চূড়ান্ত বিচারালয় হিসেবে কাজ করার এক্তিয়ার এই আইনে রাজসভার হাতে সংরক্ষিত করা হলেও এখানে বিধি আছে যে, এখানে লর্ডসভায় কোনও অ্যাপীলের শুনানি ও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না যদি না ঐ শুনানি ও সিদ্ধান্তের সময় অন্তত পক্ষে তিনজন লর্ডস অব অ্যাপীল উপস্থিত থাকেন। রাজার নিযুক্ত (১) সেই সময়ের চ্যান্সেলার (২) সভার ক্ষমতাসীন লর্ড যারা বিচার বিভাগের উচ্চপদে আসীন আছেন, এবং (৩) লর্ডস এবং অ্যাপীল ইন অর্ডিনারি—এই তিনজনদের নিয়ে এই লর্ডসসভা অ্যাপীল গঠিত।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে পাশ করা অ্যাপিলের এক্তিয়ার সংক্রান্ত আইনে রাজাকে লর্ডসসভায় বসার জন্য লর্ডস অব অর্ডিনারি নিয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনে নিয়ম করা হয়েছে যে, পীয়ার হিসাবে লর্ডস অব অ্যাপীলের মেয়াদ নির্ভর করবে তার লর্ডস অব অ্যাপীল হিসাবে বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের ওপর। অবশ্য ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিধি বদলে লর্ডস অব ইন অর্ডিনারির মেয়াদ এখন সারা জীবনব্যাপী করা হয়েছে।

লর্ডসসভার গঠন বলার পর এখন আমরা এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে পারি। প্রথম প্রশ্ন হল : কোন অধিকারে পীয়ারেরা লর্ডস সভায় বসতে পারেন। কমনসসভার সদস্যগণ যেমন এক নির্বাচন কেন্দ্র দ্বারা নির্বাচিত, সেরকম কোনও নির্বাচন কেন্দ্রের দ্বারা ভোটের ওপর ভিত্তি করে এই অধিকার গড়ে ওঠেনি। তাদের অধিকারের ভিত্তি হল প্রতিটি পীয়ারকে পার্লামেন্টে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যে আহবান পরওয়ানা পাঠানো হয় সেটাই। এটা রাজার এক ধরনের মনোনয়নের মতো, যদিও এই মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষমতা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং এখানে রাজার স্বেচ্ছামতো কিছু করার উপায় নেই, এবং তিনি এক পার্লামেন্ট থেকে অন্য পার্লামেন্টে মনোনয়ন দেওয়ার পদ্ধতিতে কোনও রদবদল আনতে পারেন না।

পীয়ারদের অধিকার রাজার ইসু করা আহবান পরওয়ানার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকলেও এই পরওয়ানা ইসুর ব্যাপারে কছু বাধানিষেধ আরোপ করা আছে। ব্রিটিশ প্রজা নয় এমন কোনও বিদেশি পীয়ারকে পার্লামেন্টে বসতে দেওয়ার জন্য রাজা আহবান পরওয়ানা পাঠাতে পারেন না।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার সেটি হল পীয়ারদের হাতে অধিকার ন্যস্ত করা বা সেই অধিকার বাতিল করার ব্যাপার। পীয়ার সংক্রান্ত মর্যাদা হল একটি হস্তান্তর অযোগ্য বিশেষ মর্যাদা যার স্বত্ব বিক্রী করে বা দান

করে অন্যকে হস্তান্তর করা যায় না। উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী উত্তরাধিকার পেয়েই মাত্র এই মর্যাদা দাবি করা যায়। অনুরূপভাবে পীয়ার তাঁর পদাধিকার ত্যাগ করতে পারেন না, বা পীয়ার হওয়া সমাপ্ত করতে পারেন না। যে নীতির দ্বারা পীয়ার সংক্রান্ত মর্যাদা নিয়ন্ত্রিত হল সেটি হল একবার পীয়ার হলে সে সবসময়ই পীয়ার থাকবে।

তৃতীয় প্রশ্নটি অবশ্যই পীয়ার সংক্রান্ত মর্যাদা ও লর্ডসসভার মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে জড়িত। 'পীয়ার অব দা রিল্‌ম এবং লর্ডসসভা কথাগুলি সাধারণ ভাবে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এদুটির মধ্যে আইনগত পার্থক্য আছে। এক ব্যক্তি পীয়ার অব্ দা রিল্‌ম হতে পারেন কিন্তু তিনি লর্ডস সভার সদস্য নাও হতে পারেন। সারা জীবনের জন্য পীয়ার হল এ বিষয়ে একটি উদাহরণ। একজন সারা জীবনের পীয়ার 'পীয়ার অব রিলম' হয়েও লর্ডস সভার সদস্য নাও হতে পারেন, কারণ নিয়ম হল পদাধিকারের বলে না হয়ে যিনি অতি অবশ্যই বংশগত উত্তরাধিকারী হিসাবে পীয়ার হয়েছেন কেবলমাত্র তিনিই লর্ডসসভায় বসার অধিকার পেতে পারেন। বিপরীতক্রমে বংশগত পীয়ার না হয়েও কেউ লর্ডসসভার সদস্য হতে পারেন। আধ্যাত্মিক লর্ড এবং লর্ড অব্ অর্ডিনারি হল এ বিষয়ের যোগ্য উদাহরণ। আর্চবিশপ, বিশপ, এবং লর্ডস অব্ অ্যাপিল অর্ডিনারি'রাও লর্ডসসভায় রাজার দেওয়া আহবান পরওয়ানা পাওয়ার অধিকারী। আর্চবিশপ এবং বিশপেরা বিশেষ পদ অধিকারের তাঁরা পীয়ার, তাই যতদিন তাঁরা পদে আছেন শুধুমাত্র ততদিনই তারা পীয়ার, কিন্তু লর্ডস অব অর্ডিনারিগণ সারা জীবনের জন্য পীয়ার হয়েছেন। তবুও বংশগত অধিকারের জন্য পীয়ার সংক্রান্ত মর্যাদা কথার অর্থে আইনের চোখে তাঁরা পীয়ার নন।

(৫) লর্ডসসভা এবং কমন্সসভার ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা

সংসদের উভয় সভাই পার্লামেন্ট গঠনকারি উপাদান হিসেবে তাদের যৌথ পদাধিকার বলে কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। তাদের কাজকর্ম যথাযথ করতে এবং তাদের কর্তৃত্বের সমর্থনে এগুলি প্রয়োজনীয়। পার্লামেন্টের দুই সভার সদস্যগণ যৌথভাবে যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন সেগুলি ছাড়াও সদস্যগণ ব্যক্তিগত পদাধিকার বলে অন্যকিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। তাঁদের দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং তাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এইসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

□ □ □

এক

সংসদের সুযোগ সুবিধা

কমনসসভার সুযোগ সুবিধা ঃ কমনসসভার সুযোগ সুবিধা নিয়ে যেসব দাবি উঠেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল বহিরাগতদের বাদ দিয়ে বন্ধ ঘরে বিতর্ক করার অধিকার। ভিন্ন ধরনের দুটি অবস্থা থেকে এই সুবিধার উদ্ভব। একটি কমনসসভার সদস্যদের আসন বিন্যাস ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। আগে এই ব্যবস্থা এমনই ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, বহিরাগত ব্যক্তি এবং পার্লামেন্টের সদস্যরা প্রায়ই মিশে যেতেন। ফলে ভোট গ্রহণের সময় প্রায়শই সদস্যদের সঙ্গে বহিরাগতদের গণনা করার হয়ে যেত। এটা বন্ধ করার জন্য সভা বহিরাগতদের বাদ দেওয়ার অধিকার দাবি করেছিল। দ্বিতীয়টি কমনসসভার সদস্যদের ওপর সভার ভেতর রাজা যে গুপ্তচর রাখার ব্যবস্থা করতেন তাঁর সঙ্গে জড়িত। সেসব দিনে সভায় সদস্যদের বক্তৃতা রিপোর্ট করার নিয়ম ছিল না। কারা রাজার বন্ধু আর কারা রাজার বিরোধী সেটা জানার জন্য রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। ঐসব গুপ্তচরদের কাজ ছিল সভার ভেতরে সদস্যরা যেসব বক্তৃতা দিতেন সেগুলি রাজার কাছে রিপোর্ট করা। এর পরেই রাজা সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন করতেন বা তাঁদের প্রতি নানা ধরনের অসন্তোষজনক কাজ করতেন। ফলে সদস্যদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হত। এই গুপ্তচর নিয়োগের অভ্যাস থেকে নিজেদের বাঁচানোর একটি মাত্র উপায় সভার হাতে ছিল, সেটি হল বহিরাগতদের সভায় প্রবেশ করতে না দেওয়ার অধিকার দাবি করা।

এই সুযোগ সুবিধার অর্থ এই নয় যে, বহিরাগতরা সভায় প্রবেশ করতে পারবেন না এবং তাঁরা বিতর্ক শুনতে পারবেন না। আসল কথা তাঁরা অবশ্যই প্রবেশ করতেন এবং বিতর্ক শুনতেন। কিন্তু এই সুযোগ সুবিধার ফল হল কোনও বহিরাগতরা সদস্য এসেছে এটা স্পীকারের নজরে আনলে তাদের বহিষ্কার করতে স্পীকার আইনত বাধ্য থাকতেন। অসুবিধার সঙ্গেই এই ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হত, কারণ বহিরাগতদের উপস্থিতি সম্বন্ধে একজন সদস্যের আপত্তিই স্পীকারকে ঐসব বহিরাগতদের সরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতে বাধ্য করত। তাই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সভার এক সিদ্ধান্ত বলে এই বিধি বদল করা হয়েছিল। আগের ব্যবস্থা হল কোনও সদস্য বহিরাগতদের উপস্থিতি নজরে আনলে বা দাঁড়িয়ে স্পীকারকে সম্বোধন করে বললে, 'স্যার আমি বহিরাগতদের গোপনে লক্ষ্য করছি', স্পীকার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক বা সংশোধন চলতে না দিয়ে 'বহিরাগতদের

চলে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হোক' বলে সভায় প্রস্তাব রাখতেন। সভার মনোভাব জেনে তিনি সেইমত ব্যবস্থা নিতেন। নতুন প্রস্তাবে বহিরাগতদের বাদ দেবার এই সুযোগ সুবিধা সভার হাতে রাখা হলেও ব্যবস্থা করা হল যে, সভার অধিকাংশ সদস্যের সম্মতি সাপেক্ষে এই কাজটি করা হবে, মাত্র একজন সদস্যের খেয়ালের ওপর নির্ভর করে করা হবে না। অবশ্য এই বিধিতে স্পীকারকে যে কোনও সময় তাঁর নিজ উদ্যোগে এবং সভার কোনও সদস্যদের মোশন ছাড়াই বহিরাগতদের তুলে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

সভাতে যেসব বিতর্ক হয় সেগুলি গোপন রাখার সুবিধা ভোগ করার অধিকার কমনস সভার আছে। সভার বিতর্ক এবং কার্যবিবরণী প্রকাশ করার অধিকার ও কমনসসভার আছে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনার ফলে এই অধিকারটিকে তর্কাতীত করেছে। লন্ডনবাসী এক মুদ্রক কমন্সসভার অনুমতি না নিয়ে ঐ সভার বিতর্ক ছাপিয়েছিল। এই বিশেষ সুবিধা ভঙ্গের জন্য কমনসসভা অসন্তুষ্ট হয়ে স্পীকারের ক্ষমতাবলে মুদ্রককে বন্দী করার জন্য এক বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলেন। এর প্রত্যুত্তরে মুদ্রকটি কমনসসভার বার্তাবাহককে তাকে তার নিজের বাড়িতে আক্রমণ করেছিল এই অজুহাতে এক কন্সটেবলের কাছে ঐ বার্তাবাহককে জিম্মা দিয়েছিল। ফলে যে ফৌজদারি মামলাটি শুরু হয়েছিল তাতে লন্ডন শহরের মেয়র এবং দুজন আল্ডারম্যান নিয়ে গঠিত বেঞ্চ রায় দিয়েছিলেন সনদের বিধান অনুযায়ী কমন্সসভার ইসু কৃত বন্দীর পরোয়ানা লন্ডন শহরে প্রযোজ্য নয়। তাঁরা কমন্সসভার বার্তাবহের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করলেও তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছিল। কমন্সসভা বেঞ্চ যাদের নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ মেয়র, আল্ডারমেন এবং যে করনিক বার্তাবাহকের মুচলেখা নথীভুক্ত করেছিল তাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তারা খাতার যে পাতায় মুচলেখা ছিল সেই পাতা ছিঁড়ে দিয়ে এই এন্ট্রিটি মুছে ফেলেছিল এবং কমন্সসভার পরওয়ানার কর্তৃত্বকে বিচারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বলে টাওয়ার অব লন্ডনের কাছে মেয়র এবং দুই আল্ডারমেনকে অভিযুক্ত করেছিল। তারপর থেকে কেউই বিতর্কের গোপনীয়তা সম্পর্কিত কমন্সসভায় বিশেষ সুবিধাকে ভঙ্গ করার সাহস দেখায় নি। আজকাল বিতর্ক সম্বন্ধে যেসব রিপোর্ট করা হয় বা প্রকাশ করা হয় সেগুলি নীরব সম্মতির ওপর নির্ভর করেই করা হয়। যে কোনও সময়ই সভার আদেশে এভাবে রিপোর্ট বন্ধ করা যেতে পারে। গত যুদ্ধের সময় যখন বহুবিধ বিষয় সভাস্থলে গোপনে আলোচিত হত তখন অনেক ক্ষেত্রেই এরকম অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং বিতর্কের কোনও রিপোর্টই প্রকাশ করা হয়নি।

কমন্সসভার হাতে আরও এক বিশেষ অধিকার আছে সেটা হল ঐ সভাকে তার যথাযথ সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে দিতে পারা। এই বিশেষ অধিকারের প্রসঙ্গে তিনটি স্পষ্ট প্রশ্ন বিবেচ্য।

শূন্যপদ পরিপূরণ—নতুন পার্লামেন্ট ডাকার প্রয়োজনে সাধারণ নির্বাচন করা যেমন মহামান্য রাজার বিশেষ অধিকারের মধ্যে পড়ে, তেমনি সংসদ অধিবেশন চলাকালীন শূন্যপদ পূরণ করার বিশেষ সুযোগ একমাত্র কমন্সসভাই ভোগ করে। ফলে কোনও পদ শূন্য হলে মহামান্য রাজার আদেশ অনুসারে নয়, সভার আদেশ অনুসারে স্পীকার ঐ শূন্যপদে একজন সদস্য সরবরাহ করার জন্য এক পরওয়ানা জারি করেন। সংসদের অধিবেশন চলছে না — এমন সময় পদ শূন্য হলে কিছু শর্তসাপেক্ষে স্পীকারের হাতে পরওয়ানা জারি করার অধিকার অর্পণ করা হয়েছে।

এইসব বিশেষ সুবিধা সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি বিবেচ্য সেটি হল কোন নির্বাচনগুলি বিতর্কিত সে বিষয় স্থির করা। এই প্রশ্নটি একদিকে রাজা এবং অন্যদিকে কমন্সসভা এই দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের কলহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উভয় পক্ষই অপর পক্ষকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজেদের এই অধিকার আছে বলে দাবি করত। প্রারম্ভিক স্তরে নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনের জন্য যে পরওয়ানা ইস্যু করা হত সেটি সংসদে ফেরত আসত, এবং এর দ্বারা ঐ বিশেষ কেন্দ্রের শূন্য পদ পূরণ করার বিশেষ অধিকার কমনসসভার বলে স্বীকৃত ছিল। চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকাল থেকে এই ক্ষমতা চ্যান্সেরীর হাতে প্রত্যর্পিত হয় এবং এর মাধ্যমে রাজার হাতে শূন্যপদ পূরণের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। এভাবে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ যে পর্যন্ত না কমনসসভা এ বিষয়ের অধিকারটি কেবলমাত্র তাদেরই বলে জোর খাটিয়েছিল সেই পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল। কমনসসভা এই দাবি করার পর তাদের সঙ্গে প্রথম জেমসের কলহ বাধে। ঐ বছর রাজা প্রথম জেমস কোনও দেউলিয়া বা দস্যু (আইনের রক্ষণাবেক্ষণ বঞ্চিত ব্যক্তি) সংসদে নির্বাচিত হতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়ে এক ইশতাহার জারি করেন। কাউন্টি অব বাক্‌স থেকে মিঃ গুডউইন নামে এক ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছিল। সে দস্যু ছিল বলে রাজা তাঁর নির্বাচনকে অকার্যকর বলে ঘোষণা করে অন্য একটি পরওয়ানা জারি করেছিলেন। এবার মিঃ ফরটেস্কু নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়। কমন্সসভা নিজেদের থেকে মোশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে মিঃ গুডউইনের নির্বাচন মহামান্য রাজা কর্তৃক রদ করা সত্ত্বেও তিনি সভার আইন সম্মত, নির্বাচিত সদস্য। অপর পক্ষে রাজা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার

দাবি করেন। রাজা, কমন্সসভা এবং লর্ড সভার যৌথ সভায় লর্ডেরা রাজাকে পরাজয় স্বীকার করার পরামর্শ দেন এবং কমন্সসভার অধিকার স্বীকার করে নেন। বিতর্কিত নির্বাচন সম্পর্কে বিচার করাটা সভার কাছে ঝামেলার এবং প্রার্থীদের কাছে উৎকণ্ঠার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ এ বিচারটা কার্যত গোষ্ঠী রাজনীতির রূপ নিত। তাই ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সভা এক আইন পাশ করে বিতর্কিত নির্বাচনের বিচারের ভার দেশের বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করেছিল।

এই বিশেষ সুযোগ সুবিধার আওতায় সভার তৃতীয় যে অধিকারটি পড়ে সেটি হল কোনও সদস্য তার আচরণের দ্বারা নিজেকে সভায় বসার জন্য অযোগ্য করে তুললে, তাকে সভায় বসার জন্য অযোগ্য করে তুললে তাকে সভা থেকে বহিষ্কার করার অধিকার। বহিষ্কারের অর্থ অযোগ্যতা নয়। একজন সদস্য বহিষ্কৃত হলেও পুনর্নির্বাচিত হতে পারে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এর সঙ্গে সঙ্গে সভায় বসার অধিকার আসছে। নির্বাচিত হওয়ার অর্থ হল নির্বাচকমণ্ডলীর আনুকূল্য লাভ। সভায় বসার অনুমতি পাওয়াকে সভার আইনগত যোগ্যতার মধ্যে পড়া এক আনুকূল্য বিশেষ বলে ধরা হয়। এমনও ঘটেছে যেখানে অনেকে কমনসসভায় আইনসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়েও কখনই সভায় আসন নিতে সক্ষম হয়নি। এ প্রসঙ্গে উইলকেসের ঘটনা একটি উদাহরণ। মিডিলসেক্স কাউন্টি থেকে উইলকেস পরপর চারবার নির্বাচিত হলেও এই চারবারের প্রতিবারেই তাকে সভায় বসতে দিতে অস্বীকার করা হয়। কমনসসভার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ অধিকার হল সভার মধ্যেই উদ্ভূত বিষয়গুলিকে অবধারণ করার একচ্ছত্র অধিকার। সভার অভ্যন্তরীণ কার্যধারা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ অধিকার সভার করার হাতেই আছে, কিভাবে কোন রীতিতে সভার কাজ চলবে সেসব বিষয় ঠিক করার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র সভার হাতেই আছে। সভার চার দেওয়ালের মধ্যে যেসব বিষয় ঘটে থাকে তার কিছুই কোনও বিচারালয়ের বিচার্য বিষয় হবে না। ব্রাডলাফ বনাম গোস্রেট মামলাটিতে এই বিশেষ অধিকারের প্রকৃত ও পরিধি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এই মামলার ঘটনাটি বেশ সরল। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে নর্থাম্পটন থেকে নির্বাচিত সদস্য মিঃ ব্রাডলাফ তিনি যে নাস্তিক নন সে বিষয়ে হলফ না নিয়ে ঘোষণার মাধ্যমে বলার দাবি করেছিলেন। কমন্সসভার এক কমিটি এ বিষয়ে রিপোর্ট করেছিলেন যে হলফ না নিয়ে ঘোষণা করা বিচারালয়ের কার্যধারাতে সীমাবদ্ধ, তাই সংসদের সদস্যরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন না, তাঁদের কাছে একমাত্র শপথ নেওয়ার পথটিই খোলা আছে।

এই রিপোর্টের পর ব্রাডলাফ স্পীকারের টেবিলের কাছে শপথ নিতে আসেন। সভা কিন্তু আপত্তি জানায়। কারণ তাড়না থেকে না নিয়ে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য শপথ নেওয়াটা ঠিক নয়। মিঃ ব্রাডলাফকে শপথ নিতে অনুমতি দেওয়া যাবে কিনা সেটা বিবেচনা করে রিপোর্ট দিতে আর একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ঐ কমিটি রিপোর্ট দেয় যে মিঃ ব্রাডলাফকে শপথ নিতে অনুমতি দেওয়া হবে না। কিন্তু সুপারিশ করা হয় যে, তাঁকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে দেওয়া যেতে পারে যদি কোনও বিচারালয় এভাবে ঘোষণা করা আইনসম্মত বলে রায় দেয়। সেই অনুযায়ী মিঃ ব্রাডলাফকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার অধিকার দেওয়ার জন্য সভায় একটি প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু এই প্রস্তাবের ওপর এক সংশোধনী এনে বলা হয় যে, যেন তাঁকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা বা শপথ নেওয়া কোনওটাই করতে না দেওয়া হয়। ব্রাডলাফ অবশ্য স্পীকারের কাছে তাঁর শপথ জানানোর অধিকারের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকেন, কিন্তু স্পীকার তাঁকে ঐ কথা প্রত্যাহার করতে বলেন। ব্রাডলাফ অস্বীকার করলে তাকে বহিষ্কারের জন্য সার্জেন্ট ডাকা হয়। সার্জেন্ট গোস্রেট এবং ব্রাডলাফের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ব্রাডলাফ গুরুতরভাবে আহত হয়। ফলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করাকে অনুমতি দিয়ে এক স্থায়ী বিধি পাশ করা হয়, কিন্তু মিঃ ব্রাডলাফ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেও পার্লামেন্টের সদস্যদের দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করাটা মঞ্জুরযোগ্য নয় বলে বিচারালয় রায় দেয়। তারপর তাঁর আসনটি শূন্য বলে ঘোষিত হয়, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে আবার নির্বাচিত হলে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। টেবিলের কাছে যখনই ব্রাডলাফ শপথ নিতে আসে তখনই সভায় প্রস্তাব নেওয়া হত যে, তাঁকে শপথ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না। একবার স্পীকারের নির্দেশে সার্জেন্ট গোস্রেট মিঃ ব্রাডলাফকে বহন করে সভা গৃহের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাকে সভা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। রানির ডিভিসন বেঞ্চে গোস্রেটের বিরুদ্ধে তাঁকে শপথ নেওয়া থেকে বিরত করা থেকে নিরস্ত থাকার জন্য স্থগিতাদেশের আবেদন জানায়। সভা সার্জেন্টের সমর্থনে স্বাভাবিক এক আদেশ পাশ করেছিল। রানির বেঞ্চ মিঃ ব্রাডলাফের অসুবিধা কোনওরকম লাঘব করতে পারেনি এই কারণে যে, গোস্রেট যে আদেশের বলে কাজ করেছে সেটা সভার কার্যবিধি অনুযায়ী করা হয়েছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনও ক্ষমতা আদালতের নেই।

নিজের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব রক্ষা করার বিশেষ অধিকার কমন্সসভার আছে। কোনও কাজ বা যে কোনও আইনের উল্লেখ করার চেষ্টা বৃথা বলে গণ্য হবে

যদি ঐ উল্লেখ বা তার ব্যাখ্যাকে এই সভা তার অসম্মান বা মর্যাদাহানিকর বলে মনে করে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বিধি নিয়ম রচনা করা হয়েছে :

১. সভার কার্যধারা নিয়ন্ত্রণকারী কোনও আদেশ বা নিয়মকে অমান্য করা হলে সেটাকে সভার বিশেষ সুবিধাভঙ্গ বলে বিবেচনা করা হবে। সভার সিদ্ধান্তের বিরোধী কোনও বিতর্ক জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা, ইচ্ছাকৃতভাবে সভার বিতর্ককে বিকৃত করে উপস্থাপনা করা, সিলেক্ট কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষ্য সভার কাছে রিপোর্ট করার আগেই প্রকাশ করা ইত্যাদি হল এই বিধিভঙ্গের উদাহরণ।

২. নির্দিষ্ট আদেশ অমান্য করা : প্রতিটি সেশন শুরুর সময় একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সভার সামনে বা তার নিযুক্ত কোনও কমিটির সামনে সাক্ষ্য দান কারীদের ওপর অবৈধভাবে কোনওরকম প্রভাব বিস্তার করা হলে সভা তার বিরুদ্ধে খুবই কঠোরতার সঙ্গে এগুবে। যদি কেউ কোনও ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে বা উপস্থিত হতে বাধা দেয় বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, বা কেউ সভা বা সভা নিযুক্ত কমিটির সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহলে তাকে সভার নির্দিষ্ট আদেশ অমান্য করার কারণে সভার বিশেষ অধিকার ভঙ্গের দোষে দোষী করা হবে।

৩. সংসদের কার্য বিবরণী বা বৈশিষ্ট্য ব্যাপারে প্রকাশিত কোনও অবজ্ঞা বা সভার মর্যাদা বিষয়ে কোনও অপমানকর এবং কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য ইশতাহার প্রভৃতি প্রকাশকে সভার বিশেষ সুবিধা ভঙ্গ বলে বিবেচনা করা হবে। এটা অনুমান করা ঠিক হবে না যে, শুধুমাত্র জনসাধারণই এই আইন অনুসারে বিশেষ সুবিধা ভঙ্গের অভিযোগে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে। পার্লামেন্টের কোনও সদস্য এই নিয়মভঙ্গ করলে তাদেরও বিশেষ সুবিধা ভঙ্গের শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা যাবে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মিঃ হবহাউস নামে একজন এম.পি. পার্লামেন্টারি রিফর্মস সভা যেসব প্রতিরোধ/বাধার কথা বলেছিল নামপ্রকাশ না করে একটি পুস্তিকার মাধ্যমে সেগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছিল। সে নিজেকে এই পুস্তিকার গ্রন্থকার হিসাবে স্বীকার করলে পর সভা তাকে বিশেষ সুবিধা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি ঘটনা ঘটে। এই সময় মিঃ ওকোমড় নামে এক এম.পি নির্বাচন কমিটিগুলির বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মিথ্যা শপথ নিয়ে থাকে বলে জনসাধারণের সভায় প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিল।

৪. সভায় সভার সদস্য হিসেবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সভার সদস্যদের

কাজে হস্তক্ষেপে করা ও সভার বিশেষ সুবিধা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

সভায় ঢোকার সময় বা সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সভার কোনও সদস্যকে নির্যাতন করা, অপমান করা বা আতঙ্কগ্রস্ত করা হলে বা পার্লামেন্টে কারো কোনও আচরণের জন্য বা সভায় আলোচিত বা সভায় শীঘ্র আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে এমন কোনও প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও সদস্যকে জোর করে মত দেওয়ানোর চেষ্টা করা হলে বা পার্লামেন্টের সদস্যদের নির্দিষ্ট দিকে ভোট দেওয়ার জন্য উৎকোচ দেওয়া হলে সেটাকে সভার বিশেষ অধিকার লঙ্ঘন বলে গণ্য করা হবে।

দুই

সদস্যদের ব্যক্তিগত সুবিধা

১. বন্দী না হওয়ার স্বাধীনতা : এই বিশেষ অধিকারের বলে সভার সদস্যেরা সেশন চালু থাকার সময় বা সেশন শুরু হওয়ার আগের ও শেষ হওয়ার পরের চল্লিশ দিন বন্দী না হওয়ার স্বাধীনতার গ্যারেন্টি পেয়ে থাকে। প্রারম্ভিক স্তরে এই বিশেষ সুবিধা শুধুমাত্র সদস্যরা ভোগ করত না, তাদের কর্মচারীদেরও এই সুবিধা দেওয়া হত। এখন কিন্তু কেবলমাত্র সদস্যদের এই সুবিধা দেওয়া হয়, এবং তাও কেবল মাত্র তাদের দৈহিক নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. বাক্ স্বাধীনতা: উইলিয়ম এবং মেরি এস ২ সি ২ আইনের বিধান হল যে পার্লামেন্টের বিতর্কে এবং কার্যধারাতে সদস্যরা সম্পূর্ণ বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং তারা যে কিছু বলবে তার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের বাইরে বা আদালতে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না বা দোষারোপ করা যাবে না।

তিন

বিশেষ সুবিধা ভঙ্গের জন্য শাস্তিদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

যেসব ব্যক্তি সভার বিশেষ সুবিধা ভঙ্গের দোষে দোষী সভা তাদের পাঁচরকম উপায়ে শাস্তি দিতে পারে। বিশেষ অধিকার ভঙ্গের বিষয়টি বিশেষ গুরুতর না হলে, অধিকার ভঙ্গের কারণে কোনও ব্যক্তি বন্দী হলে এবং সে ক্ষমাপ্রার্থী হলে সভা তাকে শুধুমাত্র মৃদু ভর্ৎসনা করে মুক্তি দিতে পারে অথবা তাকে কঠোর ভর্ৎসনা করে মুক্তি দিতে পারে। অবস্থাটা বিশেষ গুরুতর হলে সভা তাকে জেলে পাঠাতে পারে, তার জরিমানা করতে পারে, বা তাকে সভা থেকে

বহিষ্কার করতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, শেষের শাস্তি অর্থাৎ বহিষ্কৃত করা শুধুমাত্র এই অধিকার ভঙ্গকারী পার্লামেন্ট সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

চার

লর্ডসসভার বিশেষ অধিকার

কমন্সসভার যেমন বিশেষ অধিকার আছে তার মতোই কমবেশি বিশেষ অধিকার লর্ডসসভার আছে। তাই সেগুলি পৃথক করে বিশ্লেষিত ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এই দুই সভার বিশেষ অধিকারের মধ্যে থাকা পার্থক্যগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি তাদের অধিকারের উৎসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কমনসসভার বিশেষ অধিকারগুলি রাজার দেওয়া দান। প্রতিটি নবনির্বাচিত পার্লামেন্ট বসার শুরুতেই স্পীকারকে কমনসদের নামে এই অধিকারগুলি দাবি করতে হয়। কিন্তু লর্ডদের ক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলি নিজেদের অধিকারেই প্রাপ্ত, সেগুলি রাজার কাছ থেকে আহরণ করা নয়।

*পাঁচ

সভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ

কমন্সসভা ও লর্ডসসভা উভয়ের অধীনে কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাজ করেন। সভার বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রয়োগ করতে এবং সভার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য এদের প্রয়োজন। পরিষ্কার করে বলার জন্য এই দুই সভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মর্যাদা এবং কার্যাবলী পৃথকভাবে আলোচনা করা অভিপ্রেত।

†ছয়

কমনসসভা

১. স্পীকার : সাধারণ নির্বাচনের কমনসসভার প্রথম অধিবেশনেই কমনসসভা স্পীকার নির্বাচন করে। সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পীকারকে পদচ্যুত না করা পর্যন্ত একটি পার্লামেন্ট যতদিন চলবে ঐ স্পীকার ততদিনই কাজ করতে থাকবে। প্রারম্ভিক স্তরে এই নির্বাচনের প্রকৃত ক্ষমতা রাজার হাতেই ছিল। তখন তিনি এই অধিকার দাবি করতেন এবং প্রয়োগ করতেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়

* (পাণ্ডুলিপিতে) মূল নম্বর ছিল ছয় — সম্পাদক

† পাণ্ডুলিপিতে এই পরিচ্ছদের নম্বর দেওয়া নেই — সম্পাদক।

চার্লস এবং নবনির্বাচিত কমন্সসভার মধ্যে স্পীকার নির্বাচনের অধিকার নিয়ে এক বিবাদ দেখা দেয়। কমন্সসভা স্যার এডওয়ার্ড সে মুরকে স্পীকার বলে পছন্দ করলে রাজা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। রাজা তাঁর নিজের পছন্দের কথা কমনসসভাকে জানালে কমন্সসভা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। পরে এক আপস মীমাংসায় পৌঁছনো হয়। কমন্সসভার স্বাধীনভাবে পছন্দ করা অন্য এক ব্যক্তিকে স্পীকার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে রাজা কোনওরকম আপত্তি তোলেননি। এই সময় থেকে এবং তাঁর পরবর্তী কালে কমন্সসভার, তাদের নিজেদের স্পীকার নির্বাচনের অধিকার নিয়ে রাজা কোনও আপত্তি করেন না।

সাত

স্পীকারের কার্যাবলী

কমন্সসভার স্পীকার তিনটি স্বতন্ত্র পদাধিকারের বলে কাজ করে থাকেন। সভার মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি হিসাবে তিনি নিচের কর্তব্যগুলি পালন করেন ঃ—

(১) তিনি সভার বিশেষ অধিকারগুলি দাবি করেন, সভার ধন্যবাদসূচক সিদ্ধান্তগুলি জানিয়ে দেন এবং মৃদু ও কঠোর ভৎর্সনা করা নিশ্চিত করেন।

(২) যখন-ই বিশেষ অধিকার ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া হয় তখনই তিনি তাঁকে ঐ অধিকার ভঙ্গের দায়িত্ব স্বীকারের হুকুমনামা ইস্যু করেন। সভার দ্বারা ভর্ৎসৃত হওয়ার জন্য বা শাস্তি পাওয়ার জন্য বা অন্য উদ্দেশ্যে, যেমন সভার আদেশে বলা হবে, তার জন্য সভায় উপস্থিত হতে ইনি হুকুমনামা ইস্যু করেন।

(৩) শূন্যপদ পূরণের জন্য তিনি আদেশপত্র ইস্যু করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রচলিত ছিল এমন কিছু নতুন কাজ স্পীকারের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই আইন অনুসারে তিনি বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং ঐ পদাধিকার বলে নির্দিষ্ট কোনও বিল অর্থ বিল কিনা সে বিষয়গুলি তাঁকে প্রত্যয়ন করতে হয়।

সভা যখনই তার কাজ করার জন্য বসে তখনই স্পীকারকে সভার চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করতে হয়। চেয়ারম্যানের পদাধিকারের জন্য তাঁর পক্ষে নীচের কাজগুলি করা আবশ্যক।

১. বিতর্কের সময় শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

২. আইনানুগ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৩. সভার আলোচনাধীন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা,

৪. উত্থাপিত প্রশ্ন সম্বন্ধে সভার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা।

আট

স্পীকারের অধীন অফিসারবৃন্দ

কমন্সসভার স্পীকারের অধীনে দুজন অফিসার কাজ করেন। একজন কমন্সভার করনিক, অপরজন হলেন সশস্ত্র সার্জেন্ট। কমন্সসভার করনিকের কাজ হল সভার কার্য বিবরণীর রেকর্ড রাখা। তিনি যে বইটি চালু রাখেন তাঁকে কমন্সসভার জাবেদা বলে এবং সভার সামনে যা কিছু উপস্থাপিত করা হয় এবং আলোচিত হয় তার সবগুলি তারিখ অনুযায়ী ঐ জাবেদায় পরপর লেখা হয়।

সশস্ত্র সার্জেন্ট হল এক রকমের পুলিশ অফিসার যার কর্তব্য হল সভার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং সভার বিশেষ অধিকার ভঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়ে সভার এবং স্পীকারের আদেশ বলবৎ করা।

স্পীকার ঃ লর্ডসসভার স্পীকার একজন নির্বাচিত ব্যক্তি নন। নিজেদের স্পীকার নির্বাচনের অধিকার লর্ডসসভার নেই। লর্ড চ্যান্সেলর বা লর্ডকীপার অব্ দা গ্রেট সীলের নির্দেশ ক্রমে লর্ডসসভার স্পীকার নিরূপিত হয়। লর্ড চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে লর্ড কীপার অব দা গ্রেট সীল স্পীকার হিসাবে কাজ চালাতে পারেন। তাঁদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে যে কোনও একজন ডেপুটি স্পীকার ঐ স্থানে কাজ করেন। সবসময়ই কিংস কমিশনের নিযুক্ত অনেকগুলি ডেপুটি স্পীকার থাকেন। ডেপুটি স্পীকারদের সবাই অনুপস্থিত থাকলে লর্ডেরা সাময়িক ভাবে একজন স্পীকার নির্বাচন করেন। লর্ডসসভার স্পীকার হতে হলে পীয়ার হতেই হবে এমন কথা নেই। একজন সাধারণ মানুষও ঐ কাজ করতে পারেন। এমনও হয়েছে যে, একজন সাধারণ মানুষ লর্ডকীপার অব গ্রেট সীল হিসাবে কাজ করার সময় ঐ দায়িত্ব পালন করেছেন বা দা গ্রেট সীল হিসাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন বা গ্রেট সীল হিসেবে বিশেষ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এটি একটি অনন্যসাধারণ বিষয় যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই সংস্থার প্রেসিডেন্টকে ঐ সংস্থার সদস্য হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই উলক্ স্যাক নামের যে আসনে স্পীকার বসেন সেটি লর্ডসসভার সীমার বাইরে থাকে

বলে গণ্য করা হয়, যাতে ঐ সভার সদস্য নয় এমন কোনও ব্যক্তিকে ঐ পদাধিকারের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া যায়।

লর্ডসভার স্পীকারের কর্তব্য

কমন্সসভার স্পীকারের পদমর্যাদা থেকে লর্ডসসভার স্পীকারের পদমর্যাদা সম্পূর্ণ পৃথক। উভয়েই সুচিন্তনকারী সমাবেশের সভাপতি হওয়া ছাড়া কর্তৃত্ব বা কাজের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনও কিছুই এক নয়। কিন্তু তাঁদের কাজ ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান সম্পূর্ণ পৃথক। কুড়ি নম্বর স্থায়ী নির্দেশ থেকে এটা স্পষ্ট। লর্ডসসভার স্পীকার হিসেবে কাজ করাটা লর্ড চ্যান্সেলরের কর্তব্য বলে সেখানে বলা আছে। এই স্থায়ী নির্দেশে বলা আছে, "সভায় যখনই লর্ড চ্যান্সেলর বলেন তখন তাঁকে আড়াল না রেখেই বলতে হয় সভার মুখপাত্র হিসাবে সভার কাজ তিনি মুলতুবি রাখতে পারেন না। যেসব সাধারণ ব্যাপার লর্ডেরা নিজেরাই বাতিল করতে পারেন সেগুলি ছাড়া সভার অনুরূপ বিষয়গুলি লর্ডদের সম্মতি না নিয়েই তিনি বাতিল করতে পারেন। যেমন একটি বিলের জায়গায় অন্য একটি বিলকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে পারেন। লর্ডদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। লর্ড চ্যান্সেলার নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে স্পীকারকে পীয়ার হিসাবে তার নিজের নির্দিষ্ট আসনে চলে যেতে হয়। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, লর্ড চ্যান্সেলর নিজে একজন পীয়ার হলে তাঁর জায়গা হবে চেম্বারের বাম দিকে, এই স্থায়ী নির্দেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, লর্ডসসভার স্পীকারের ক্ষমতা কত সীমিত।

১. সভায় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে যেসব নিয়ম আছে সেগুলি কার্যকরী করার জন্য অন্যান্য সাধারণ পীয়ারের চেয়ে লর্ডসসভার স্পীকারের হাতে বাড়তি কোনও কর্তৃত্ব থাকে না।

২. সভায় কোনও কিছু আইনানুগ হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে সদস্যেরা প্রশ্ন তুললে কমনসসভার স্পীকার যেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন লর্ডসসভার স্পীকার সেরকম করতে পারেন না। তিনি পীয়ার হলে আইন বিষয়ে উত্থাপিত যে কোনও প্রশ্ন নিয়ে তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন কিন্তু এ বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত সভার সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।

৩. সভার কার্যক্রম পরিচালনা করতে লর্ডসসভার স্পীকারের ক্ষমতা সীমিত বলে ঐ সভায় কোনও পীয়ারের বক্তৃতা করার অধিকার স্পীকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে না। সম্পূর্ণ নির্ভর করে সভার ইচ্ছার উপরে। দুজন পীয়ার

একসময়ে বলতে উঠলে এবং তাদের একজন অন্যকে বলার সুযোগ না ছেড়ে দিলে সভা তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে বলতে দেয় কিন্তু উভয়ের সমর্থনে যদি কিছু সদস্য থাকে তাহলে ভোট নেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। স্পীকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন না। কমন্সসভায় স্পীকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

স্পীকারের এই ত্রুটিপূর্ণ ক্ষমতার ফল হল কোনও পীয়ার বিশৃঙ্খলাও হলে সম্ভবত বিপক্ষের কোনও পীয়ার তাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে বলেন। ফলে একটা নিয়ম বহির্ভূত বিতর্ক শুরু হয় এবং প্রত্যেক শেষ বক্তা তার পূর্বতন বক্তার নামে বিশৃঙ্খলার দোষারোপ করে। তাই সুশৃঙ্খল বিতর্কের সঙ্গে নালিশ ও পালটা নালিশ হতে থাকে আর লর্ড চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা না থাকায় তিনি বসে থাকেন কারণ প্রশ্ন তুলতে দেওয়ার এবং অন্যান্য নিয়মমাফিক কাজ করা পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা সীমিত।

অন্যান্য অফিসারবৃন্দ

লর্ড চ্যান্সেলর লর্ডসসভার স্পীকার হিসাবে কাজ করার সময় তাঁর অধীনে আরও তিনজন অফিসার কাজ করে।

১. পার্লামেন্টের করনিক তাঁর কর্তব্যগুলি কমন্সসভার করনিকের সমগোত্রীয়। যেমন একটি জাবেদাতে লর্ডসসভার কার্য বিবরণীও সিদ্ধান্তের রেকর্ড রাখা।

২. দ্য জেন্টলম্যান উসার অব দা ব্ল্যাক রড, যার কর্তব্য কমন্সসভার সমগ্র সার্জেন্টের কর্তব্যের অনুরূপ, সভায় পুলিশের মতো অচরণ করাই তার কাজ।

৩. সশস্ত্র সার্জেন্ট হলেন লর্ড চ্যান্সেলরের পরিচারক।

□ □ □

অধ্যায়-৬

চূড়ান্ত ক্ষমতা ও দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা দাবি :

১৫ অগস্ট—যেদিন ভারত একটি ডোমিনিয়ন হল সেদিন ত্রিবাঙ্কুর এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্য দুটি নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করল এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে ঐ উদাহরণ অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা দিল। এর থেকে এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি হল। এই সমস্যাটি খুবই সঙ্কটময় এবং এজন্য গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। এই সমস্যার দুটি দিক আছে—রাজ্যগুলি কি নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে পারে? তাদের কি নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করা উচিত?

প্রথমটি নিয়েই শুরু করা যাক। করদমিত্র রাজ্যগুলির নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণার দাবির ভিত্তি লুকিয়ে আছে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে তারিখের ক্যাবিনেট মিশনের দেওয়া বিবৃতিতে। এই বিবৃতিতে তারা বলেছিল, কোনও অবস্থাতেই ব্রিটিশ সরকার একটি ভারতীয় সরকারের হাতে প্যারামাউন্টসি (চূড়ান্ত ক্ষমতা) হস্তান্তর করতে পারে না। এবং হস্তান্তর করবেও না। এর অর্থ হল রাজার ও করদমিত্র রাজ্যগুলির মধ্যে থাকা যে সম্পর্ক থেকে করদ মিত্র রাজ্যগুলি ঐসব অধিকার পেয়ে থাকে সেই সম্পর্কের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। রাজ্যগুলি তাদের যে সমস্ত অধিকার প্যারামাউন্টসীর কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিল সেগুলি আবার তাদের কাছে ফিরে আসবে। রাজা যে প্যারামাউন্টসী হস্তান্তর করতে পারেন না, ক্যাবিনেট মিশনের এই বিবৃতি স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক কূটনীতির নয়। এটি একটি আইনগত বিবৃতি। প্রশ্ন হল: যেহেতু এটি সব রাজ্যে প্রযোজ্য, সেহেতু আইনের দিক থেকে এটি কি একটি সঠিক বিবৃতি?

ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষিত বিবৃতিতে মৌলিক কিছু নেই। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা এবং ভারতীয় করদমিত্র রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত বাটলার কমিটি যে মতামত পেশ করেছিল এটি তার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

এই বিষয়ের ছাত্ররা জানে যে, বাটলার কমিটির সামনে রাজ্যগুলির যুবরাজেরা দুটি প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক করে ছিল ;

১. যুবরাজরা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে হওয়া চুক্তির শর্তাবলীকে প্যারামাউন্টসী বাতিল করতে পারে না। সেগুলিকে সীমিত করতে পারে মাত্র।

২. প্যারামাউন্টসীতে লেখা সম্পর্ক হল রাজা এবং যুবরাজদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সুতরাং যুবরাজদের সম্মতি ছাড়া ঐ সম্পর্ক ভারতীয় সরকারকে রাজা হস্তান্তর করতে পারেন না।

বাটলার কমিশন এই দুই যুক্তির প্রথমটি বাতিল করে দেয়। কমিশন তাদের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে। কমিশন বলে যে, রাজার প্যারামাউন্টসী হল চূড়ান্ত এবং সেটা চুক্তির কোনও শর্তের দ্বারা সীমিত হতে পারে না। আশ্চর্যজনকভাবে কমিশন দ্বিতীয় যুক্তিটি সমর্থন করেছিল। প্যারামাউন্টসী সম্বন্ধে যুবরাজদের যুক্তি কমিশন বাতিল করে দিয়েছিল বলে অসন্তুষ্ট যুবরাজদের সন্তুষ্ট করার জন্য কমিশন এরকম করেছিল কিনা, সেটা গবেষণা করে কোনও লাভ নেই। যাই হোক যা হয়ে রইল তা হল এটা ভারত সরকারের এবং রাজনৈতিক দপ্তরকে এবং যুবরাজদের অপরিমেয় পরিতৃপ্তি দিয়েছিল।

একটি ভারতীয় সরকারের হাতে প্যারামাউন্টসী যাবে না বলে যে তত্ত্ব বলা হয়েছে সেটা খুবই ক্ষতিকর। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটি ভুল বোঝার থেকেই এই তত্ত্বের সৃষ্টি। তত্ত্বটি এতই অস্বাভাবিক যে, ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ল কোয়াটার্লি রিভিউ-এ ইংলিশ আইন ইতিহাসের লেখক স্বর্গত অধ্যাপক হল্ডস্‌ওয়ার্থকে এই তত্ত্বের সমর্থনের প্রচন্ড রকমের উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করতে হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সাংবিধানিক আইনের কোনও ভারতীয় ছাত্র কখনও এই মতবাদের বিরোধিতা করেনি। এর ফলে এ ব্যাপারে এই তত্ত্বই শেষ এবং চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, ক্যাবিনেট মিশন সেটাকেই বলবৎ ধরে নিয়ে তার ওপর নির্ভর করে ব্রিটিশ ভারত বনাম ভারতীয় করদমিত্র রাজ্যগুলির বিবাদ মেটাতে চাইছে। এটা দুঃখের বিষয় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, যে কমিটি ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে এই বিরোধ মেটানোর জন্য আলোচনা করছে তারাও প্যারামাউন্টসী বিষয়ে মিশনের ঘোষিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়নি। কিন্তু এসব ঘটনা, ভারতীয়দের হাতে থেকে এ বিষয়টির ব্যাপারে আবার নতুন করে পর্যালোচনা করার অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। ভারতীয়রা এ বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তাদের মতামত সত্য বলে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালে, তারা এর পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানাতে পারে, ক্যাবিনেট মিশন কি বলেছে তাতে কিছু যায় আসে না।

চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে ক্যাবিনেট মিশন যে অবস্থান নিয়েছে তার বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখানো যেতে পারে সেটা নীচের তত্ত্বে বলা হয়েছে।

১. চূড়ান্ত ক্ষমতাকে শুধুমাত্র রাজার বিশেষ অধিকারের এক অপর নাম বলা যেতে পারে। এটা সত্য যে, চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজার অন্যান্য বিশেষ অধিকারের থেকে দুটি বিষয়ে পৃথক। ক) রাজার সাধারণ বিশেষ অধিকারের ভিত্তি হল কমন ল, ব্যবস্থা পরিষদের করা বিধিবদ্ধ আইন নয়। অপর পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতার মতে বিশেষ অধিকারের ভিত্তি হল প্রথা সংযোজিত সন্ধিপত্র। খ) রাজার কমন ল থেকে উদ্ভূত বিশেষ অধিকার রাজার ডোমিনিয়নে বসবাসকারী সব প্রজা এবং সেখানকার অস্থায়ী বিদেশি বাসিন্দাদের ওপর প্রযোজ্য। কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতার কেবলমাত্র ভারতের করদমিত্র রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৎসত্ত্বেও আসল ব্যাপার হল চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজার বিশেষ অধিকার হিসাবেই থেকে যায়।

২. রাজার বিশেষ অধিকার হবার ফলে চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগ মিউনিসিপ্যাল আইনের একটি অংশের সমর্থন সাপেক্ষ। এই অংশটিকে বলা হয় সংবিধানের আইন।

৩. সাংবিধানিক আইনের নীতি অনুযায়ী রাজার হাতে বিশেষ অধিকার বর্তালেও এই বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছামতো কিছু করার নেই। একমাত্র তাঁর মন্ত্রিমন্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। মন্ত্রিমন্ডলীর পরামর্শ না নিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন না।

একেবারে শেষে যে তত্ত্বটি স্পষ্ট করে বলা হয় সেটির আরও ব্যাখ্যা দরকার। যেমন প্রশ্ন উঠতে পারে কোন মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা কাজ করবেন? উত্তর হল সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়নের মন্ত্রিসভার পরামর্শে তিনি কাজ করবেন। ওয়েস্ট মিনিস্টার আইন পাশ হওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত একটি মাত্র ডোমিনিয়ন নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। ফলত বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের পরামর্শে কাজ করতেন। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আয়ার্ল্যান্ডকে পৃথক-পৃথক ডোমিনিয়ন বলে ঘোষণা করে ওয়েস্ট মিনিস্টার আইন পাশ হওয়ার পর রাজা ঐ সব ডোমিনিয়নের ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করেন। এরকম করাটা বাধ্যতামূলক, অন্যরকম হতে পারে

না। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারত যখন ডোমিনিয়নে পরিণত হল তখন থেকে ভারতীয় ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর বিশেষ অধিকার অর্থাৎ প্যারামাউন্টসী প্রয়োগ করতে রাজা বাধ্য।

ভারত সরকারের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না, এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ-১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকার আইনে যে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০নং ধারা ছেড়ে যাওয়া হয়েছে তাঁর ওপর নির্ভর করেছেন। সেগুলি ভারত সরকার আইন, ১৯১৫-১৯১৯, এর ৩৩নং ধারায় পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছিল। তাদের মতে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী ভারতের সরকারের (ব্রিটিশ-ভারতের সামরিক ও অসামরিক সরকারের নয়) দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয় যে ভারতীয় সরকারকে যে চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে এক বিশেষ প্রমাণ হল আইনে এই অংশটি ছেড়ে যাওয়া হয়েছে। সব চেয়ে কম করে বলতে গেলে বলা যায় এই যুক্তিটি শিশুসুলভ।

ভারত সরকার আইনে এরকম একটা বিধি আছে, না নেই, সেটা আসল বিষয় বস্তুর বাইরে এবং এটা কিছুই প্রমাণ করে না। এই ধারাটি নেই বলে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ভারত কোনও মতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা ব্যাপারে রাজাকে পরমার্শ দেওয়ার অধিকার দাবি করতে পারে না। ভারত সরকার আইনে এটা থাকলেও তার অর্থ এই নয় যে, এরকম একটা ক্ষমতা ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যখন এটা এই আইনের অংশ ছিল তখন ন্যস্ত ছিল, এবং ঐ বিশেষ ধারায় এমন ব্যবস্থা ছিল যার বলে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে সেক্রেটারি অব স্টেটের ইস্যু করা এরকম সব কিছু আদেশের প্রতি গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে যথাযথ আজ্ঞানুবর্তিতা দেখাতে হত। এর অর্থ হল ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতে বিশেষ অধিকার প্রয়োগ ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ছিল ভারত-সচিবের হাতে।

১৮৩৩ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত শাসনের সঙ্গে জড়িত চূড়ান্ত ক্ষমতা ব্যাপারগুলি মীমাংসা করার জন্য যত আইন পাশ হয়েছে সেগুলি রাজকে চূড়ান্ত ক্ষমতা সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে ভারতীয়দের পরামর্শ দেবার অধিকারকে কোনওভাবেই খর্ব করেনি এবং কোনওভাবেই খর্ব করতে পারে না। সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী কোনও দেশ ডোমিনিয়ন হওয়ার পর রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার দাবি করতে পারে এবং ডোমিনিয়নে পরিণত

হওয়ার আগে রাজাকে অন্যভাবে পরামর্শ দেওয়া হত এই যুক্তিতে ঐ অধিকারে কোনও বাধার সৃষ্টি হবে না। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের আইনে ভারত দায়িত্বশীল সরকার সম্পন্ন দেশ ছিল না। কিন্তু সে যদি এরকম থাকতও, তবুও সে রাজাকে ভারতীয় করদমিত্র রাজ্যগুলির ওপর বিশেষ অধিকার প্রয়োগ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার দাবি করতে পারত না। এর কারণ হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক আইনে দায়িত্বশীল সরকার এবং ডোমিনিয়ন মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। দায়িত্বশীল সরকারের ক্যাবিনেটের রাজাকে পরামর্শ দেবার অধিকার এবং ঐ পরামর্শ স্বীকার করে নেওয়ার জন্য রাজার দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিশেষ অধিকার প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বৈদেশিক ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা ব্রিটিশ ক্যাবিনেট নিজের হাতে রেখে দিয়েছে, কিন্তু ডোমিনিয়নের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি অভ্যন্তরীণ বা বহির্বিষয়ক যাই হোক না কেন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সবরকম ব্যাপারে রাজা মন্ত্রি সভার পরামর্শ মানতে বাধ্য। সেই কারণে ডোমিনিয়ন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের হস্তক্ষেপ ছাড়াই অন্যদেশের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে। রাজাকে তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দেবার অনুমতি ভারত সরকারের নেই এই কথার অর্থ এই নয় যে, একটা সহজাত সাংবিধানিক অক্ষমতা তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার দাবি করার হকদার হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। ভারত যেই মুহূর্তে ডোমিনিয়ন মর্যাদা পেয়েছে সেই মুহূর্তে আপনা আপনিই সে রাজাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছে। যা বলা হল সেটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক আইনের সংক্ষিপ্তসার এবং সাম্রাজ্যের একটি অংশ ডোমিনিয়ন মর্যাদা অর্জন করার পর কেমন করে রাজাকে তাঁর বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার একচ্ছত্র অধিকার পায় সে বিষয়ে ক্রমবিকাশের একটি প্রক্রিয়ার বেশি কিছু নয়। এটা বোঝা বেশ কষ্টকর কেন ভারত ডোমিনিয়ন মর্যাদা পাওয়ার পর তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। যুক্তির সমতুল্যতার দৃষ্টিতে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আয়ার্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে যেমন রাজাকে পরামর্শ দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে ভারতকেও তেমনি দেওয়া উচিত। অধ্যাপক হোল্ডসওয়ার্থ যে ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সেটা ওপরে বলা সাংবিধানিক আইনের মৌলিক প্রতিজ্ঞা থেকে কোনওরকম পার্থক্যের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসার কারণ হল, তিনি যুক্তি দেখাতে গিয়ে এক সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। অধ্যাপক হোল্ডস ওয়ার্থ যে প্রশ্নটি তুলেছেন সেটা হল রাজা ভারত সরকারের হাতে প্যারামাউন্টসী ছেড়ে দিতে বা হস্তান্তর করতে পারেন কিনা? কিন্তু এটাই আসল কথা নয়।

আসল সমস্যা হল ভারতীয় ডোমিনিয়ন প্যারামাউন্টসী প্রয়োগের ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার দাবি করতে পারে কিনা। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন সেটা হল চূড়ান্ত ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে। আমার নিশ্চিত ধারণা অধ্যাপক হোল্ডস ওয়ার্থ প্রকৃত সমস্যাটি অনুধাবন করতে পারলে তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না।

এ পর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশনের বিবৃতির যে অংশ রাজা একটি ভারতীয় সরকারকে চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন না বলে তাঁরা বলেছেন, শুধুমাত্র সেই অংশটি নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে—তাদের বিবৃতির অন্যান্য অংশ যেখানে বলা হয়েছে যে রাজা একটি ভারতীয় সরকারের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা তুলে দেবেন না সে অংশগুলিও বিবেচনা করা দরকার। ক্যাবিনেট মিশনের মতে প্যারামাউন্টসী তামাদি হয়ে যাবে—এটা একটা আশ্চর্যজনক বিবৃতি। এটি সাংবিধানিক আইনের অপর একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নীতির পরিপন্থী। এই নীতি অনুযায়ী রাজা তাঁর বিশেষ অধিকার অন্যের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে পারেন না বা ত্যাগ করতে পারেন না। রাজা যদি চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে না পারেন তাহলেও তিনি এটা ছেড়ে দিতে পারেন না। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রানি বনাম এডুলজি রাইরামঞ্জি বিবাদে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রি. ভি. কাউন্সীল এই নীতির আইনসিদ্ধতা স্বীকার করেছিল। এই বিষয়টি মুরের ২৭৬ পৃষ্ঠাতে রিপোর্ট করা হয়েছে, ঐ রিপোর্টের ২৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, রাজা এমনকি সনদের মাধ্যমেও এই বিশেষ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেন না। অতএব এটা স্পষ্ট যে, ক্যাবিনেট মিশনের বিবৃতি—রাজা প্যারামাউন্টসী প্রয়োগ করবেন না—সেটা যে সাংবিধানিক আইনের বলে সাম্রাজ্য পরিচালনা করা হয় তার পরিপন্থী। রাজাকে অতি অবশ্য চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে যেতে হবে। এটা অবশ্য সত্যি যে, যথাযথ সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ যদি এমন করতে আজ্ঞাপত্র দেয় তাহলে রাজা এই বিশেষ অধিকার অন্যের নিয়ন্ত্রণে ত্যাগ করতে পারেন। প্রশ্ন হল চূড়ান্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করাটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পক্ষে আইনসঙ্গত এবং যথাযথ হবে কিনা। এটা নিশ্চিত যে, ভারতীয়রা অবাধে যুক্তি দেখাতে পারেন যে, এ বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনও পদক্ষেপ যথাযথ বা আইনসম্মত কোনওটাই হবে না। সোজাসুজি যে কারণে এটা আইন সম্মত হবে না সেটা হল ভারত ডোমিনিয়নে রূপান্তরিত হওয়ার পর চূড়ান্ত ক্ষমতা বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কেবলমাত্র ভারতীয় ডোমিনিয়নের সংসদে পাশ করতে পারে এবং ব্রিটিশ সংসদের এই ব্যাপারে কোনও এক্তিয়ার নেই। তাছাড়া গ্রেট ব্রিটেনের সংসদ চূড়ান্ত ক্ষমতা বাতিল করে আইন পাশ করা

হলে সেটা অনুচিত হবে। কারণ স্পষ্ট। সৈন্যবাহিনী গড়তে দেওয়াই হল চূড়ান্ত ক্ষমতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অধিকার দান। এই সৈন্যবাহিনী হল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যার যাবতীয় ব্যয়ভার ব্রিটিশ-ভারত সবসময় বহন করে আসছে। রাজা তাঁর প্রতিনিধি ভাইসরয় এবং বড়লাটের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের পালিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণে না রাখলে রাজা কখনই চূড়ান্ত ক্ষমতা তৈরি করতে এবং তাকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হতেন না। এই ক্ষমতাগুলির প্রকৃতি হল রাজার একধরনের আস্থা বা বিশ্বাস যেটা ভারতের জনগণের সুবিধার্থে তিনি পোষণ করেন। এই আস্থা বা বিশ্বাস নষ্ট করে ব্রিটিশ সংসদ কোনও আইন পাশ করলে সেটা হল এক জাজ্জ্বল্যমান বিশ্বাসভঙ্গ। চূড়ান্ত ক্ষমতা হল একধরনের সুবিধা যেটা ভারতীয় যুবরাজদের সঙ্গে চুক্তির ফলে সৃষ্ট। তাই স্বাধীন ভারত চূড়ান্ত ক্ষমতা উত্তরাধিকারের জন্য বিধিসম্মত দাবি করতেই পারে।

একটি প্রশ্ন জাগে : ভারত স্বাধীন হলে কি ঘটবে? তখন আর রাজা থাকবে না, তাই রাজাকে পরামর্শকে দেবার প্রশ্নও থাকবে না। স্বাধীন ভারত কি রাজার বিশেষ ক্ষমতার উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে? উত্তর হল হ্যাঁ, সে দাবি করতে পারে। স্বাধীন ভারত হবে একটি উত্তরাধিকারের বৈধতাসম্পন্ন একটি রাষ্ট্র। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে জড়িত আন্তর্জাতিক আইনের বিধান পর্যালোচনা করতে হবে। ওপ্পেন হেইম স্বীকার করেছেন যে, উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র পূর্বাধিকারী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে। হলের আন্তর্জাতিক আইন গ্রন্থ থেকে এটি প্রতীয়মান, চুক্তির মাধ্যমে পাওয়া অন্যান্য জিনিস সমেত সম্পত্তি এবং সুবিধাগুলি উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে। ভারতও উত্তরাধিকার বৈধতাসম্পন্ন রাষ্ট্র হবার জন্য কিছু অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে। এ বিষয়ে হলের আন্তর্জাতিক আইন গ্রন্থ থেকে নেওয়া নিচের ঔদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক।

"এবং যেহেতু পুরাতন রাষ্ট্রটি অবিচ্ছেদ্য ভাবে তার জীবন চালিয়ে যেতে থাকে সেহেতু একজন ব্যক্তি হিসাবে তার অধীনে যা কিছু থাকে, যেগুলি সে স্পষ্টত হারায়নি, সেগুলির ওপরেই তার মালিকানা থাকে। সুতরাং চুক্তির মাধ্যমে যে সম্পদ এবং সুবিধাগুলি পাওয়া গেছে, যেগুলি একজন ব্যক্তি হিসাবে সে সমগ্রভাবে ভোগ করেছে বা তা প্রজারা ঐ সমগ্রের সদস্য হওয়ার বলে ভোগ করেছে সেগুলির মালিকানা তারই কাছে টিকে থাকে। অপরপক্ষে বশ্যতা স্বীকার পূর্বক এলাকা সমর্পণ এবং সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তিতে থাকা অধিকার সমেত হারানো এলাকার ওপর থাকা মালিকানা, কেবলমাত্র এই প্রসঙ্গে থাকা চুক্তি বদ্ধদায়ে এবং এর সীমানার

মধ্যে থাকা সম্পত্তি এবং সেজন্য থাকা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এর সীমার মধ্যে না থাকলেও সেই এলাকায় থাকা সরকারি সংস্থার মালিকানাধীন বিষয়গুলি নতুন রাষ্ট্ররূপ ব্যক্তির কাছে নিজে নিজেই হস্তান্তরিত হয়ে যায়।"

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তারা এখন যেমন আছে তখনও ঠিক তেমন থাকবে। তারা ততটাই সার্বভৌম রাষ্ট্র থাকবে এখন যতটা আছে। তাই বলে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা সুজারেনিটির (অপর রাষ্ট্রে কর্তৃত্বাধীন) অধীন থাকে। ভারত ডোমিনিয়ন হিসাবে থাকলে তাদের ভারতের রাজার সুজারেনিটির অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। আর ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হলে তাদের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রে সুজারেনিটির আওতায় থাকতে হবে। অপর রাষ্ট্রে সুজারেনিটির আওতায় থাকলে তারা কখনই স্বাধীন হতে পারবে না। রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু তাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের ওপর অপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকলে এমনকি ভারত স্বাধীন হলেও ভারত তাদের স্বাধীন বলে স্বীকার করবে না এবং বিদেশি রাষ্ট্রগুলিও তাদের স্বাধীন মর্যাদা বিষয়ে একমত হবে না। একমাত্র যে উপায়ে ভারতীয় রাজ্যগুলি নিজেদের প্যারামাউন্টসী থেকে মুক্ত করতে পারে সেটা হল সার্বভৌমত্ব এবং সুজারেনিটির আওতায় থাকার বিষয় দুটিকে মিলিত করায়। সেটা তখনই হতে পারে যখন ভারতীয় ইউনিয়নের মৌলিক উপাদান হিসাবে তারা যোগদান করে। রাজ্যগুলি মুখপাত্রদের এটা জানা উচিত। কিন্তু তারা এটা বিস্মৃত হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। তাই তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার আর টি সিতে কি ঘটেছিল। শুরুতে রাজ্যগুলি ফেডারেশনে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল। তারা তখনই ফেডারেশনে যোগ দিতে রাজি হল যখন তারা জানতে পারল যে, বাটলার কমিটির রচনা করা বিধিনিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত ক্ষমতা হল চূড়ান্ত। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের কারণ এই উপলব্ধি থেকে যে, চূড়ান্ত ক্ষমতায় থাকা যতটা ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে ততটা চূড়ান্ত ক্ষমতা উবে যাবে। আমাদের প্রায় সবাই কার্যত যা জানত তা হল তদানিন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাছে যুবরাজারা জোরের সঙ্গে প্রশ্ন তুলে বলেছিল যে, এক নম্বর তালিকায় থাকা বিষয়গুলি বাদ দিয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা পরিধি সীমিত করতে হবে। তদানিন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কিছুই ছিল না, যুবরাজদের দিকে ভ্রূকুটি করেই তিনি তাদের চুপ করিয়ে ছিলেন। তদানিন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট-এর এই মনোভাব ছাড়াও যে ব্যাপারটি থেকে যায় সেটি হল যুবরাজরা এই যুক্তি বুঝতে পেরেছিল যে, ফেডারেশনে যোগ দিয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অবসান ঘটানো যায়। এই যুক্তি তখনকার মতো এখনও প্রযোজ্য। ভারতীয় রাজণ্যবর্গের

পক্ষে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা স্বাধীনতার মরিচিকার পেছনে না ছোটার মতোই বুদ্ধির কাজ হবে। অতএব চূড়ান্ত ক্ষমতা তামাদি হয়ে যাবে বলে ক্যাবিনেট মিশন যে যুক্তি দেখাচ্ছে ভারতীয়দের উচিত সেটা প্রত্যাখ্যান করা। তাদের জোর দিয়ে বলা উচিত যে চূড়ান্ত ক্ষমতা তামাদি হতে পারে না, তারাই এই প্যারামাউন্টসীর উত্তরাধিকারী। তারা এটা প্রয়োগ করে যেতে থাকবে সেই সব ভারতীয় রাজ্যের ওপর যারা ব্রিটিশ ছেড়ে যাওয়ার পরেও ইউনিয়নে যোগদান করেনি। অপর পক্ষে এই রাজ্যগুলির উপলব্ধি করা উচিত যে, ভারতীয় সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে তাদের অস্তিত্ব পাঁচ বছরের জন্য কেনার সমতুল্য বস্তু নয়। যে দেওয়ান তাঁর যুবরাজকে ইউনিয়নে যোগ না দিতে পরামর্শ দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে যুবরাজের শত্রু হিসাবে কাজ করছে। ফেডারেশনে যোগদানটি নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করবে। এর সুবিধে হল ইউনিয়ন রাজন্যবর্গকে তাদের রাজবংশগত উত্তরাধিকারের অধিকার, যেটা অধিকাংশ যুবরাজের কাম্য সে সম্বন্ধে গ্যারেন্টি দেবে। স্বাধীন হওয়া এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা পাওয়ার আশা করা নিজের স্বর্গে বাস করার মতো হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদের ওপর ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দাবি অগ্রাহ্য করে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলিকে স্বীকৃতি দেবে কিনা সেটাও সন্দেহজনক। এমনকি যদি দেয়ও, প্রথমে রাজ্যগুলিকে নিজ এলাকায় দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করার জন্য জোর না করে রাষ্ট্রপুঞ্জ কখনই কোনও ভারতীয় রাজ্যকে বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসের সময় কোনও সাহায্য করবে না। এ সবই দেওয়ালের বড় লিখন। একটু সচেতন হলেই এটা পড়া যায়। যারা এটা পড়তে চাইবে না তাদের ভাগ্যও নিঃসন্দেহে নিজ-নিজ স্বার্থের ক্ষেত্রে অন্ধদের মতো হবে।

□ □ □

later to 10%. The average rate during the century would work out at about 9% and it only rose above from 1768 to 1771. In 1728 a slight fall was caused by the competition of the French Company, and a further fall of 1% followed an increase of capital and the foundation of the Swedish Company in 1732. In 1744 it rose again to 8% and continued at this rate for eleven years in spite of the continual war both in Europe & in the Carnatic. In 1755 the unsettled condition of the affairs at last had effect & a fall of 2% resulted. In 1760 the cession of Burdwan & other provinces increased the working costs of the Company and kept the dividend at 6%, so that the sum distributed annually was £191,644. In 1767 in consequence of the acceptance of the territorial sovereignty of Bengal, the dividend was raised to 10% and the amount distributed reached £319,408. This rise was quite unjustifiable and was largely due to the exaggerated estimates of the prosperity of India. The increased dividends declared in anticipation of large profits which were never fully realized, were paid by means of loans raised at exorbitant interest. For five years the Company hung on in the hope of better days, but in 1772 the crash came & the dividends fell from 12½% to 6%. Lord North then intervened, and, for the future, the Company's dividends was subject to the ministerial control. The Regulating Act was followed by renewed prosperity & the dividend continued to rise slowly. In 1792 the conclusion of the peace with Tipoo, whereby the Company received a revenue of £240,000 and an indemnity of £1,600,000, was

ড. আম্বেদকরের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি। ছাত্র-জীবনে ১৯১৫-১৫ সালে যখন আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময়ের। 'প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য' থেকে।

Articles	East-Indies	West-Indies etc
	£. s. d.	£. s. d.
Sugar per cwt	1. 18. 0.	1. 4. 0
Coffee per lb	0. 0. 9	0. 0. 6
Spirits, Sweetened per gallon	1. 10. 0	1. 0. 0
" , not "	0 15. 0	0 8. 6
Tamarinds per lb	0 0. 6	0 0. 2
Succades	0. 0. 6.	0. 0. 3
Tobacco "	0. 3. 0	0. 2. 9.
Wood teak under 8 inches square per load	1. 10. 0	0. 10. 0
Ditto, not particularly enumerated. ad valorem	20 per cent	5 per cent.

The English tariff on Indian goods was not not only discriminating but differ with the use wells to which they were put to in England as will be seen from the following answers of Mr Ram John Rankin to the question of the Committee of House of Commons in 1813

Q. "Can you state what is the ad valorem duty on piece goods sold at the East India House?".

A. "The duty on the class called Calicoes is £3, 6s, 8p per cent upon impor and if they are used for home consumption there is a further duty of £ 68, 6s. 8d. per cent."

"There is another class called muslins, on which the duty on impor is 10 per cent. and if they are used for home consumption of £27, 6s. 8d

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : ত্রয়োবিংশতি খণ্ড

অনুবাদে

- **শচীন বিশ্বাস** : ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও অনুবাদক। শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- **দেবাশিস সেনগুপ্ত** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।
- **অরুণাভ সিন্‌হা** : অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।

অনুমোদনে

- **আশিস সান্যাল** : কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, শিশু-সাহিত্যিক ও অনুবাদক। বাংলা ও ইংরেজিতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। জাতীয় কবির সম্মানে সম্মানিত। সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলনে যোগদানের জন্য বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

নির্ঘণ্ট